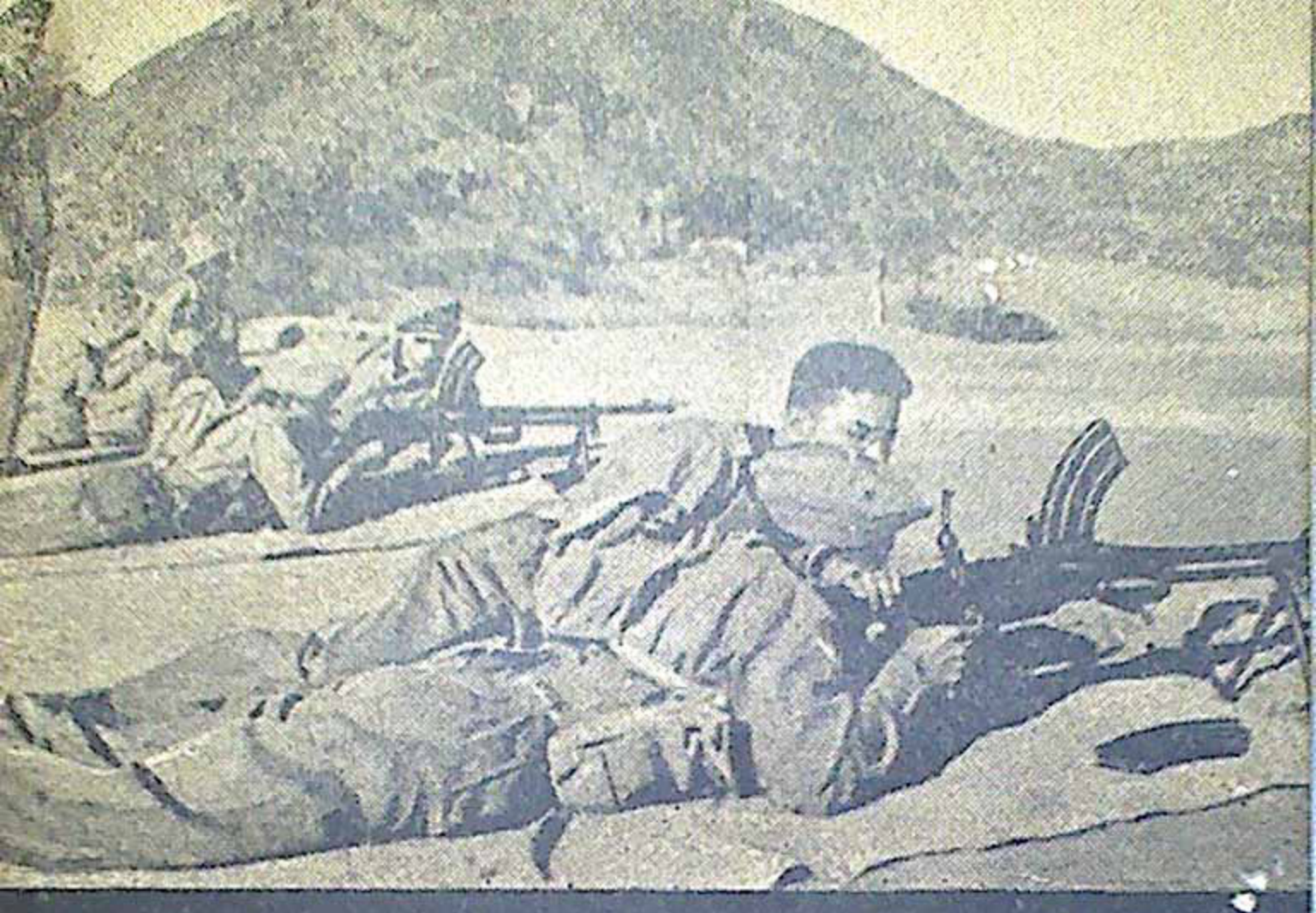

ASUTOSH COLLEGE MAGAZINE

VOL. XXVIII

1953

Asutosh College Patrika

Editors

(1924-1940)

1924	Prof. Mohini Mohan Mookherjee, M. A.
1925	Basudev Banerjee
1926	Bibhas Roy Choudhury S. Raghavachari
1927	Subodh Biswas Dhiren Lahiri Satiranjan Banerjee
1928	Sasi Bhusan Barik Kalyan Kumar Sen Gupta
1929	Asoke Kumar Banerjee Shyamapada Mukherjee
1930	Prabhat Kumar Bose Kausik Kumar Mitra
1931	Shyamapada Mukherjee Prafulla Kumar Sarcar
1932	Amiya Ratan Mukherjee Bireswar Chatterjea Battokrishta Banerjea
1933	Hariprasanna Chakrabarty Prabhat Sen
1934	Gobinda Roy Anil Kumar Chakrabarty
1935	Binoy Ghose Basanta Ghosal
1936	Debaprasad Bhattacharjea Santosh Mitra Miss Phulrani Ghose
1937	Debaprasad Chatterjea Narahari Kaviraj Miss Bani Roy
1938	Santosh Bose Miss Pratima Banerjea
1939	Subrata Sarcar Miss Nirupama Banerjea
1940	Ram Krishna Moitra Miss Alaka Guha

(*Continued on the third cover*)

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

অষ্টাবিংশ খণ্ড * * * ১৩৬০

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

সম্পাদক

শ্রীদুলাল দাস

511

ASUTOSH COLLEGE
ESTB. 1916
LIBRARY

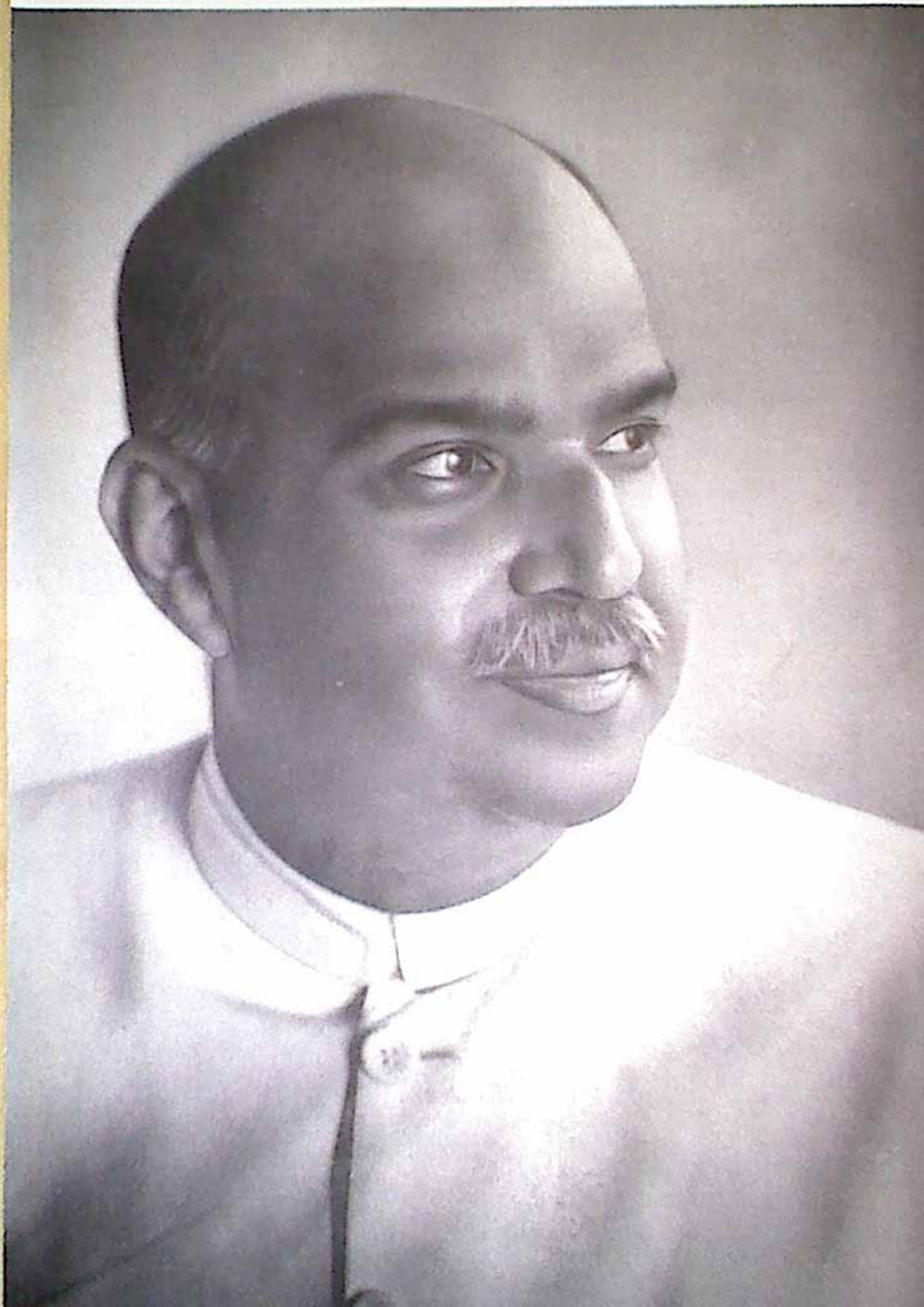

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

অষ্টাবিংশ বর্ষ : শ্রাবণ : ১৩৬০

সূ চী প ত্র

মহাপ্রয়াণ	...	মুখপত্র
সম্পাদকের কথা	...	১

প্রবন্ধ ঃ

অচিন্ত্যকুমারের চিঠি	...	৮
কবি শ্রীরামকৃষ্ণ	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৯
পৌষ-উৎসবে শান্তিনিকেতন	শ্রীরণজিৎকুমার ভট্টাচার্য	১৩
রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলা নাটক	শ্রীমৃদুলকান্তি বসু	১৭
সাহিত্যে বাস্তবতা	শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র বসাক	২১
শেষ চিঠি	শ্রীবাসুদেব	২৬
আধুনিক সাহিত্যপাঠের ভূমিকা	অধ্যাপক সুশীল জানা	২৯
ভারত ও লৌহশিল্প	রমেন্দ্রকৃষ্ণ হালদার	৩৫
এযুগের বিস্ময়	পিনাকী ভাদুড়ী	৪০
অস্তিত্ববাদ প্রসঙ্গে	মানস রায়চৌধুরী	৪৩
বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে নরনারীর প্রেম-প্রকৃতি	অধ্যাপক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০
নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন (কটক)	শ্রীসুনীলময় ঘোষ	৫৬
আমি ও আমার চারপাশ	শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী	৬৪

কবিতা ঃ

বর্ষ-বোধন	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৬৮
বসন্ত-প্রস্তাব	তুষার চট্টোপাধ্যায়	৬৯
সমাচার	শ্রীআলোককুমার হালদার	৬৯
মৃত্যু	অরুণ দাশ	৭০
সন্ধ্যা	শ্রীগুণধর দাস মহাপাত্র	৭০
কলমে-লাগলে বীজ বপো ফসলের	শ্রীমলয়শংকর দাশগুপ্ত	৭১
স্বাক্ষর	অজিত রায়চৌধুরী	৭২
সাগরের গান	অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়	৭৪
হর্ষশেষ	জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৭৫

511

গল্প ঃ

মা	শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৭৮
ঝংকার	শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৮৪
টাকার অঙ্ক	শ্রীহরিশঙ্কর পাল	৯০
একটি ভাঙা-মন্দিরের আত্মকাহিনী	শ্রীসন্তোষকুমার চক্রবর্তী	৯৬
সার্কাস্	হিমাদ্রিকুমার চক্রবর্তী	৯৮

কুড়িয়ে-ছড়িয়ে ঃ

নোগুচি-সংবর্ধনা ১০৫
রজত জয়ন্তী সংখ্যা ১০৭
জানেন কি ? ১০৮

নূতন বই ঃ

শ্রীঅমিয়রতনের 'স্বপ্ন ও সংগ্রাম'-এর আলোচনা ১০৯
ছোটদের মঙ্গলকাব্য ১১৫
সন্ধ্যামালতী ১১৬
সাহিত্যপ্রবাহ ১১৭
মাধুকরী ১১৭

প্রতিবেদন ঃ

রবীন্দ্র-পাঠচক্র ১১৯
প্রাচীর-পত্র ১২০
কৃষ্টি-পরিষদ্ ১২০
কমনরুম ১২১

ছাত্রাবাস-সংবাদ ঃ

আশুতোষ কলেজ ছাত্রাবাস ১২৩

ক্যামেরা ও কলম ঃ

শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এ মেসেজ্ ফ্রম্ আওয়ার্ প্রেসিডেন্ট্,
শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর দুটি স্কেচ, দিনের শেষে, ডালিয়া,
আশুতোষ কলেজ টেবিল টেনিস্ টিম্ ১৯৫৩,
স্পোর্টস্ অ্যাণ্ড গেমস্

মহাপ্রয়াণ

পত্রিকার মুদ্রণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল এমন সময় শ্যামাপ্রসাদের মহাপ্রয়াণের সংবাদ আমরা পাইলাম। শ্যামাপ্রসাদের অকালমৃত্যু সমগ্র জাতিকে শোকার্ত ও মুহ্যমান করিয়াছে। আমরা তাঁহাকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পাইয়াছিলাম, তাই তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বিশেষ করিয়া আত্মীয়বিয়োগ বেদনা বোধ করিতেছি। তিনি যে আমাদের কতখানি ছিলেন এবং তাঁহার বিয়োগে যে আমরা কতখানি হারাইলাম তাহার বিচারের সময় এখনও আসে নাই। আসিলেও অধিক বাক্যবিন্যাসের শক্তি আমাদের এখন নাই। আমরা এখন হতবাক্। শাস্ত্রে যাহাকে মহাগুরু-নিপাত বলে আমাদের দুর্ভাগ্য আজ সেই দুঃসংবাদ লইয়া উপস্থিত। এখন আমরা নীরবে নতশিরে শোক পালন করিব। ভগবান এই মহামানবের আত্মাকে শান্তি দিন এবং তাঁহার অসমাপ্ত কর্ম সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার ইচ্ছা ও শক্তি দান করিয়া তাঁহার উত্তরপুরুষগণকে তাঁহারই উত্তরাধিকারের যোগ্য করিয়া তুলুন—কায়মনোবাক্যে বিধাতৃচরণে এই প্রার্থনা করি।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

A Message from our President

MEMBER OF
THE HOUSE OF THE PEOPLE

To the students and members of the Staff of Asutosh College, I send my hearty greetings and best wishes at the beginning of the new academic session. Encouraged by the achievements and glorious traditions of the college during the last thirty-seven years, we may all look to the days ahead with courage and hopefulness. Let us all strive our utmost to work as a happy family in a spirit of service and comradeship, so that this institution may grow and prosper and occupy its legitimate place in the sphere of national education. Our institution will be judged not by its fine buildings and equipments, though their necessity and importance are obvious. It will be judged by its products its alumni, who, when they go out of this institution, must by their conduct and attainments be able to win the affection and good-will of all with whom they may come into contact. May the teachers and the students of our College work in an atmosphere of harmony and understanding and help to develop this institution in accordance with the cherished hopes of its illustrious founder.

1st June 1953. Syama Prasad Mookerji

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

অষ্টাবিংশ খণ্ড ১৩৬৮

অষ্টাবিংশ খণ্ড ১৩৬০

সম্পাদকের কথা

দেখতে দেখতে আমরা একটা বছর পার হয়ে এলাম। আমাদের কলেজের এবার সাঁইত্রিশ বছর পূর্ণ হলো, কলেজ পত্রিকার আঠাশ বছর। পূর্বসূরীদের পথযাত্রার অভিজ্ঞতা আর অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা পাথেয় করে আমাদের যাত্রা হলো শুরু।

এবারে কলেজ পত্রিকার জন্যে আমরা বাঙলা ভাষায় রচিত গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা খুব অল্পই পেয়েছি। সংখ্যাল্পতা রসগ্রাহিতার পরিচায়ক নয়, শক্তিহীনতার কারণ। সংখ্যাল্পতার দোহাই দিয়ে আমরা কদাচ স্বীকার করিনা প্রাপ্ত সব-কটি রচনাই নিখুঁত বা রসোত্তীর্ণ—তবুও অধিকাংশ রচনার মধ্যে লেখকের চিন্তার বলিষ্ঠতা ও বিশিষ্টতার ছাপ দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছি। আমাদের অসামর্থ্যের জন্যে যাঁরা অপ্রকাশের পর্দার আড়ালে রইলেন, তাঁদের জানাই আমাদের সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা। আশা করি, তাঁদের সাধনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর মুদ্রিত হবে পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে। সাধকের পথতো সহজ-খ্যাতির রাংতা মোড়া পথ নয়। 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'!

নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে দলনিরপেক্ষ সমালোচনা করা মুশকিল। এবার যে কয়টি কবিতা ছাপা হলো—এদের অধিকাংশই বিভিন্ন শ্রেণীর বিজ্ঞানের ছাত্রদের লেখা। এটা খুব আনন্দের কথা। কিন্তু আমরা বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছ থেকে বিজ্ঞান সম্পর্কীয় রচনাও কিছু আশা করেছিলাম সে আশা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। আশা করি ভবিষ্যতে পরবর্তী বিজ্ঞানীর দল এদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন। বিগত কয়েকটি

সংখ্যায় এঁদের কাব্যপ্রীতির প্রাচুর্য দেখে খুশি হয়েছি যেমনি, তেমনি অবাকও হয়েছি। গত সংখ্যায় প্রকাশিত সাতটি কবিতার মধ্যে পাঁচটিই বিজ্ঞান বিভাগের রচনা। এই-যে কাব্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া গেল—এ কিসের পরিচয়? বিজ্ঞানের ছাত্রদের সাহিত্য-প্রীতির না কলা-রসিকদের উত্তরোত্তর শক্তিহীনতার?

• • •

একটি সুসংবাদ। আমাদের কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅজিত কুমার রায় এম. এস-সি উচ্চ শিক্ষা লাভ ও গবেষণা কাজের জন্যে পশ্চিম জার্মানী যাত্রা করেছেন। আশা করি তিনি শিক্ষা-সমাপনান্তে আমাদের মধ্যে ফিরে এসে কলেজের সম্মান বৃদ্ধি করবেন। বিদেশ যাত্রার পূর্বে কলেজের অধ্যাপকদের পক্ষ থেকে, কলেজের দিবাবিভাগের ছাত্রদের ও আশুতোষ কলেজ নিউ হস্টেলের আবাসিকদের পক্ষ থেকে পৃথক ভাবে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছিল।

• • •

আমাদের কলেজের সাংস্কৃতিক জীবনে এ-বছর একটুখানি বৈচিত্র্য দেখা গেল। কলেজ-ইয়ুনিয়ন এবার 'বসন্ত-উৎসব' বলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। অনুষ্ঠানটি মোটামুটি ভালোই হয়েছিল। তবে এত বড়ো কলেজের সাংস্কৃতিক জীবনে একটি-দুটি অনুষ্ঠান খুব প্রশংসার কথা নয়। ইয়ুনিয়ন কর্তৃপক্ষ আরও অনেক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলে খুশি হবো। এই প্রসঙ্গে বলি, এ-বছর সরস্বতী পূজোর পর সারস্বত সম্মেলন হলোনা। গভীর পরিতাপের বিষয়। আশাকরি ইয়ুনিয়ন কর্তৃপক্ষ এদিকে সজাগ দৃষ্টি দেবেন।

গতবছরের মত এবছরও ইয়ুনিয়নের পরিচালনায় গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-বিতর্ক-আবৃত্তি ইত্যাদি নিয়ে কয়েকটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে—অনেক দেরিতে ও নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে। আমরা প্রতিযোগিতাগুলির খবর পেলাম মাত্র—প্রতিযোগীদের উৎকৃষ্ট রচনা ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশ করবার ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব হলোনা; সেগুলি যথাসময়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই সব কাজের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন কলেজ-ইয়ুনিয়নের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীপরিমল কর ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীতীর্থরেণু চন্দ্র। এবার আমরা এই প্রথম বিভিন্ন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের বাৎসরিক বিবরণী প্রকাশ করছি।

• • •

বিভিন্ন সেমিনার গঠন সম্পর্কে কলেজের অঙ্গনে-প্রাঙ্গণে জোর গুজব শোন এখনও কোন 'সেমিনার' গঠন হ'লোনা। তবে বাঙলার ছাত্ররা একটু এগিয়েছে রকম খবর পাওয়া যাচ্ছে।

• • •

এই চলতি বৎসরে আমরা বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে কয়েকজন কর্ণধারকে হারিয়েছি। কাব্য-সমালোচনায় মোহিতলাল মজুমদার, দর্শন-সাহিত্যে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ইতিহাস-সাহিত্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাচীন বাঙলা স পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়দের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের অকুণ্ঠ বাঙলা সাহিত্য যে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়েছে—এ পাঠকদের কাছে বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই। বাঙলা সাহিত্যের এই প্রয়োজন মোহিতলাল মজুমদারের লোকান্তর গমন একটি অপূরণীয় ক্ষতি। রবীন্দ্রোত্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মোহিতলাল বাঙলা সাহিত্যে যে অমূল্য দান রেখে গে তারই মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অমর হয়ে থাকবেন।

বিখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পঁয়ষট্টি বছর পরলোক গমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে শুধু বাঙলা কেন সমগ্র ভারতের সমাজ একজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। তিনি ভারতীয় শাখায় যে অসামান্য প্রতিভার ছাপ রেখে গেলেন—ভারতের সংস্কৃতিগত চিরকাল তা অম্লান থাকবে। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন কর

বিদ্বদ্বল্লভ পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় অষ্টাশী বছর বয়সে দেহত্যাগ কর বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় "বাঙলা সাহিত্যের ঘুণ" বলে পরিচিত ছিলেন। চণ্ডী 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথির আবিষ্কার ও সম্পাদনা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি ঘটনা। আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ একষট্টি বৎসর বয়সে প গমন করেছেন। নীরব সাধনার নিদর্শন হিসেবে এক একটি অমূল্যরত্ন দি

সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করছিলেন যখন—সেই সময়ে আমরা তাঁকে হারালাম। রাজশেখর বসু মশাই একে 'ইন্দ্রপাত' বলেছেন। গত দেড়শো বছর ধরে বাঙলার যে সাহিত্যিক অভ্যুদয় ঘটেছে তিনি তার একটি ঐতিহাসিক খসড়া রচনা করেছেন 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' 'বাঙলা সাময়িক পত্র' ও সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

• • •

সম্প্রতি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ২৮তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো কটকে। এই অধিবেশনের মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন আমাদের কলেজের পরিচালক সমিতির সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন, "এই সাহিত্য সভা কেবলমাত্র বঙ্গ সাহিত্যসেবীদের সভা নহে।" বাংলার সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "সংকীর্ণ মনোভাব বাঙলার কোনোদিন ছিলনা, পরকে সে আপন করিয়াছে, দূরকে নিকট করিয়াছে, এবং বাহিরকে ঘর করিয়াছে।" বাঙলার ও বাঙলার বাইরের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। রুগ্ণ প্রাদেশিকতার প্রকোপ থেকে মুক্ত একটি ভিন্নভাষী প্রদেশ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে সেদিন যে মর্যাদা দিয়েছেন তা অতুলনীয়। বাঙলার সাহিত্য সাধনা অখণ্ড ভারতের সংস্কৃতিতে একটি অমূল্য দান। প্রাদেশিকতা বর্জিত উড়িষ্যাবাসীদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। আমাদের কলেজের প্রতিনিধি দলের একটি বিবরণী অন্যত্র প্রকাশিত হলো।

• • •

এ-বছর পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পাঁচহাজার টাকার রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পেলেন হুগলী মহসীন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি যে মূল্যবান্ গ্রন্থটি রচনা করেছেন—সেটি হলো "বাঙালীর সারস্বত অবদান"। আমরা শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যকে অভিনন্দন জানাই।

• • •

আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর বিজন বিহারী ভট্টাচার্য সম্প্রতি কটকে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে ও আসানসোলে অনুষ্ঠিত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে

তাঁর নবাবিষ্কৃত টেলিগ্রাম প্রেরণ পদ্ধতি প্রদর্শন করে সমাগত প্রতিনিধি ও সুধী সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞান শাখার সত্যেন্দ্র নাথ বসু এই পদ্ধতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। আশা করি, আমাদের জাতীয় সরকার এই নবাবিষ্কৃত টেলিগ্রাম প্রেরণ পদ্ধতি গ্রহণ করে দেশে উত্তরোত্তর বিজ্ঞান-চর্চার প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করবেন।

কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছিলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ। রাষ্ট্রপতি পদে বৃত হবার পর পশ্চিমবঙ্গে এই তাঁর প্রথম আগমন। পৌষের প্রাচুর্যের মধ্যে রাষ্ট্রপতি বিশ্বভারতীর প্রথম সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করলেন; 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করলেন হাল বাঙলার দুই দিকপাল—পণ্ডিত ক্ষিতি মোহন সেনশাস্ত্রী ও নন্দলাল বসুকে। (শিল্পাচার্য নন্দলালের দুটি ছবি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে)। জাতির উদ্দেশে তাঁর প্রদত্ত ভাষণের মধ্যে কবিগুরুর সেই সাধনা ও জীবনাদর্শের মূল সুরটি খুঁজে পাওয়া গেল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতিকে 'ডক্টর অফ ল' উপাধিতে ভূষিত করা হলো। সমাবর্তন ভাষণে রাষ্ট্রপতি অভিভূত কণ্ঠে বললেন,—নিজের অধ্যবসায় আর চেষ্টা দিয়ে যে সম্মান পাবার চেষ্টা করেছিলাম, আজ তা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় সহজেই পেলাম। রাষ্ট্রপতি দীর্ঘজীবী হোন!

• • •

অবশেষে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবি জানিয়ে অন্ধ্রের কংগ্রেস-নেতা শ্রী পত্তি রামুলুকে আটান্ন দিন অনশনে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করতে হলো। জাতির মঙ্গল কামনায় দেশপ্রেমিক সত্যাগ্রহীর এই যে আত্মত্যাগ—নবগঠিত অন্ধ্রপ্রদেশের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। ভারত সরকারের ঘোষিত নীতি অনুসারে ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে অন্ধ্র প্রদেশ গঠিত হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয় কংগ্রেস তাঁদের বত্রিশ বছর পূর্বেকার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে পশ্চিম বঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণ নীতির প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান করবেন। সীমানা সম্প্রসারণ সম্পর্কিত বাঙলার এই দাবি অহেতুক কিংবা অসংগত নয়।

• • •

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নানা বাক্-বিতণ্ডা ও প্রতিকূল সমালোচনার মধ্য দিয়ে সরকারী ভাবে গৃহীত হলো। এই পরিকল্পনানুসারে ভারতের জনপ্রতি আয়

আগামী সাতাশ বছরে দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। জাতীয় আয় বর্ধিত হয়ে পৌঁছুবে বাৎসরিক ১০,০০০ কোটি টাকার কোঠায়। এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন খাতে যে ভাবে ব্যয় হবে তার তালিকা ও মোট টাকার শতকরা অংশ দেওয়া হলো।

	কোটি টাকা	শতকরা অংশ
কৃষি ও জনকল্যাণে	৩৬০·৪৩	১৭·৪
সেচ ও শক্তি উৎপাদনে	৫৬১·৪১	২৭·২
পরিবহন ও যোগাযোগে	৪৯৭·১০	২৪·০
শিল্পে	১৭৩·০৪	৮·৪
সমাজকল্যাণে	৩৩৯·৮১	১৬·৪
পুনর্বাসনে	৮৫·০০	৪·১
বিবিধ	৫১·৯৯	১·১
	২,০৬৮·৭৮	১০০·০

• • •

দেশের ভূমিসমস্যা সমাধানে আচার্য ভাবের ভূ-দান যজ্ঞ আন্দোলন এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান দিয়েছে। তিনি বৈপ্লবিক পন্থায় ও শান্তিপূর্ণভাবে ভূমি সমস্যা সমাধানকল্পে যে ভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন—আশাকরি ভগবানের কৃপায় তা সফল ও সার্থক হবে।

• • •

পাকিস্তান ক্রিকেট দল ভারতে সফরে এসেছিল। পাঁচটি অফিসিয়াল টেস্টে ভারত দুটিতে জয়লাভ করে ক্রিকেট ইতিহাসে সর্বপ্রথম 'রুবার' অর্জন করার সৌভাগ্য লাভ করে বাকি তিনটি খেলার মধ্যে দুটি অমীমাংসিত থাকে ও একটিতে পাকিস্তান জয়লাভ করে।

• • •

সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে যান। পাঁচটি অফিসিয়াল টেস্টে একটিতে 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ' দল জয়লাভ করে ও চারটি খেলা অমীমাংসিত থাকে।

• • •

এ-বছর বাংলার ক্রিকেট দলকে হারিয়ে চতুর্থবার ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানশিপ্ ও "রনজি ট্রফি" পাবার সৌভাগ্য লাভ করলেন হোলকার ক্রিকেট দল।

• • •

সম্পাদকের কথা

যাদের চেষ্টায় এবং উদ্যোগে কলেজ ম্যাগাজিনের এই সংখ্যাটির প্রকাশনা সম্ভব হলো, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথমেই আমাদের পত্রিকাধ্যক্ষের কথা বলতে হয়। তিনি পত্রিকা সম্পাদনা ব্যাপারে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাঁকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

নবীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নানাভাবে আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীরদকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের ঋণ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শোধ করা যায় না। আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'প্রথমা'র কবি শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র, ও শ্রীযুক্ত সুশীল জানার বিভিন্ন রচনা আমরা এই পত্রিকায় প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। তাঁদের স্নেহ ও প্রীতি থেকে আশুতোষ কলেজের ছাত্রদল কোনোদিনই বঞ্চিত হবেনা। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ব্যাপারে যথোচিত সাহায্য করেছেন আমাদের কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভাস রায় চৌধুরী ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ও কলেজের ছাত্রদের তরফ থেকে এঁদের ধন্যবাদ জানাই। এ ছাড়া নানা ভাবে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র দে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলজা ভট্টাচার্য, বন্ধুবর শ্রীসুনীলময় ঘোষ (তৃতীয় বর্ষ সাহিত্য) ও প্রথম বার্ষিক কলা বিভাগের ছাত্র শ্রীআলোক কুমার হালদার ; এঁদের কেউ দিয়েছেন লেখা, কেউ-বা দিয়েছেন অমূল্য উপদেশ। এঁদের সাহায্য ব্যতিরেকে সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হতোনা।

কলেজ ইয়ুনিয়নের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরিমল কর ও সম্পাদক শ্রীতীর্থরেণু চন্দ্র আমাদের কাজে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন।

আমাদের পত্রিকার মুদ্রাকর শ্রীরথীন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী এই পত্রিকার সত্বর প্রকাশ করার কাজে সহায়তা করে ও প্রুফ দেখে দিয়ে আমাদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হলেন।

সর্বশেষে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সোমেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে। তাঁর শুভেচ্ছাই আমাদের কলেজ ম্যাগাজিনের প্রাণ।

অজস্র দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা এই পত্রিকা প্রকাশ করছি। আশা করি ছাত্রবন্ধুরা ও শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দ এটিকে সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করবেন। আমরা সার আশুতোষের এই মহতীস্মৃতির দায়িত্ব বহন করে কতখানি অগ্রসর হলাম লক্ষ্যের পথে—ভবিষ্যৎ তা বিচার করবে। ২৫ এপ্রিল ১৯৫৩

অচিন্ত্যকুমারের চিঠি

[অচিন্ত্যকুমারকে পাঠকসমাজে পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার নেই। বাছা-বাছা বিশেষণ যোগ করে হাল্‌কা করবোনা প্রীতির বন্ধন। আমাদের কাছে তাঁর প্রথম এবং প্রধান পরিচয় তিনি আশুতোষ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। নবীন ও প্রবীণের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক আজও তা কতখানি অটুট আছে, তার পরিচয় পাওয়া যাবে নীচের চিঠিতে। তাঁর স্নেহ ও প্রীতির নিদর্শন 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রকাশ করতে পেরে খুশি হয়েছি।—সম্পাদক]

ওঁ

মেদিনীপুর

২১. ৪. ৫৩

প্রীতিভাজনেষু,

ছোট্ট এক টুকরো লেখা পাঠালাম। প্রাপ্তি সংবাদ দিও। 'আশুতোষ কলেজ' ও তাকে কেন্দ্র করে যা-কিছু, সমস্তর উপরেই হৃদয়ের পক্ষপাত। নিজের প্রথম যৌবনকে নিশ্চয়ই খুব ভালোবাসি। আর যৌবনের সেই কঠিন-কোমল দিনগুলি কেটেছে এই 'আশুতোষ কলেজে'।

বন্ধু অমিয়রতনকে বোলো আমার কথা।

তোমাদের

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সম্পাদক শ্রীদুলাল দাসকে লিখিত।

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

যাকে দেখা যায়না তারই জন্য বিরহ। যাকে স্পর্শ করা যায়না সেই আবার জলস্থল ঘরবাড়ি দেহমন সব ভরে রয়েছে।

যা শীর্ণ হয় তাই শরীর। যা সরে-সরে যায় তাই সংসার।

একদিকে কাল, আরেক দিকে সংসার। অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল আর চির-প্রবহমান সংসার-স্রোত।

কী ভাবে থাকবে এই সংসারে?

কতভাবে কত উপমা গেঁথেছেন রামকৃষ্ণ। একেকটি উপমা একেকটি নক্ষত্র।

'নর্তকীর মতন থাকবে।' বললেন রামকৃষ্ণ। 'নর্তকী যেমন মাথায় বাসন করে নাচে। পশ্চিমের মেয়েদের দেখনি? মাথায় জলের ঘড়া, হাসতে-হাসতে কথা কইতে-কইতে যাচ্ছে।'

আকাশকে মাথায় রেখে পৃথিবী যেমন কাজ করছে। ঘুরছে তার অক্ষদণ্ডকে আশ্রয় করে।

একটি ছন্দের মধ্য দিয়ে দেখতে চাইলেন সৃষ্টিকে। ছন্দ থেকেই বিশ্ব বিবর্তিত হচ্ছে। সমস্ত বিশ্ব একটি ছন্দের পরিণাম। একটি ছন্দের প্রস্ফুরণ। গতি এগিয়ে চলেছে কিন্তু চরম লক্ষ্য হচ্ছে স্থিতি। ক্রমশই একটি অপরিবর্তনীয় ভাবের সমীপবর্তী হবার চেষ্টা। ক্রমশই সাম্য স্থৈর্য সন্নিধান। একটি ধ্রুব শান্তির দিকে লক্ষ্য।

গান যেমন বারে-বারে মূলে ফিরে আসে, তেমনি সমস্ত গতি ফিরে-ফিরে আসবে শরণাগতিতে। তার শান্তির মন্দিরে। তার ছায়াপথ বৃক্ষের পাদদেশে। দুরন্ত-ক্লান্ত শিশু যেমন তার মার অঞ্চল প্রান্তে।

'থাকো পানকৌটির মত।' বললেন আবার রামকৃষ্ণ। 'পানকৌটি জলে সর্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই গায়ে আর জল থাকে না।'

একটি পাখির সঙ্গে উপমা।

প্রবৃত্তির মধ্যে আছ, কিন্তু তুমি ব্রহ্মময়ীর বেটা, পঙ্ক ছেড়ে উঠে এস নিবৃত্তির গিরিচূড়ে। বারে-বারে পাখা ঝাড়া দাও। বারে-বারে মেঘ আসে, মুছে ফেল সে মেঘের মালিন্য। দেখাও তোমার সেই অগাধ নীলকান্তি। ঝড় আনো। সমস্ত মেঘবিকার দূর করে দিয়ে দেখাও তোমার সেই সুনীল সরলতা। স্বচ্ছ অনাবরণ।

আরেকটি পাখির উপমা দেখবে?

একি কবিতা? না বিরল চিত্রপট?

'সমুদ্র দিয়ে একটা জাহাজ চলেছে। কখন কে জানে একটা পাখি এসে উড়ে বসেছিল মাস্তুলে, খেয়াল নেই। চারদিকে কূলকিনারা নেই দেখে হঠাৎ তার চটকা ভাঙল। তখন মনে হল ডাঙায় ফিরে যাই। যাত্রা করল উত্তরে, কোথায় উত্তর? একটি তরুরেখার দেখা নেই। তাই ফের ফিরে এল মাস্তুলে। ভাবল, দক্ষিণে বোধ হয় দাক্ষিণ্য আছে, তাই আবার দক্ষিণমুখো পাখা ঝাপটালো। কোথায় দক্ষিণ! দক্ষিণও প্রতিকূল। কূলের সঙ্কেত নেই কোনোখানে। তাই আবার মাস্তুলে এসে হাঁপ ছাড়ল। তারপর, এবার চলল পূবে। পূবেও পূর্ববৎ। শুধু জলের একটানা শুভ্রতা। শ্যামলিমার লেশ নেই। আবার উড়ে এসে মাস্তুল ধরল। সবদিক হল, পশ্চিম দেখতে দোষ কি। হয়ত সেদিকেই মিলবে রঙিন বৃক্ষশাখা। হায় প্রতীচীও পরাঙ্মুখ। তখন পাখি আর কি করে! মাস্তুলের উপরেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পড়ল। আর কোনোদিকে চায় না, আর কোনোদিকে যায় না। ভাবে, সমুদ্রে এই মাস্তুলই আমার স্থির আশ্রয়। সংসার-সমুদ্রে সমস্তদিক ঘুরে সমস্তদিক ত্যাগ করে বোসো এসে বৈরাগ্যের একাসনে।'

আরো একটি পাখি আছে। তার নাম হংস। হংসের এক অর্থ পরমাত্মা। আরেক অর্থ প্রাণবায়ু। পরমাত্মাই প্রাণবায়ু।

বললেন, 'জলে-দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয়রস। হংসের মত দুধটি নিয়ে জলটি ত্যাগ করো।'

পিঁপড়ের যখন পাখা হয়, তখন সেকি পাখি হয়? সেটা তখন অহঙ্কারের পাখা, তাই সে তখন মরে। কিন্তু এমন যখন সে ক্ষুদ্র পিপীলিকা, তখন তার থেকেও শেখবার জিনিস আছে।

তার আগে, তার পায়ে যে নূপুরের শব্দ হয় তা জানো? সে নূপুরের শব্দ শুনেছেন রামকৃষ্ণ। বলেছেন, 'ঈশ্বর উৎকর্ণ হয়ে আছেন। তিনি পিঁপড়ের পায়ের নূপুর-গুঞ্জন শুনতে পান।'

তেমনি তিনি শুনছেন আমার হৃদয়-ঘড়ির টিকটিক। আমার রক্তের রুনুঝুনু।

এ-হেন যে পিঁপড়ে সে কখনো তুচ্ছ হতে পারে না। সে আমাদের গুরু।

'পিঁপড়ের মত সংসারে থাকো। বালিতে-চিনিতে মিশিয়ে রয়েছে সংসারে। নিত্যে আর অনিত্যে। বালিটুকু ছেড়ে চিনিটুকু নাও।'

একটি মিষ্টতার সঙ্গে ঈশ্বরস্বাদের তুলনা দিলেন। কিন্তু ঈশ্বর কি শুধু মধুরের বৃষ্টিধারা? শুধুই কি 'মিছরির রুটি'?

ক্ষুধার দুঃখ ছাড়া ভোজনের সুখ কই? সারাদিন মন যদি উন্মনা না হয় তবে কিসের মিলন সন্ধ্যা? যদি উন না থাকে তবে কিসের পূর্ণ?

না, ঈশ্বর একটি ব্যথার মত। নিরবচ্ছিন্ন ব্যথা। নিদ্রাহীন নিরঙ্কুশ ব্যথা।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'দাঁতের ব্যথার মত।'

এমন কোনো যন্ত্রণা নয় যে বিছানায় নিশ্চল করে রাখে। হাত চলে পা চলে, তাই ব্যথা সয়েও কাজ করতে হয়, কিন্তু যাই কাজ করো, সর্বক্ষণ মন পড়ে থাকে ব্যথার দিকে।

তেমনি দুহাতে কর্তব্য করে যাও কিন্তু মন রাখো সেই ব্যথার দিকে। ঈশ্বরের দিকে। এমন ব্যথা নয় যে তোমাকে কাজ থেকে ছুটি দিচ্ছে—অথচ এমন ব্যথা যে তোমাকে এক দণ্ডও ভুলে থাকতে দিচ্ছেনা। ঈশ্বর তোমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন অথচ নিয়তজাগ্রত হয়ে আছেন একটি নিরুচ্ছেদ ব্যথার মত।

ব্যথা হয়ে প্রথমে মনে করান, পরে মন ভোলান আনন্দ হয়ে। যে ব্যথা সেই উপশম। যে ব্যাধি সেই চিকিৎসা। ব্যথা আর আনন্দের মধ্যে মন হচ্ছে পারাপারের সেতু। এই হাটে ব্যথা তো ঐ হাটে আনন্দ।

ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণের তীব্রতাটা তিনি বুঝিয়েছেন আরেকটি তীক্ষ্ণ উপমায়:

'সংসারে নষ্ট স্ত্রীর মত থাকো।'

নষ্ট স্ত্রী নীরবে হাসিমুখে ভালো মানুষটির মত ঘরকন্নার সমস্ত কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু মন পড়ে রয়েছে উপপতির উপর। কেউ জানতেও পাচ্ছেনা তার মনের সঞ্চলতা, তার মনের ঔৎসুক্য। চোখ দুটি তার সমস্তক্ষণ পিপাসু হয়ে রয়েছে কখন তার বল্লভ সে একটি ইসারা পায়। গায়ের রক্ত উৎকর্ণ হয়ে আছে কখন তার একটি অস্ফুট শব্দ শোনে। নিশ্বাস স্তব্ধ হয়ে আছে কখন বাতাসে আসে তার একটি সুবাসের আভাস।

তেমনি সর্বক্ষণ উচাটন হয়ে থাকো। থেকে-থেকে ঈথরের সঙ্কেতটি কুড়িয়ে নাও। বেণু কোথায় কে জানে, তার ধ্বনিটি শোনো। দীপ কোথায় কে জানে, তার আলোটি দেখ। তোমার আশে-পাশে, সংসারের চারপাশে, গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে কত ইসারা ছড়িয়ে রয়েছে। প্রতীক্ষায় চক্ষুষ্মান হও। বৃষ্টিবিন্দুতে দেখ সেই আকাশের প্রতিবিম্ব।

সংসারে অভ্যাগত এই যে একটি নবজাত শিশু—এর মুখের হাসিটি কার হাসি? প্রথম মমতার স্পর্শে মার চোখে যে কোমল বিহ্বল দৃষ্টি, এটি কার দৃষ্টি? তুমি না দেখবে তো তোমার জানলার ওপারে চাঁদ কেন? তুমি যদি না শুনবে তবে সমুদ্র কেন মাথা কুটে মরছে? তুমি ঘরে এসে স্তব্ধ হলেও সে কেন স্তব্ধ হচ্ছেনা? কোন অজানা অরণ্যে বিজনে যে একটি ফুল ফুটেছে সে তো তুমি একদিন এসে দেখবে বলেই। এবারের বসন্তটি চলে গেল। ভয় নেই। তুমি যদি দেখ সে-আশায় আবার সে আসবে। নিয়ে আসবে তার মুহূর্তের প্রজাপতি। তুমি দেখবে সেই আনন্দে আবার সে ফুল ফোটাবে, রঙ ধরাবে, উঁকিঝুঁকি মারবে। বারে-বারে তাকে ফিরিয়ে দিলেও সে ফেরে না। শুধু অপেক্ষা করে। ঝরা পাতার কান্নার পর পুঞ্জ-পুঞ্জ কিশলয় হয়ে কচি-কচি আঙুলে হাতছানি দিয়ে ডাকে। যদি তুমি সাড়া দাও। দিনে-রাত্রে তারায়-তৃণে তোমাকে অসংখ্য চিঠি লেখে। যদি মন কেমন-করা ভাষায় কখনো একটা উত্তর দিয়ে ফেল।

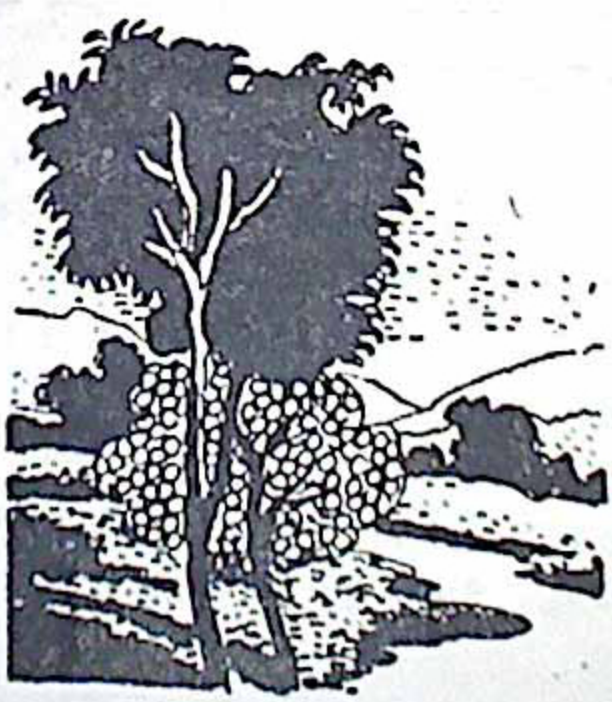

পৌষ-উৎসবে শান্তিনিকেতন

শ্রীরণজিৎকুমার ভট্টাচার্য

[প্রথম বার্ষিক বিজ্ঞানের ছাত্র। ভ্রমণ বিলাসী লেখকের পৌষ-উৎসবে শান্তিনিকেতনের আনন্দে টল-মল-করা তিনটে দিনের কাহিনী নিজস্ব সংবাদদাতা কিংবা নিউজ-এজেন্সির টাট্‌কা খবরের চেয়েও মুখরোচক। ঝর-ঝরে লেখার মধ্য দিয়ে এই আনন্দের স্পর্শ আমাদেরও ছুঁয়ে-ছুঁয়ে গেল।—সম্পাদক]

পৌষ-উৎসব শান্তিনিকেতনের সব চাইতে বড় উৎসব। প্রতি বৎসর সাতই পৌষ এ উৎসব আরম্ভ হয় আর নয়ই পৌষ শেষ হয়ে যায়। এ উৎসবের জন্য শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকরা ত বটেই, বাইরের লোকেরাও সারা বছর ধরে সাগ্রহে দিন গুনতে থাকেন। পৌষ-উৎসবের স্মৃতিও অতি পবিত্র। একষট্টি বৎসর পূর্বের এক সাতই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের জন্যে বহু-স্মৃতি-বিজড়িত ছাতিমতলায় দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর একত্রিশ বৎসর আগে আর এক সাতই পৌষ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সর্বযুগের, সর্বমানবের মিলনক্ষেত্র বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। সেই বিশ্বভারতী আজ ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে নিখিল বিশ্বজনের অন্তরে ভারত-আত্মার পুণ্য বাণী পৌঁছে দিচ্ছে। তাই পৌষ-উৎসবের স্মৃতি বড় মধুর। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকরা অপেক্ষা করতে থাকেন এই দিন কয়টির জন্য—বৎসরান্তে আবার তাঁরা যেদিন মিলিত হবেন উৎসবপ্রাঙ্গণে আর এক বছরের জন্য সঞ্চয় করে রাখবেন স্মৃতির মণিকোঠায় আনন্দ হিল্লোলিত দিনগুলি।

সাতই পৌষের প্রত্যূষে ঘুম ভেঙ্গে গেল দিগন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত অতিথি-ভবনের এক শয্যায়। চোখ মেলেই তাকিয়ে দেখলাম পূর্ব-দিগন্তকে অপূর্ব অরুণ আভায় উদ্ভাসিত করে সূর্যদেব উদিত হচ্ছেন। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম একটু ঘুরে আসবার জন্য। অতিথি-ভবনের চারদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর সকালের সোনালী সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে। দেখে মন আনন্দে ভরে উঠলো।

সাতটা বাজতেই ধীরে ধীরে ছাতিমতলার দিকে এগিয়ে চললাম। সাড়ে সাতটায় সেখানে উপাসনা আরম্ভ হলো। চারিদিকে ধীর-গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে পৌষের এই স্নিগ্ধ প্রভাতে সমাহিত ও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সকলে উপাসনায় যোগ দিলেন। বিশ্ব-

ভারতীর পরম বরণীয় আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন উপাসনা পরিচালনা করছেন। চারদিকে গভীর স্তব্ধতা। মন যেন ক্ষণিকের জন্য এই বিশ্ব প্রকৃতিকে পিছনে ফেলে এক আনন্দময় অমৃতলোকে পৌঁছবার জন্য সাড়া দিলো; সমস্ত আবিলতা তুচ্ছতার উর্ধ্বে এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি লাভ করলো—যেন 'সত্য' 'শিব' আর 'সুন্দর' এর বাণী বয়ে নিয়ে এলো অনন্ত উর্ধ্বলোক থেকে। মন আপনিই ভরে উঠলো পরিপূর্ণতায়।

সাড়ে ন-টায় আম্রকুঞ্জে আশ্রমিক সঙ্ঘের অধিবেশনে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হলো। তার উত্তরে তিনি বললেন—"যাদের চিরদিন ভালবাসি তাদের এখানে একত্র সম্মিলিত দেখে আজ আমার যে আনন্দ তা অবর্ণনীয়।... যে আত্মমানগণ তোমাদের শ্রদ্ধাপ্রীতি অমৃতের মতো।...এখানের সম্মানের আসল পাত্র গুরুদেব আমরা তাঁর সাধনা নিয়েই অগ্রসর হয়েছিলাম। আকাঙ্ক্ষা যতই হোক্ শক্তি বড়ো কম ছিল।

'শক্তি মোর অতি অল্প, হে দীনবৎসল
আশা মোর অল্প নহে।'

উনিশশো সাত সাল, ডিসেম্বর মাস। আমি হিমালয়ে আছি। পোষ্টাপিসে গিয়ে একখানি চিঠি পেলাম। অপূর্ব হস্তাক্ষর। খুলে দেখলাম লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি আমাকে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের কাজে ডাকছেন। আশ্রমের কাজ! কোন্ সাহসে যোগ দেবো? তাঁকে নিজের অযোগ্যতার কথা জানালাম। তিনি কিছুই মানলেন না। লিখলেন, চলে আসুন।...চারদিকেই বাধা।...তবু আষাঢ়ের প্রথমেই শান্তিনিকেতনে চলে এলাম।... মহর্ষির সাধনাপীঠ শান্তিনিকেতন একটি পরম তীর্থস্থান। গুরুদেবের সাধনা এতে যুক্ত হয়ে এখানে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম ঘটলো। তাই এখানে কত মহাপুরুষের দর্শন এই অর্ধশতাব্দী ধরে পেয়েছি।...আমরা ত এখন বিদায় নিচ্ছি।...যাবার সময় এই প্রার্থনা জানিয়ে যাচ্ছি ভগবানের কৃপায় ও আশীর্বাদে তোমরা ধন্য হও। গুরুদেবের আশীর্বাদে তোমাদের জীবন সার্থক হোক। আমাদের আশ্রম কৃতার্থ হোক্।"

শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁর কথা শুনলাম। দুপুর এগিয়ে আসছে। স্নান খাওয়া সেরে নিতে আস্তানার দিকে অগ্রসর হলাম। দুপুর একটায় কবিগানের আসর। গলায় চাদর দুলিয়ে হেলে-দুলে অঙ্গভঙ্গী করে দুই পক্ষের কবির লড়াই চলল গানের মধ্যে দিয়ে। শুনতে বেশ ভালই লাগলো। তারপর এগিয়ে চললাম মেলা-প্রাঙ্গণের দিকে। মেলা হিসেবে এমন কিছু বড়ো নয়, তবুও এর আকর্ষণ অনেক। তারপর চললাম গুরুদেবের

বাড়ি 'উত্তরায়ণের' দিকে। বিরাট জায়গা জুড়ে বাড়ির সীমা। ভেতরে ফুল ফলের গাছ অজস্র। বীরভূমের রুক্ষতাকে ঢেকে দিয়েছে শ্যামল সবুজের সমারোহ; আর তারই মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গুরুদেবের স্মৃতি-বিজড়িত 'উত্তরায়ণ'। মেলার সময় ভেতরে ঢোকা নিষেধ। তাই বাইরে থেকে দেখেই সাধ মেটাতে হলো। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরতেই সন্ধ্যে হয়ে এলো। আমরাও আম্রকুঞ্জে এসে বসে রইলাম। সময় দেখতে দেখতে কেটে গেলো। হঠাৎ এক বোমার শব্দে চমকে উঠলাম। তখন খেয়াল হলো আটটায় বাজী পোড়ানোর কথা রয়েছে যে। দৌড়! দৌড়! দেখতে দেখতে মেলা খালি হয়ে গেলো। আগুপিছু না তাকিয়ে সব লোক ছুটেছে বাজী পোড়াবার জায়গার দিকে। আমরাও ভিড়ের মধ্যে গা ছেড়ে দিয়ে পৌঁছে গেলাম সেই জায়গায়। অনেকক্ষণ ধরে নানা রঙের বাজী পোড়ান হলো। এক সময় তাও শেষ হলো। আমরাও ফিরে চললাম আস্তানার দিকে।

আটই পৌষের সকাল। আজ বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসব। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র-প্রসাদ ভাষণ দেবেন। তাই এসে পৌঁছলাম সমাবর্তন উৎসবের স্থান আম্রকুঞ্জে। চমৎকার আল্পনা দিয়ে সাজানো হয়েছিল রাষ্ট্রপতির বসবার জায়গা এবং উপাধি নেবার জায়গাটি। ঠিক নটায় রাষ্ট্রপতি এসে পৌঁছলেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রদ্ধেয় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করলেন রাষ্ট্রপতিকে ও সমস্ত বিভাগের অধ্যক্ষদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর রাষ্ট্রপতি আসন গ্রহণ করলে পর তাঁকে বরণ করা হলো বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে। এর পরই সমাবর্তন উৎসব আরম্ভ হলো।

প্রথমেই আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনকে বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ উপাধি "দেশিকোত্তম" দেওয়া হলো। তাঁকে উদ্দেশ করে উপাচার্য বললেন, "জীবনের অর্ধশতাব্দী কাল বিদ্যাচর্চায় একান্ত নিষ্ঠার সহিত লিপ্ত থাকিয়া আপনি আমাদের সম্মুখে জ্ঞান সাধনার এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের মহৎ অনুপ্রেরণা আপনার আজীবন সাধনার মধ্যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সত্য সন্ধানে আপনার নিরলস অধ্যবসায়ের দ্বারা আপনি আজীবন বিশ্বভারতীর অন্যতম আদর্শের সেবা করিয়া আসিয়াছেন।"

তারপর আচার্য নন্দলাল বসুকেও "দেশিকোত্তম" উপাধি দেবার কথা ছিলো। কিন্তু অসুস্থ থাকায় তিনি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নি। তবু তাঁকে উদ্দেশ করে উপাচার্য বললেন—"বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীরূপে বিশ্বের সকল

দেশেই আপনার নাম আজ সুপরিজ্ঞাত।.....শিল্পের যে সার্থক পরিবেশ আপনি আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা চিরকালের মতো এই বিশ্ববিদ্যাতীর্থকে ঐশ্বর্য-মণ্ডিত করিয়া রাখিবে।" পরম বরেণ্য এই দুজনকে উপাধি দিয়ে বিশ্বভারতী নিজেকেই সম্মানিত করলেন। এরপর স্নাতকদের উপাধি দেবার পর রাষ্ট্রপতি তাঁর অভিভাষণ পড়তে শুরু করলেন। ভাষণটি বেশ বড় এবং তথ্যবহুল হয়েছিলো। সবাই উৎসুক ছিলেন রাষ্ট্রপতির ভাষণ শোনার জন্যে। তিনি বাংলায় বললেন—তবে উচ্চারণ একটু আড়ষ্ট। যখন ভাষণ পাঠ হচ্ছে তখন চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রায় হাজার দেড়েক লোক—কেউ দাঁড়িয়ে—কেউ বা বসে নিস্তব্ধ হয়ে ভাষণ শুনছেন। কোনোদিকে একটু নড়াচড়া নেই। চারদিকে বড়ো বড়ো গাছের মাঝখানে ছোটো ছোটো আমগাছ ঘেরা 'আম্রকুঞ্জে' গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে সকলের চোখে মুখে পড়েছে। সমস্ত দিকে এক গভীর প্রশান্তি বিরাজ করছে। মন যেন স্বর্গরাজ্যের আনন্দে আর আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। অভিভাষণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমাবর্তন উৎসবেরও পরিসমাপ্তি ঘটলো।

তখন দল বেঁধে সবাই বেরিয়ে পড়লাম একটু ঘুরে আসবার জন্যে। শ্রীনিকেতনের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। বীরভূমের লাল মাটিতে পা ততক্ষণে লালে লাল হয়ে গিয়েছে। যেতে যেতে দুধারে গাছপালা ঘেরা ছোটো ছোটো বাড়ি চোখে পড়লো। শুনলাম এগুলি বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের বাড়ি। বেলা অনেক হওয়ায় শ্রীনিকেতন আর যাওয়া হলো না। তাই ফিরে এলাম। কলাভবনের কাছে এক চমৎকার ছায়াঘেরা বসবার জায়গায় অনেক্ষণ বসে রইলাম। সবদিক রোদে ঝলমল করছে—মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে, সবদিকেই যেন এক আনন্দময় শান্তির ছায়া। সত্যই শান্তি-নিকেতন।

বেলা দুটোর সময় সাঁওতালদের খেলাধুলা আরম্ভ হলো। লক্ষ্যভেদ করার প্রতিযোগিতা তার মধ্যে প্রধান ছিলো। সেদিনও সন্ধ্যাবেলা বাজী পোড়ানো হলো। সে কি লোকের ভীড়! হাজার হাজার লোক সেদিন ঐ জায়গাটিতে জমা হয়েছিলো।

নয়-ই পৌষের সকাল। আজই কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। আজও সকালে কয়েকটা অনুষ্ঠান ছিলো। কিন্তু তাতে যোগ দিতে পারবো না বলে মনটা বড়ই মুষড়ে পড়লো।

তিনদিনে শান্তিনিকেতনের মায়া আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। ছাড়তে মন চাইছে না কিন্তু আজতো যেতেই হবে।

শিল্পাচার্য

শ্রীনন্দলাল বসুর

দুটি

দিনের শেষে

ফটো - ইন্দু গুপ্ত
তৃতীয় বর্ষ বিজ্ঞান

ালিয়া

ফটো - সৌরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
দ্বিতীয় বর্ষ বিজ্ঞান

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলা নাটক

শ্রীমৃদুলকান্তি বসু

[চতুর্থ বর্ষ সাম্মানিক বাঙলার ছাত্র। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাটকের বিভিন্নদিক নিয়ে দিগ্‌দর্শী আলোচনা করেছেন লেখক। "রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে ফুটে-ওঠা সবচেয়ে বড়ো সত্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ কবি"—লেখকের এই উক্তির সঙ্গে আমরাও একমত। এই মাপকাঠিতে রবীন্দ্রনাথের ও বাঙলা নাটকের বিচার,—যেমনি সাবলীল, তেমনি সহজ ও স্বচ্ছ।—সম্পাদক]

আধুনিক বাঙলাসাহিত্যের উন্নত যুগ যে পুরোমাত্রায় ইংরেজীপ্রভাবের ফল তা একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। বাঙলা নাটকও এই আধুনিক যুগের সৃষ্টি। পুরোনো-যুগের যাত্রা-কথকতার স্পর্শ থেকে এযুগের বাঙলা নাটক মুক্ত। কিন্তু বাঙলার সমালোচনা সাহিত্যের মত বাঙলার নাট্যসাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি যে হয়নি তা ইংরেজীসাহিত্যের সঙ্গে এর তুলনা করলেই বোঝা যায়। কিন্তু বাঙলাসাহিত্যে নাট্যকলার সর্বাঙ্গীণ ও যথেষ্ট উন্নতি হয়নি এটা যতখানি সত্য একথা তার থেকেও বেশী সত্য যে, বাঙলার নাট্যকলা এক বিশেষ খাতে যে উন্নতি করেছে তা পৃথিবীর অনেক সাহিত্যেই দুর্লভ। এ দুর্লভ ধারার নাটক এসেছে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

বাঙলা নাটকের রবীন্দ্রপূর্ব ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তখন নাটকের বিষয়বস্তু বলতে ছিল শুধুই ধর্মের অনুশাসন, ভক্তির ভাবালুতা আর ইতিহাসের কল্পনা। নাট্যকারের সংখ্যাধিক্য থাকলেও বিশিষ্ট রচনারীতির বহুত্ব ছিল না। গিরিশ-ক্ষীরোদ-দ্বিজেন্দ্রের নাটকের মধ্যে শেক্‌স্‌পীয়রের অনুসরণে নাটকের রীতিতে একই বিষয়ের একঘেয়েমি ছাড়া আর কিছুই নেই। সাধারণের এই পায়ে-চলা পথের বাইরে হঠাৎ রবিচুম্বী রবিপ্রতিভার চমক-লাগানো মুক্তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হল। প্রতিদিনের ধুলোমাখা জীবনের মাঝখানে অপরিচিতের হঠাৎ স্পর্শ বা প্রতিরাত্রের আকাশের একই ছবির মাঝে পাগলপারা নীহারিকার হঠাৎ ছুটে চলা মনোবীণায় যে অভূতপূর্বের মীড় লাগিয়ে যায়, নাটকের বীণায় রবীন্দ্রনাথের সুরবৈচিত্র্যে তারই কথা মনে পড়ে। এই সুরবৈচিত্র্যের ফলেই বাঙলা নাটকের গতিপথ অভাবনীয়ভাবে মোড় ফিরল।

নাটকের বিষয় ও রীতির ক্লান্তিকর একতান ছেড়ে কি বস্তু, কি ভঙ্গী—সব দিকেই নতুন পথে এগিয়ে চলবার বলিষ্ঠ ও সুন্দর পরিচয় আছে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে। তাঁর নাটকের রচনার রীতিবৈশিষ্ট্য অন্যান্য সকলের থেকেই পৃথক হয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে; কিন্তু এ বৈশিষ্ট্যে উগ্রতা নেই, আছে কমনীয়তা। রীতির মাধ্যেও যেন কবিত্বের ফুল ফুটেছে। প্রচলিত অঙ্কবিভাগ বাদ দিয়ে কয়েকটি দৃশ্য দিয়ে একটি নাটক রচনা অথবা সমস্ত বিভাগই ছেড়ে শুধু একটিমাত্র বড় দৃশ্য দিয়ে নাটক রচনা কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই সম্ভব; তার পরিচয় আছে 'অচলায়তন' ও 'মুক্তধারা'য়। পুরোনো পঞ্চাঙ্করীতি ছেড়ে এই নতুন পথে চলার মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনি ক্ষমতার পরিচয় আছে, তাঁর নাটকের সংলাপে। সেখানে চরিত্রভেদে ভাষার পরিবর্তন করা হয়নি, কিন্তু কবিত্বের অপরূপ মাধুর্যে ভাষায় একঘেয়েমির বিরক্তি ফুটে উঠেনি, নাটকে রবীন্দ্রী সংলাপের আকর্ষণ বেড়ে উঠেছে। বাইরের রীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের বস্তুও বদলে গেছে; সত্যি বলতে হলে, নাটকের আন্তর পরিবর্তনের নতুনত্বের জন্যই তার রীতির পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। নাটকের বিষয়বস্তুর এই নতুনত্ব পৃথিবীর নাট্য-সাহিত্যে যদিও খুব নতুন নয় যেমন নতুন বাঙলা সাহিত্যের আসরে, তবুও একথা ঠিক যে, এগুলির মধ্যে প্রতিভার যে বলিষ্ঠ ছাপ, চিন্তাধারার যে মহনীয় স্বাতন্ত্র্য, নাটকীয়তার যে অপূর্ব বিকাশ এবং রচনাভঙ্গীর যে প্রশংসনীয় নতুনত্ব আছে তা কেবল বিশেষ দেশের গণ্ডী বা বিশেষ কালের সীমার মধ্যেই বাঁধা নেই, তা সমস্ত ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়ে উঠে সাহিত্যের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত ভাস্বর।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে ফুটে-ওঠা সবচেয়ে বড় সত্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ কবি। তিনিও বলেছেন—"একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।" কবিত্বের পরিচয় আছে তাঁর নাটকের মধ্যেও। কিন্তু তাঁর নাটকের এ কবিত্ব দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের কবিত্ব থেকে ভিন্ন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্ব শুধু উচ্ছ্বাস, শুধু অলঙ্কার—নাটকের গতিপথে যা মাঝে মাঝে বাধা হয়ে উঠেছে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের ফোয়ারার উৎস আছে তাঁর মানসের গভীরে। তাই সে কবিত্ব নাটকে চাপানো ভার নয়—তা নাটকের অলঙ্কার, তা নাটকের প্রবাহপথে আবর্ত সৃষ্টি করেনি,—তাকে দিয়েছে গতির ঐশ্বর্য। এখানেই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের ঐশ্বর্য এর গীতিধর্মের সাবলীল সুরপ্রবাহে। এরই মাঝে রবীন্দ্রনাথ পাঠকের চোখে যেমন সৌন্দর্যের মুগ্ধতার মোহজাল ছড়িয়ে দিয়েছেন তেমনি

বাংলার নাট্যকারদের কাছেও নতুন পথ দেখিয়েছেন; শুধু তাই নয়, নিজেই সেপথের শেষ প্রান্তসীমায় এগিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রায় পঞ্চাশটি নাটকের সমস্তই এক খাতে বয়ে গিয়ে বৈচিত্র্যহীনতার বিরক্তিতে আবহাওয়া বিষিয়ে তোলেনি, এতেও সুরের বিভিন্নতা ও বিষয়বস্তুর পার্থক্য আছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সাগরের মত,—বিরাট যার বিস্তার দুরান্তশায়ী দিগন্ত যার পরিধি। এর মধ্যে ভাবের যে বিস্তৃতি নাটকের মধ্যে তারই প্রকাশের তরঙ্গ। এই তরঙ্গমালার উৎপত্তির মূলকে অল্প কথায় বলা যায় সৌন্দর্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস। প্রকৃতির মাঝে ফুটে-ওঠা সৌন্দর্যের হিল্লোলের মায়া, সুন্দরের প্রকাশ তাঁর মনকে মুগ্ধ করেছে, আবিষ্ট করেছে, উদ্দীপ্ত করেছে। তাই যে কবি বলেছেন—"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে", তিনিই নাট্যকার হয়ে লিখলেন—"সুন্দর এই পৃথিবী। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।" সেই নমস্কারের প্রকাশ হয়েছে 'বসন্ত', 'ঋতুরঙ্গ' এসব নাটকের মধ্যে। এভাবে বিরাট বিশ্বলোকের মধ্যে অপরূপকে যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সেই মানবের কবিই 'স্বর্গ হইতে বিদায়' নিয়ে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনা করলেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' থেকে মানসদ্বন্দ্বের নিপুণ প্রকাশ বাদ দিলেও সৌন্দর্যে তৃপ্তির যে ব্যঞ্জনা আছে, কবি নাট্যকারের মনের যে অনুপম পরিচয় আছে তার দামও কম নয়। শুধু কয়েকটি বাছাই করা নাটক নয়, তাঁর সমস্ত নাটকেই সুন্দরের কামনা প্রকাশিত।

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁর কবিত্বে। তাই নাটকের মধ্যেও সেই কবিত্ব ফুটে উঠেছে, তা নাটককে সুন্দর করে তুলেছে। 'চরৈবেতি'র যে অঙ্কুর আছে তাঁর কাব্যে, নাটকের মধ্যে তাই ফুল হয়ে ফুটেছে। চলার গতিতে জীবনের যে প্রকাশ, সুন্দরের যে লীলা তা কবিমানসে আনন্দহিল্লোল তুলবেই। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়েই যে নাটক বেরিয়ে এল তার মধ্যেও এই ভাবের ছাপ থেকে গেল। 'তাসের দেশ' নাটক সেকথারই পরিচয় দেয়।

রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটকের সংখ্যা অনেক। সেদিক থেকে তাঁকে অনায়াসেই নাট্যকার বলা চলে। কিন্তু কবিত্বের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কবিত্বের মাধুর্য তাঁর নাটকগুলির অপরূপতার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর সাঙ্কেতিক নাটকের ইঙ্গিত আর রূপক নাটকের অপরূপ রূপের মধ্যেই সে কথা ফুটে উঠেছে।

বাংলা নাটকের মধ্যে রূপকের উদ্ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের হাত হয়ত ইবসেন বা মেটারলিঙ্কএর দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত, কিন্তু এর মধ্যেও যে রাবীন্দ্রিক গুণের প্রকাশ হয়েছে তা অপূর্ব। এই অপূর্বতার জন্যই রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটক একান্ত-ভাবেই তাঁর নিজস্ব, রসগ্রহণে আর কারও প্রভাবের কথা মনে পড়েনা। যে কবিত্বের কল্পনায় পরিচয় সেখানে আছে তা আগে কোথাও ছিলনা। তাঁর রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকের মধ্যে রূপকের পর্দায় যেমন সৌন্দর্যের স্পর্শ, ইঙ্গিতের কুহকে তেমনি কল্পনার মায়া, কিন্তু অলস দৃষ্টির ম্লানিমা একে স্পর্শ করতে পারেনি। রূপকের এই অপূর্ব শিল্পকুশলতার পরিচয় আছে 'ডাকঘর', 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'রক্তকরবী', 'রাজা' প্রভৃতি সমস্ত নাটকেই। তাঁর নাটকে রূপকতা শুধু জোর করে চাপানো ভার নয়, এ নাটককে দিয়েছে গতির সাবলীলতা ও প্রকাশের মাধুর্য। গীতিময়তার অনুরণন ও কল্পনার আবেশ তাঁর সমস্ত নাটক জুড়ে যে অপরূপের মায়াজাল রচনা করে তা' কেবল অনুভব করবার মত। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা ও উচ্চতা, —'মুক্তধারা'য় তার যথেষ্ট পরিচয় আছে। এরই ফলে তাঁর নাটকে উপস্থাপিত সমস্যাও কাব্য হয়ে উঠেছে, তা স্বরূপে থেকে গল্‌স্‌ওঅর্দিএর নাটকের মতন উগ্র হয়ে ওঠেনি, তা রূপপরিবর্তনের ফলেই কমনীয় রূপ পেয়েছে। এসব নাটকের অনেক-গুলির মধ্যে আছে বর্তমান সমস্যার ছায়া, কিন্তু তা কাব্যিক গীতিময়তার মাধুর্যে ঢাকা; অনেকগুলির মধ্যে আছে মনস্তত্ত্ব ও দর্শন, কিন্তু তা রঙীন কল্পনায় মাখা; কোনোটাতে আছে কবির স্বকীয় ধর্মমত, কোনোটাতে ইতিহাসের উপাদান, কিন্তু সবই রূপকের সৌন্দর্য ও কাব্যের রঙে রাঙানো।

বিরাট রবিপ্রতিভার অতুল অবদান তাঁর নাট্যসাহিত্য। বহু সুরের বৈচিত্র্যে আর অনেক ভঙ্গিমার প্রকাশে এই নাট্যসাহিত্যও বিরাট হয়ে উঠেছে। তবু এরও একটা মূল সুর আছে, সেটা কবিত্বের সুর—সৌন্দর্য উপলব্ধির তৃপ্তির সুর। এই সুর তাঁর নাটককে যে সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক গুণের অলঙ্কার দিয়েছে তারই জন্যে সাময়িক কালের মধ্যেই এই নাট্যসাহিত্য বাঁধা থাকবে না,—এর গতি বর্তমান থেকে সুদূর ভবিষ্যতে, একাল থেকে সেকালে, দেশ হতে দেশান্তরে। চিরন্তন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের শীর্ষে এর আসন। এর গৌরব এর অননুকরণীয়তায়। রবীন্দ্রনাথের হাতেই এর উৎপত্তি এবং রবীন্দ্রনাথেই বিলয়, আর কোথাও এর চিহ্ন নেই; তিনি একাই একটি পরিপূর্ণ ও পরিপুষ্ট যুগ।

সাহিত্যে বাস্তবতা

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র বসাক

[প্রাজ্ঞন ছাত্র। সাহিত্যে বাস্তবতা নিয়ে তর্কমূলক আলোচনা সুধী সমাজের কাজ। যে অসামান্ত বিষয়বস্তু নিয়ে প্রবন্ধকার প্রবন্ধ রচনায় অগ্রণী হয়েছেন—তার দোষ-ত্রুটি-সাফল্য বিচার করবেন পাঠকরা।—সম্পাদক]

বিচ্ছেদ আমাদের কাম্য নয়, মিলনই কাম্য।—একথা যদি আমরা বিশ্বাস করি, তবে বলিতেই হয় যে, সাহিত্যও মিলনের ক্ষেত্র,—খুব একটি বড় রকমেরই মিলনের ক্ষেত্র। আমরা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে যাহা কিছু করিতেছি, মনে হয়, এই মিলনেরই জন্ত। সেই মিলন ইন্দ্রিয় পথে—দেখা, শোনা, স্পর্শের মধ্য দিয়া নানা ভাবেই হইতেছে। কিন্তু এইরূপে যে মিলন এবং তাহাতে যে প্রাপ্তি, তাহাতে বুঝি বা পূর্ণপ্রাপ্তি বা প্রাপ্তির মত প্রাপ্তি হইতেছে না। যাহা পাইয়াছি, তাহার চেয়ে যেন অনেক কিছুই পাইতেছি না। আমরা তাই শিল্পকলার রসলোকের দিকে ঝুঁকি। ভাবুকের কথা, কবির কাব্য, লেখকের লেখা, চিত্রকরের চিত্র, ভাস্করের ভাস্কর্য, চিন্তাশীল মানবের চিন্তার প্রকাশ ইত্যাদি সব কিছুর মধ্য দিয়াই আমরা এমন কিছুই পাইয়া বসি, যাহা আমরা নিজেদের দ্বারা পাই না বা পাইলেও সত্যতর, পূর্ণতর করিয়া পাই না। মানুষ তাই আর্টকে, জ্ঞানী ঋষির বাণীবচনকে খুব একটা প্রয়োজন মনে না করিয়াও তাহাদের না ভালবাসিয়া পারে না। মানুষ তাই সৌন্দর্যের চর্চা করে, তাহার শাস্ত্র পড়ে, কবিতায় মজে, এবং শিল্পসৃষ্টির জন্ত নিঃশেষে প্রাণও দেয়।

শিল্প-সাহিত্য সত্যসুন্দরেরই প্রকাশ। যে সত্য আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর আর যে সত্য আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়, সে সত্য আমাদের নিকটে থাকিয়াও দূরে বা দূরে থাকিয়াই দূরে, এবং যে সত্য আমাদের অনায়াসলভ্য আর অনায়াসলভ্য বলিয়াই সদা অবহেলিত, তাহারই স্বরূপে রূপায়ণ থাকে শিল্পে,—শিল্পের চারুকলায়, কারুকলায়।

যাহা যেভাবে আছে, তাহা সেভাবেই সুন্দর—যদি আমরা দেখিতে জানি। আর সেই সুন্দরের সামীপ্য-সাজুয্য লাভ করিতে পারিলেই, মনে করি, মঙ্গলের মঙ্গল। মঙ্গল, কেননা মিলন ঘটিতেছে।

সত্য যেখানে আছে, সেখানে আপনার অঙ্গ সৌন্দর্য বিকিরণ করিয়া আপনারই স্বরূপে আছে, সেখানে সে সুন্দরও, কল্যাণও;—সেখানে সে শিবগর্ভ শ্রী বা শ্রীসংযুক্ত শ্রীলিপ্ত 'শিবম্' অর্থাৎ শিবস্বরূপ। তাহাকেই বলি শ্রীমান। শিল্প-সাহিত্যের অমর লোকে, থাকে এই শ্রীসংযুক্ত বা শ্রীমানেরই জীবন্ত অভিব্যক্তি। উদ্দেশ্য,—যাহা আমাদের অগোচরে বলিয়াই বিচ্ছেদ-ক্লান্ত, বা সতত দৃষ্টিপাত হইতেছে বলিয়া যাহার শোভা সৌন্দর্য আর রমণীয় ঠেকিতেছে না, এবং সেইজন্য তাহার সহিত আমাদের মিলনের অহরহ ব্যাঘাতই ঘটিতেছে, তাহাকেই গোচর করিয়া তোলা—তাহার শ্রীটুকুতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

কবি বলিয়াছেন, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি। ঠিক তাই। কিন্তু কেবল পৃথিবীর কেন, পার্থিব-অপার্থিব সব সত্য আমাদের আদৌ গোচরীভূত নয়। অথচ সব সত্যেরই রূপতনু প্রকাশ পাইতেছে এবং প্রকাশ পাইয়া নিত্যনিয়ত ছুটিয়া চলিয়াছে কোন্ অজানিতের পানে—গাছের কলি কলি থাকিতেছে না, ফুলে প্রসারিত হইতেছে; ফুল আবার ফলের শরীরে আর একভাবে প্রকাশ পাইয়া কোথায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—ধরিয়া-বাঁধিয়া রাখা যাইতেছে না! অথচ এইরূপে যাহা অবিরত চলিয়াছে এবং যাহা অনবরত আসিতেছে—এই দুইকে এক করিয়া, এক সঙ্গে রাখিয়াই ত 'পূর্ণের পরশের' আস্বাদন-অভিলাষ মিটে। যে অসীম যে অখণ্ড—সীমাবন্ধনে, খণ্ডের আশ্রয়-আধারে—আপনাকে অন্তহীন ভাবেই প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে, তাহাকে মিলনের মধ্য দিয়া পাইতে হইলে এই অনন্ত সীমাহীনের চলন্ত সব রূপপ্রকাশকেই সাজাইয়া গুছাইয়া ধরিয়া লইতে হইবে। নতুবা তাহার অসীমত্ব-অখণ্ডত্বই অপূর্ণ। আবার অপূর্ণ যাহা তাহার আনন্দও অল্প এবং ক্ষণস্থায়ী। শিল্পী তাই সত্যের সতত প্রকাশশীল ও চলনশীল যে রূপ-বিগ্রহ তাহাকেই ধরিয়া ধরিয়া স্থিরতার চির অন্তঃপুরে বসাইয়া রাখেন এক অনন্তকে ধরিয়া দিবার জন্য। তাঁহার শিল্প-প্রয়াসের লক্ষ্য—অনাগত কালের অগণিত মনুষ্যহৃদয়ে যেন তাহা ধরা দেয় এবং মানুষও তাহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়া অনির্বচনীয় হইয়া যায়। শিল্পীর সৃষ্টিজগতে তাই অপ্রয়োজনীয় কিছু দেখি না; শিল্পীর কর্মযজ্ঞেও নিরানন্দকর কিছু নাই।

নানাকলার এক কলা চারুকলাই কাব্য বা সাহিত্য। ইহার মধ্যে কারিগরি করার অর্থ সত্যসুন্দরের চারুত্ব ফোটান। চারুতা যত চিত্তাকর্ষক, তত আর কিছু নয়। এই চারুতার অরুণোদয়, এই চারুত্বের অস্তগামী সূর্যের রং-সৃষ্টি যে আকাশে,

সেই আকাশে মানুষের দৃষ্টি গিয়া পড়ে সকলের আগে। চারিদিকের অপর বস্তুরাজিকে প্রত্যাহার করিয়া, আপনি একাগ্র হইয়া মানুষের চিত্ত তখন সেই দিকেই অভিসার করে। সাহিত্যের রূপলোকে, কাব্যের বাণীরচনায় যাহা প্রকাশ পায়, প্রকাশ থাকে, তাহার সজীবতা বা বাস্তবতা ঐ চারুত্ব-সৃষ্টিরই গুণে, মাহাত্ম্যে। সাহিত্যে বাস্তবতা বলিয়া যখন কোনোকথা ওঠে, তখন এই কথাটিই সর্বাগ্রে স্মরণীয় মনে করি।

সাহিত্যসৃষ্টিটাই, বস্তুতঃ, চারুকলার সৃষ্টি, আর তাহাও হইতেছে—মিলন-উদ্দেশ্য তাহার পিছনে আছে বলিয়া। আগেই বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আমরা সত্যের সঙ্গে মিলিতে চাহি। আমাদের আনন্দ ঐখানেই। কেন আনন্দ? না সত্য সুন্দর। সৌন্দর্য-প্রাপ্তি, সৌন্দর্যানুভূতির তৃপ্তি যেখানে, বা তাহার এতটুকু আনন্দও যেখানে, মঙ্গল বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে সেখানেই। সুন্দরের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষার যেখানে পরিপূর্ণতা, চরিতার্থতা, সেখানেই মঙ্গলের মঙ্গল বলিয়া জানি। মঙ্গল ইহা ছাড়া আর কী হইতে পারে।

আমরা সচরাচর যাহা দেখি তাহাও বাস্তব, যাহাকে দেখিতে পাই না, তাহাও বাস্তব। স্থূলরূপ যাহা তাহাই বাস্তব; সূক্ষ্মরূপ যাহা তাহা বাস্তব নয়—একথা মানা যায় না। স্থূল মানিলে সূক্ষ্মও মানিতে হয়। একটি পয়সার এপিঠ আর ওপিঠ যেমন, এও তেমনি,—এই দুইয়ের কোনটিকেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কেননা সূক্ষ্মে যাহা, তাহা যেমন স্থূলে আসিয়া ধরা দিতে পারে, তেমনি স্থূল আধার-ভূতে যাহা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাহাও বায়ুর আকার ধারণ করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া উঠিতে পারে। এই দুয়ের কোনটিই সত্যের পূর্ণরূপ বা পূর্ণের সত্যরূপ নয়।

প্রকৃত সত্য—যাহা সুন্দর, যাহার পূর্ণরূপের প্রাপ্তি ঘটিলেই পরিপূর্ণ মঙ্গল, তাহাকেই পাইতে হইলে আমরা যাহাদের বাস্তব বলি আর যাহাদের বাস্তব বলিতে কুণ্ঠিত হই, সবকেই পাইতে হইবে। বস্তুতঃ, সবই বাস্তব এবং সবে মিলিয়া এক মহা বাস্তব, বা বলিতে পারি অসীম বাস্তব। যদি বলিয়া বসি যে, বাস্তব বলি স্থূলকেই, আর কিছুকে নহে; তবে এ সত্যও এখানে প্রকাশ করা উচিত যে, মেঘের সঙ্গে পাহাড়-পর্বতের, অথবা মেঘের সঙ্গে আকাশের যে পার্থক্য তাহা কেবল তাহাদের স্থূলতারই 'তর-তম' অবস্থার পার্থক্য।

এমন সত্যও ত আছে যাহা আমার অভিজ্ঞতায় এখনও আসে নাই। আমি হয়ত এখন শিশু। কিন্তু তাই বলিয়া যদি বলি তাহার পরপর অবস্থার স্তরগুলি অসত্য,

তবে তাহারা আমার শিশুদৃষ্টিতে কল্পনা এবং অবাস্তব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা সাময়িক।

যাক্ সে কথা। সাহিত্য-স্রষ্টা বাস্তব বলিতে এসমস্তকে কিন্তু গ্রাহ্য করেন না। সাহিত্যের যিনি প্রকৃতই স্রষ্টা, তিনি সজাগ থাকেন—যে সত্যের রূপশ্রীর তিনি স্রষ্টা,—সেই সত্যের সেই রূপশ্রীকেই গোচর করিয়া তুলিবার দিকে। আবার যিনি সাহিত্যের রস-রসিক, তিনিও দেখেন—যে সত্য সাহিত্যিকের কাছে ধরা পড়িয়াছে, তাহাও তাঁহার কাছে সত্য হইয়া উঠিতেছে কিনা। এই যে সত্য হইয়া ওঠা—অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি ইহাই সাহিত্যের বাস্তবতা। সাহিত্য সত্যেরই স্বরূপের প্রকাশস্থলী; কিন্তু সে সত্য কবির দৃষ্টিতে ধরা-পড়া সত্যই।

কবি বা সাহিত্যিক যে রূপের দর্শন করিয়া বিস্মিত বা মুগ্ধ হইয়াছেন, যে রূপের পথে সত্যের সহিত মিলনানন্দ অনুভব করিয়াছেন; সেই সত্যকে সে রূপের মধ্যে রাখিয়াই যদি অপর সকলের সহিতও মিলিত করিবার শিল্প-ব্যবস্থাটিই করিয়া দিতে পারেন, তবেই তাঁহার কবিতা বা সাহিত্যসৃষ্টি সার্থক। কেননা বাস্তবতা সেখানে না থাকিয়াই পারে না,—তাহার দ্বারা মিলনের বা সাহিত্য-সাধনের আনন্দানুভূতি অবশ্যম্ভাবী।

এখন সেই সত্য—আমরা সমাজবদ্ধ জীব—আমাদের সংস্কারে লাগিতে পারে কিন্তু সেই লাগিবার ভয়ে ত সাহিত্যের বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারি না। আর সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে কি এই এষণাই কাজ করিতেছে না যে, তাহাতে আমাদের স্বস্বরূপেই—বৃহতে মুক্তি, ক্ষণিকের তরে হইলেও তাহারই আনন্দ-আস্বাদন? এইরূপ সত্যের সঙ্গে সত্যের—আপনার সঙ্গে আপনার মিলন যাহার দ্বারা হইয়া উঠে না তাহা যেমন সাহিত্যপদবাচ্য নয়, তেমনি বাস্তবতাও তাহাতে নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলি কবির রচিত—

"মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল;
দুই পারে শুব্ধ বনে জাগিয়া রহিল শিহরণ;
চাঁদের মুকুট-পরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা
রহিল নির্বাক হয়ে পরাভূত ঘুমের আসনে।"

—এ-ও যেমন বাস্তব, কবির রচিত—

"বসন্তেরি বায়না-করা
নয়তো তোমার নাট্য,
যেমন-তেমন নাচন তোমার
নাইকো পারিপাট্য।
অরণ্যেরি গাহন-সভায় যাও না সেলাম ঠুকি,
আলোর সঙ্গে গ্রাম্য ভাষায় আলাপ মুখোমুখি ;
কী যে তাহার মানে
নাইকো অভিধানে,—
স্পন্দিত ওই বক্ষটুকু তাহার অর্থ জানে।"

এই "ভোরের চড়ুই পাখি"-ও তেমনি বাস্তব। কিন্তু চড়ুই পাখি বলিয়া নয়, কবির সৃষ্টিগুণে স্পষ্ট করিয়া তাহাকে পাই বলিয়া, এবং তাহার মিলন হইতে পারে বলিয়াই, তাহা বাস্তব।

সাহিত্যে বাস্তবতা অর্থে আমরা তাই বুঝিব,—যে সত্য যে রূপে প্রকাশ পাইতেছে সেই সত্যের সেই রূপের মধ্যে থাকিয়াই যথাযথ প্রকাশ পাওয়া। রূপধর্মী বাস্তবতাই সাহিত্য রচনায় বড় কথা, তথ্যধর্মী বাস্তবতা এক্ষেত্রে অস্বীকৃত না হইলেও বড় কথা নয়।

শেষ চিঠি

শ্রীবাসুদেব

[তৃতীয় বার্ষিক বিজ্ঞানের ছাত্র। রম্যরচনা বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলতে যা বোঝায় এটি যদিও ঠিক সেই পর্যায়ের নয় তবু লেখকের প্রয়াস প্রশংসাযোগ্য। হালে বাঙলা সাহিত্যে রম্যরচনার আমদানী। কাজেই তুলনামূলক বিচারে এর মূল্য ঠিক করা উচিত নয়। লেখক শেষ চিঠির মধ্য দিয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, সে তো একান্তই আমার-আপনার।—সম্পাদক]

প্রিয় বন্ধু,

পৃথিবীর দেনা শোধ করে দিচ্ছি। হিসেবের খাতা শেষ করেছি জমা খরচের শেষে। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। আমার মনটাও। এই আমার শেষ চিঠি। এই সূর্যাস্ত আমার শেষ সূর্যাস্ত। তবু কি যে আনন্দ, কি যে তৃপ্তি নিয়ে যাচ্ছি, এই অক্ষর-গুলো কি করে তা বোঝাবে বলো? তোমার মনে পড়ছে সেদিনের কথা? সেদিন রাতে আকাশে তারা ছিল অনেক। তোমার ড্রইংরুমের 'নিয়ন' লাইটে যত বেশী চিনেছিলাম তোমায় তার চেয়ে বেশী করে অনুভব করেছিলাম আমাদের মধ্যের ব্যবধান। তুমি কলেজের নন-কলিজিয়েট ছাত্র। একবার ফেল করে আরেকবার ফেল করতে যাচ্ছিলে এম.এ.তে। আজ রাগ করো না ভাই। তোমার স্যুটের ক্রীজ দেখে আমি স্মরণ করতে চেষ্টা করেছিলাম আমার খদ্দরের জামাটা পোস্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসে উঠে তৈরী করা, না আরও আগের? জুতো বাটার হলেও জুতো তো? আর পাঞ্জাবীটার ওপর দুটো শ্রাবণ রেখে গেছে তার স্বাক্ষর। তুমি সবই জানতে। বাড়ীতে বৃদ্ধ বাবা, অনূঢ়া বোন, তাছাড়া—পদ্মা-মেঘনার তীরই কি শুধু ভেঙেছে?—আমাদের বাড়ীর চালেই কি আগুন লেগেছে? আমাদের কপালও ভেঙেছে তাতেও লেগেছে আগুন। কলকাতার একটা বস্তিতে ছিলাম মাথা গুঁজে সবাই। কলের জল দূরে থেকে রক্ষা করত তার পবিত্রতা। আর সূর্যের আলো—কর্পোরেশনের সঙ্গে—সেও দিয়েছে ঐ অসহায় বস্তিকে অন্ধ-নির্বাসন। ছেলে পড়াতাম জনতিনেক। মধ্যে মধ্যে হাতও পাততাম তোমার কাছে। তুমি বড় লোকের ছেলে হলেও বন্ধুকে সাহায্যই করেছ—করুণা

করোনি। তাই ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না তোমায়। তুমি জানতে আমি ছিলাম সাহিত্যিক। দৈননিন্দ জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি-দৈন্য-ভুল সবই যেন ফুল হয়ে উঠত আমার কলমের মুখে। দৈন্যের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছিল প্রাণের ঐশ্বর্য। ঝর্নার সামনে পাথরের নুড়িও নাচে। দুঃখদৈন্য অভাব ক্ষোভ সব যেন তেমনি নেচে উঠত ছন্দে। বস্তির অন্ধকারে স্বর্গসৃষ্টি করেছিলাম—জালিয়ে রেখেছিলাম একটি প্রদীপ। কিন্তু প্রদীপের নীচেই বড় অন্ধকার বন্ধু, বড় অন্ধকার! তবু শিখাটি জ্বলে পুড়ে দিয়ে যাবে তার আলো। দহনই যে তার জীবন। দৈন্যকে তুচ্ছ করেছিলাম একটা কঠিন আনন্দে। তারপর—তারপর আমায় সংবর্ধনা করতে একটা প্রীতি উৎসব করেছিলে তোমাদের বাড়ীতে। সেদিনই তো সব শুনে বলেছিলে তোমাদের কারখানায় ঢুকে পড়তে। "মাইনেটা ভাল", তুমি বললে—"তোর ভালই চলে যাবে।" আমি বলেছিলাম "যে পাখী আকাশে ডানা মেলে খোঁজে তার দিগন্তকে, তাকে তুমি বাঁধবে খাঁচায়?"

কিন্তু বাস্তব বড় রূঢ়। সাহারায়ও মরুদ্যান আছে কিন্তু এই পৃথিবীতে আছে দরিদ্র হতভাগ্যদের জন্য নিরুপায় মৃত্যু। না—না—অপমৃত্যু। তাই একদিন নিজেই তোমার কাছ থেকে কাজটা চেয়ে নিয়েছিলাম। বেশ ভাল মাইনে। বাবা খুশী হলেন। মা আনন্দিত হোলেন—আমার মতন সন্তান পেটে ধরেছেন বলে গর্ব অনুভব করলেন। এক দুঃস্বপ্নের মত ওৎ-পেতে-থাকা আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেন সরে গেছে—একটুকরো সবুজ মাঠ যেন তাদের সামনে।

তাদের প্রতি অবিচার করিনি বন্ধু। বস্তি থেকে বালিগঞ্জে। তারপর অফিসের কাজের জন্য স্যুট, কোট, নেকটাই। টেবিলে আর মোমের শেষ অংশ, কাগজ কলম থাকত না। ছিল ফোন, ফ্যান, টেবিল ল্যাম্প, প্যাড। রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়র, মিল্টনের জায়গা অধিকার করল টেলিফোন গাইড্, শেয়ার মার্কেটের হিসেব।

আকাশে হয়ত চাঁদ উঠত; হয়ত কখন এসে পড়ত বসন্ত, অতিথি হয়ে আসত দখিনা বায়ু; শুকতারা তেমনি করেই জাগত দূর নভে আর আগের মতই কূজন-মুখর হয়ে উঠত বন—কিন্তু বাইরের সব দুয়ার খুলে দিয়ে অন্তরের দরজা কি বন্ধ করে দিয়েছি? মনের একান্তে এসে বড় অসহায় মনে হোত। মনে হোত কি যেন ছিল কি যেন নাই। কি যে পেয়েছিলাম কি যেন হারিয়েছি। ধাতুর ঐশ্বর্যে কি চাপা পড়ে

গেছে প্রাণের উৎস-মুখ? কি পেলাম নিজে? নিজের সঙ্গে করেছি দোকানদারি। প্রবঞ্চনা করেছি পৃথিবীর অধিকারকে। নির্মম ভাবে করেছি আমাকে হত্যা!

আত্মহত্যা করছি। করেছি অনেকদিন। দেহের নয় মনের।

দরিদ্র শিল্পীকে সাহায্য করে হয়ত তোমার অনুশোচনার অন্ত থাকবে না যখন তুমি এ চিঠি পাবে। যখন তুমি এ চিঠি পাবে তখন আমি থাকব না। লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর খুব ঝগড়া—না?

ব্যাঙ্কে যা আছে, সংসার চলবে। তুমি একটু দেখো।

সকালের শিশিরে অনুভব করো আমার অশ্রু, আকাশের নীলে ব্যথা, আর নীলকণ্ঠ পাখীর গানে আমার না-গাওয়া গানের সুর। দুঃখ করো না বন্ধু। একটা শান্তি.....তৃপ্তি.....

.....ঐ-দূর দিগন্তে সূর্য ডুবে গেল ভাই।

ইতি

ভাগ্যহত

ব্রতীন

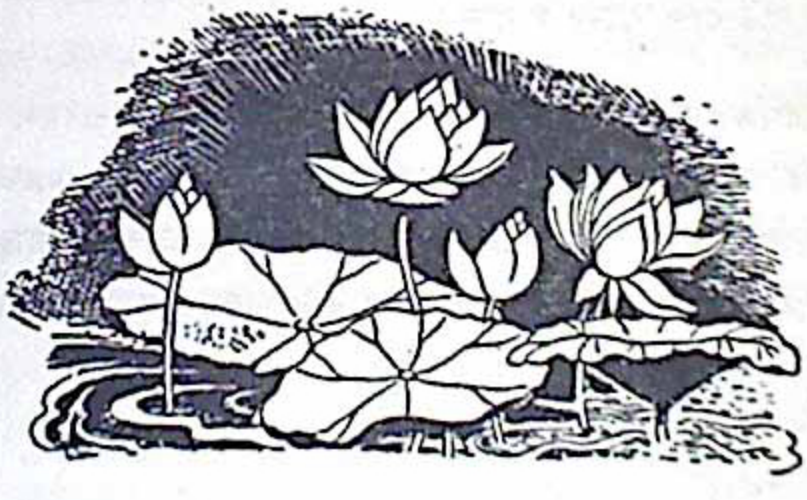

511

আধুনিক সাহিত্যপাঠের ভূমিকা

অধ্যাপক সুশীল জানা

[হাল পরিচয়-গোষ্ঠীর অন্যতম ও 'মহানগরী'র লেখক। ইনি আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।—সম্পাদক]

চতুর্বিধ কলা—নৃত্য, গীত, চিত্র ও সাহিত্যের ভেতরে সাহিত্য যে শ্রেষ্ঠ কলা, এ-মত আজও সত্য বলে স্বীকৃত। চোখ বা কানের মাধ্যমে কেবল ব্যক্তিগত ভালো লাগা বা না-লাগার ওপরেই সাহিত্যের বিচার চলেনা বা চলেনি—ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে মন ও বুদ্ধিও এসে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাই সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে বিচার, তাকে গভীর ক'রেই আমাদের গ্রহণ করতে হয়। মানব-সৃষ্টির চূড়ান্ত-রূপ এইখানেই প্রতিভাত—এইখানেই তার মন বুদ্ধি শ্রুতি স্মৃতি দর্শন—জীবনের ও সভ্যতার সমগ্র সত্তাটি প্রতিফলিত হয়। এমন যে সাহিত্য নামক কলা বা পরম সৃষ্টি—তাকে শুধু আমাদের মুহূর্তের মেজাজ বা ব্যক্তিগত সংকীর্ণ ভালো লাগা বা না-লাগার মাপ-কাঠিতে পরখ ক'রে ছেড়ে দিলে মারাত্মক ত্রুটি ঘটে। তাই এই সাহিত্য-বিচারের বেলায় রসগ্রাহীকেও যেমন অবহিত হতে হয়—তেমনি সাহিত্য-স্রষ্টাকেও তার সৃষ্টির চেতনা সম্পর্কে বেপরোয়া বা অনবহিত হলে চলেনা ; উভয়কেই অনেক কিছু বর্জন এবং অনেক কিছু নতুন ক'রে গ্রহণ করতে হয়। কম-সে-কম পাঁচটি হাজার বছরের ধারাবাহিক সাহিত্য-কীর্তি কম নয় এবং সেই সব কীর্তিগুলি যাচাই করলেই দেখতে পাই—কেমন ক'রে যুগে যুগে তার পরিবেশ বদলেছে, কেমন করেই বা বক্তব্যের রূপ-রূপান্তর ঘটেছে, সৃষ্টির আনন্দই বা কতভাবে ব্যক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মধ্যযুগ অতিক্রম ক'রে প্রাচীন পৃথিবীর দীর্ঘকাল ব্যাপ্ত বিচ্ছিন্ন ও অপরিজ্ঞাত দেশগুলি নিজের নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে কঠিন নিগড়ে বেঁধে রাখতে পারেনি ; পরস্পরের পরিচয়ে পরস্পরকে তারা অনেক কিছু দিয়েছে, তেমনি নিয়েছেও। বিচ্ছিন্ন ও অপরিচিত পৃথিবী পরস্পরের পরিচয়ের পথে যত কাছাকাছি এসেছে—সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ততই মিলন বৈচিত্র্যের নতুন সুরটি হয়ে উঠেছে প্রবল। তার রূপ যে কী, তার অবদান যে কত ব্যাপক ও গভীর—সেটি ভালো ক'রে বোঝা যাবে আমাদের মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের দিকে

তাকালেই। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যের ধারা বা স্বাতন্ত্র্য তাঁদের মধ্যে যেহেতু একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়—সেহেতু তাঁদের বরবাদ ক'রে দেওয়ার মতো সংকীর্ণ নির্বুদ্ধিতা সমসাময়িক জনকয়েক গোঁড়া বেরসিকের থাকলেও ইতিহাসের অমোঘ গতি বা রসিক সাধারণের কালপ্রবণ রসানুভূতি শেষ পর্যন্ত তাঁদের গলায় জয়মাল্য পরিয়েছে। একেই বলে বিশ্বগতি। নতুন সভ্যতা কয়েক শতাব্দীর প্রচেষ্টায় দেশ-দেশান্তরের অপরিমেয় ব্যবধানকে ভেঙে চুরমার করেছে। অনগ্রসর দেশসমূহে সাম্রাজ্যের শোষণ শাসন পৌঁছেছে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্বগতি বলে একটা যন্ত্রর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সমস্ত দেশ-দেশান্তর—তার সমাজ ও মানুষ। এখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচার কল্পনাও আজ করা যায়না। গ্রীসের বাইরে যা-কিছু আছে সবই বর্বর—একথা আজ আর খাটেনা।

এই দেওয়া-নেওয়ার বৈচিত্র্যের মাঝখানে, সাহিত্য-ধারার এই গতিময়তার মাঝখানে কিছুকিছু সাহিত্য-স্রষ্টা ও সমালোচক আছেন যাঁরা সাহিত্যে 'বিশুদ্ধ আনন্দেই' একমাত্র বিশ্বাসী। তাঁরা এমন সাহিত্যেরও কল্পনা করেন যা-নাকি সমাজ-নিরপেক্ষ, লোক-নিরপেক্ষ হয়েও পরম কাব্য হতে পারে। (অর্থাৎ সে সাহিত্য সৃষ্টির আবেদন শ্রেষ্ঠ যে কোনো কাব্যের মতোই।) এটাকেই তাঁরা কাব্যের চরম পরম মূল্য মনে করেন। এই রকমই একজন 'বিশুদ্ধ আনন্দবাদী' সমালোচক 'মেঘদূতে' নজির তুলেছেন। বলাবাহুল্য—শ্রেষ্ঠ কাব্য-সৃষ্টির আনন্দ আস্বাদন 'মেঘদূত'-এ প্রত্যেক পাঠকই পাবেন ঠিকই, কিন্তু সে আনন্দ আস্বাদনে পাঠকের যে সহৃদয় মন ও বুদ্ধি কাজ করে—তাকি কোনোক্রমেই সমাজ-নিরপেক্ষ বা লোকধর্ম-নিরপেক্ষ মনে রাখতে হবে 'মেঘদূত' সৃষ্টির কালকে—যখন প্রাচীন ভারতে বিরাজমান ছি এক আরণ্যক পরিবেশ। মনে রাখতে হবে সেদিনের বিরল যোগাযোগ, মুষ্টিমে রাজপথে সংযুক্ত প্রদেশসমূহ ও দুর্গম ভারতবর্ষের গিরি-কান্তার সমতলভূমি। ম রাখতে হবে সেকালের দুর্গম বর্ষাকাল ও সেকালের প্রধান ছুটির দিন বর্ষার ক মাস। বর্ষার মেঘ দেখলেই শিকারী শিকার থেকে ফেরে, প্রবাসী ঘরে ফেরে, রা দরবারে ছুটি ঘোষণা হয়, বণিক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। এমন ছুটির দিনে শান্ত গৃহকোণের সমস্ত স্মৃতি নিয়ে একদা নবীন বর্ষার মেঘ যখন যক্ষের সামনে উপস্থিত হয় তখন গৃহাভিমুখী প্রিয়জন মিলন-উন্মুখ প্রতিটি মানুষের মনেই সুরের ঝংকার ওঠে তা কি কোনো ভাবেই সমাজ-নিরপেক্ষ, মানব-ধর্ম-নিরপেক্ষ বরং কালিদাস তাঁর 'মেঘদূত' কাব্যের সুরুতেই তখনকার এক সমাজ-নিয়মের নি

বাঁধা মানব-মনের সুর দিয়েই ঝংকার তুলেছেন—বর্ষার ছুটির সঙ্গে যা চড়াসুরে বাঁধা। সে দুর্গম ভারতবর্ষও এখন নেই আর বর্ষার ছুটিও এখন আমাদের সমাজ-নিয়মে চালু নয়—তাই বলতে পারি, 'মেঘদূত' পাঠের অর্ধেক আনন্দই বরং আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আষাঢ়ের নবীন মেঘ দেখে প্রিয়ামিলন-উন্মুখ, গৃহাভিমুখী মন আজ আর আমাদের নেই। বরং অহেতুক কারণসমন্বয়ে মেঘ বা বর্ষাকালের সঙ্গে মানববিরহকে জবরদস্ত জুড়ে দিয়ে বসে আছি। এবং সেই সঙ্গে 'বিশুদ্ধ আনন্দবাদী'রা 'অবসর বিনোদন' কাব্য পাঠের দ্বারা কেন করা যাবেনা—এই দাবী ক'রে মার্ক্‌স্‌পন্থীদের বিরুদ্ধে মনগড়া এক বিক্ষোভ জানিয়ে বসেছেন যে, কাব্যপাঠে অবসর বিনোদন এবং আনন্দ আস্বাদন যেন তাঁরা বরদাস্ত করেন না। যতদূর জানি, তাঁরা তা করেন—সাহিত্য-কাব্যপাঠ-কে তাঁরা মাটি কাটার কাজ বলে মনে করেন না। অধিকন্তু এও জানি যে, সাহিত্য-কাব্যের মতো আনন্দ-আস্বাদনকে তাঁরা মুষ্টিমেয় ভদ্রলোকের জন্যে নিরাপদ করে না রেখে সমস্ত মানুষের জন্যেই দাবী করেন। এ ঠিক যে, 'মেঘদূত'-এর রসগ্রহণ করার মতো পরিণত মানস আমাদের সমাজের সব মানুষের নেই। মার্ক্‌স্‌পন্থীরা সকলের জন্যে সে মানস-পরিণতিও রাষ্ট্রের কাছে দাবী করেন। এবং প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারকে জাতির মহৎ উত্তরাধিকার বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন ও রক্ষা করেন—কোনো স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতায় মাত্র কয়েকজন ভদ্রলোকের বলে সাহিত্য-কীর্তিগুলিকে আত্মসাৎ করতে চান না। আর সাহিত্যে কাব্যে সমাজের শ্রেণী-প্রভাব সম্পর্কে তাঁদের মতটা হলো এই যে, অতীতে যুগে যুগে সমাজে যে শ্রেণী যখন আধিপত্য করেছে সেই শ্রেণীর কামনা কল্পনাই সাহিত্যে প্রতিভাত হয়েছে। এই সত্যের সূত্রে কালিদাসের কাব্যে তদানীন্তন দরবারী মনোভাবের, রাজ-মানস পরিতুষ্টির প্রচেষ্টা কি ধরা পড়েনা? শিল্প সৃষ্টির, সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রসঙ্গে এখানে এটিও লক্ষ্য করার বস্তু যে, একদিকে যেমন দরবারী আড়ম্বরে বর্ষা-বিলাসের মাধ্যমে মানব-হৃদয় প্রতিফলিত হয়েছে, অন্যদিকে ভেরেণ্ডার থামটি যখন সমাজের নিম্নতম শ্রেণীতে 'নিত্য ভাঙে ঝড়ে', তখনও যে মন ও শিল্প-আবেদন প্রতিভাত হয়েছে, তাকে কোনো সংকীর্ণতায় পাঠকসাধারণ সরিয়ে রাখেনি। এবং মার্ক্‌স্‌পন্থী সম্পূর্ণ জ্ঞান সহকারে ও সুস্থ শরীরে সাহিত্যে অধিগত সমাজ-মানসের শিল্পবৈচিত্র্য ও বিষয়বৈচিত্র্যকে বিশেষ বিশেষ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে উপভোগই করে থাকেন।

যাইহোক, কাব্যরস আস্বাদনে যে আনন্দ—তা মানবধর্মের বহির্ভূত বা সমাজ ধর্মের বহির্ভূত হতে পারে, এমন একটা ব্যাপার 'বিশুদ্ধ আনন্দবাদী'রা কল্পনা করলেও বাস্তবে তা অসম্ভব। কারণ উচ্চতর সাহিত্যের আনন্দ আস্বাদনে যে মন ও বুদ্ধি কাজ করে, তা আগেই বলেছি, চতুর্বিধ কলার মধ্যে প্রাচীন সাহিত্যধারাতেও স্বীকৃত হয়েছে, আজও তা স্বীকৃত হয়। এখানে সাহিত্য-বিচারে আসলে 'বিশুদ্ধ আনন্দবাদী'রা যেটা অস্বীকার করতে চান তা হলো সমাজ নামক বস্তুটা ও তার লোকসমষ্টি—যারা হাজার হাজার বছর ধরে নিজেদের শ্রেয়-কামনায় বার বার সমাজটাকে নানাভাবে পরিবর্তিত করেছে—এখনও করতে চায়। শ্রেয়-কামনায় এই যে পরিবর্তনের কথাটা—"বিশুদ্ধ আনন্দবাদী"দের আনন্দ-আস্বাদনে নাকি এতে বাধা পড়ে। এ এক-ধরণের সংকীর্ণচিত্ততা।

আসলে সাহিত্য-কাব্যের আনন্দ-আস্বাদন ব্যাপারটা কি? সেটা কি এবং কার কাছে—এ সম্পর্কে ধারণাটা পরিষ্কার হয়ে গেলেই মনে হয় অনেক গোলমালের অবসান ঘটে। বলাবাহুল্য সাহিত্যের আবেদন জীবজগতের নিকৃষ্ট প্রাণীদের কাছে নয়—বরং মানুষ নামক উৎকৃষ্ট প্রাণীটির কাছে।—যে মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ওপরেও আছে মন ও বুদ্ধি, আছে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ। প্রাচীন কাল থেকে এ মানুষ সভ্যতার শতাব্দীর স্তরে স্তরে আপনার শ্রেয় কল্পনাকে তার চারপাশে রূপ দিতে চেষ্টা করেছে এবং তার সাধ্যের সীমা যখন লঙ্ঘন আর করতে পারেনি তখন কল্পনার স্বর্গ রচনা করেছে যেখানে তার আকাঙ্ক্ষিত জীবন-বাসনার পূর্ণ পরিণতি। এই মানুষকে সাহিত্য কাব্যের যে আবেদন অভিভূত করে—তা কোনোক্রমেই সৃষ্টি-ছাড়া হতে পারেনা, তার কল্পলোকের সব আনন্দের সঙ্গে বাঁধা থাকে তার কামনা কল্পনার সূক্ষ্ম সুতোটি। তার কল্পলোকের নাইটিঙ্গেল স্বর্গ-লোকের যত গানই গেয়ে থাকুক—বাসা তার এ মর্ত্যের মাটিতে। মাটির এই মানুষের কাছে আমাদের সাহিত্যের আবেদন বা আনন্দকে পৌঁছে দিতে হয়। তাই সে আনন্দের ধরনটি যে কি হবে, তা অনুমান করা আর কষ্টকর হয়না। এ আনন্দের রূপ হয় বিচিত্র ঠিকই—কিন্তু এক জায়গায় তার মিল আছে এই যে, তাকে মানবীয় হতে হবে। মানব-আবেগ তার মধ্যে বৃহত্তর ও মহত্তর সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে বিরাজমান থাকবে। মহৎশিল্পী তার সমস্ত কলা-নৈপুণ্য দিয়ে এই মহৎ ও বৃহৎ আবেগকেই যুগে যুগে তুলে ধরে মানুষের সামনে। তার সামনে দাঁড়িয়ে অভিভূত হয়েছে মানুষ,—উপলব্ধি করেছে আপন মানবসত্তাকে বার বার,

আপন ইতিহাসকে—আপন সম্ভাবনাকে যতো গভীর ক'রে সে বুঝেছে ততো কেঁপে উঠেছে তার বুক। এই পরিচয়—আত্মার এই আবিষ্কারই সাহিত্যকাব্যের আনন্দরূপ, এই অমৃত। আকণ্ঠ এই অমৃত পান ক'রে কখনো সে ঝিমিয়েছে নেশায়—কখনো ছুটেছে সমাজবিপ্লবের পথে; মনের মতো ক'রে ঘর গড়বে সে, সমাজ গড়বে—রাষ্ট্র গড়বে, সম্ভব করবে কল্পনাকে বাস্তবে, স্বর্গ রচনা করবে সে মর্ত্যের মাটিতেই। বলা বাহুল্য, হাজার হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেছে, অবিশ্যি খুব অল্পই। তবু একথা সত্য রূপে দাঁড়িয়ে থাকে যে, সাহিত্যকাব্যের তত্ত্বকথাটি আধ্যাত্মিকতা নয়, রাজনৈতিকতাও নয়—অমানুষতাও নয়, অতিমানুষতাও নয়—তা যদি কোনো তত্ত্বই হয় তা হলো সমগ্রমানবসত্তার তত্ত্ব। তার উপলক্ষ্যও মানুষ—লক্ষ্যও মানুষ। তার উপকরণও মানুষ—তার কারুকর্মও মানুষের জন্যে।

কিন্তু কোন্ মানুষ? বলাবাহুল্য তা অসামাজিক মানুষও নয় এবং সমাজ-বিরোধী মানুষও নয়। এ মানুষের কোন্‌ঠাসা বিকৃত আনন্দ-উল্লাসের আর যে সম্ভাবনাই থাক, অতি বড় উকীলেও বলবেনা যে এর মহৎ সাহিত্যিক আবেদন যুগে যুগে চিরঞ্জীব হয়ে ছিল বা আছে! সাহিত্য কাব্যের স্রষ্টা তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে দেখেন সমাজ-গতিকে, সমাজ-মানসকে। বর্তমানে বিশ্বগতির কালে দেখতে হয় তাঁকে বিশ্বগতিকেও, সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তার চলেনা। তার শিল্প-আবেগের মহৎ সৃষ্টি হয় সেইখানে যেখানে দেখেন তিনি মানব-মহামিলনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। এইখানে প্রতিভাত হয় শিল্পী-বিধাতার দুই মূর্তি—একদিকে প্রতিবন্ধককে সে চূর্ণবিচূর্ণ করে, বিদ্রোহ করে প্রচলিত কঠিন নিগড়ের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে তার সৃষ্টিমূর্তি—তিল তিল ক'রে সৃষ্টি করে সে সেই তিলোত্তমার যেখানে মানবাত্মার বিকাশ, তার নব নব সম্ভাবনা। এইখানেই সে ঘোষণা করে দুর্গম ক্ষুরধার পথের যাত্রায়—এইখানেই সে প্রচলিত সমস্ত তুচ্ছতা ও নিয়মের ঊর্ধ্বে মাথা তুলে বলে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এইখানেই সে অন্তঃস্থলে নাড়া দিয়ে বলে—

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবেনা কেনা।
... ...
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে

মানুষ চুর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

বর্তমানের সাহিত্য, যে সাহিত্য প্রকৃষ্ট গতিময়তায় বিশ্বাস করে, হাজার হাজ
বছরের পরিবর্তমান সভ্যতা ও সাহিত্যে বিশ্বাস করে—তার লক্ষ্য হলো এই 'মহিমা', ত
এ যুগে কল্পনার স্বর্গের কোনো দেবতার মহিমা নয়—মহিমা মানুষের। মানুষের এ
সম্ভাবনা সে দেখেছে—এই সম্ভাবনায় সে বিশ্বাস করে। আমি বলছি প্রগতি সাহিত্যে
বিশ্বাস ও লক্ষ্যের কথা—এ বলা বাহুল্য যে তার কৈশোর অতিক্রান্ত হয়ে এখনও স
পূর্ণ পরিণত রূপ দেখা যায়নি। এখনও তার সামনে বিচিত্ররূপ দ্বন্দ্ব; তার দেশ আ
কাল আছে, জাতি আছে—তার অন্ধ জাতীয়তা আছে, তার আন্তর্জাতিকতা আছে
তার স্বজন আছে, তার বিশ্বজন আছে—তার স্বধর্ম আছে, তার বিশ্বজনীন মানবধ
আছে। তার পূর্ণ পরিণতির সম্ভাবনা আজকের বিশ্বগতিকে কোনো সংকীর্ণতায়
দিয়ে নয়—তার সম্ভাবনা জগৎ-ইতিহাসের তাল রক্ষায়।

ভারত ও লৌহশিল্প

রমেন্দ্র কৃষ্ণ হালদার

[প্রথমবর্ষ—সাহিত্যের ছাত্র। বিজ্ঞানের জটিল তথ্য ও তত্ত্ব কথা বাদ দিয়ে লেখক টাটা কোম্পানির লৌহ কারখানা ও ভারতের লৌহ শিল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন।—সম্পাদক]

জগতের প্রথম শ্রেণীর খনিজদ্রব্যের মধ্যে লৌহই প্রধান বলিয়া স্বীকৃত। আনন্দের বিষয় যে আমরা প্রকৃতির এই দান হইতে বঞ্চিত নহি। বৈজ্ঞানিকদের মতে আমেরিকার লৌহভাণ্ডারের সহিত ভারতের লৌহসম্পদের তুলনা করা যাইতে পারে।

প্রথম শ্রেণীর লৌহ ভারতে খুব বেশী নাই বলিলেই হয়, তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর লৌহ ভারতে প্রচুর পাওয়া যায়। সুইডেনের লৌহ খনি অঞ্চলে প্রথম শ্রেণীর লৌহ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর লৌহের চলনই অধিক এবং এই দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেই অধিকাংশ লৌহ উদ্ধার করা হয়।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই লৌহখনি বর্তমান কিন্তু তন্মধ্যে উড়িষ্যা রাজ্যই প্রধান। লৌহখনির দিক দিয়া ভারতবর্ষ যতই অগ্রসর হউক না কেন তাহার লৌহ-শিল্প কেন্দ্র খুবই কম। লৌহ প্রস্তর হইতে লৌহ নিষ্কাশনের জন্য কেবলমাত্র বিহার, বঙ্গদেশ ও মহীশূরের কারখানাই প্রধান। তন্মধ্যে বিহারের জামসেদপুরে অবস্থিত "টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানি" এসিয়ার মধ্যে সর্বপ্রধান ও পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থানের অধিকারী।

সম্প্রতি I. I. S. Co. ও S. C. O. B. সংযুক্ত হইয়াছে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি করিবার জন্য জাতীয় ব্যাঙ্ক হইতে কিছু টাকা ঋণ লইয়াছে। ইহা বাঙ্গলা দেশের কুলটী অঞ্চলে অবস্থিত; যদি ইহা উন্নতি করিতে পারে তবে ইহাও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লৌহ-শিল্প প্রতিষ্ঠান হইবে।

আকরিক লৌহ হইতে লৌহ শিল্পের রূপান্তর পর্যন্ত যে কত ব্যক্তির পরিশ্রম ও ব্যয়সাধ্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তাহা না দেখিলে সত্যই বিশ্বাস করা যায় না। একবার জামসেদপুরের কারখানা দেখার সৌভাগ্য আমার ঘটে। ইহার আয়তন

প্রায় ৫২ বর্গমাইল, তন্মধ্যে একটি জলাশয়ও আছে। এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকা
লৌহ-নির্মিত দ্রব্য প্রস্তুত করণের ব্যবস্থা আছে তন্মধ্যে ব্লাস্টফার্নেস্, লোকোশেড্, শীটমেটা
ও মার্চেণ্টমিল ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই বৃহৎ "টাটা কোম্পানির" আকরিক লৌহ বিহারের বাদামপাহাড়, গরুমহিষা
অঞ্চল হইতে কোম্পানীর নিজস্ব ওয়াগনে পূর্ণ হইয়া জামসেদপুরে আনীত হয় এ
তাহার পর সেই ওয়াগনগুলিকে কারখানার ভিতর আনা হয়। এই ওয়াগনগুলি
ইচ্ছানুযায়ী উপুড় করিয়া দেওয়া যায়। কোম্পানির লাইনগুলি চুল্লীর (furnace) নি
দিয়া গিয়াছে। এই লাইনগুলি সাধারণ জমি হইতে কিছু উচ্চে। বিস্তৃত উপরিভাগ ফাঁ
থাকায় আকরিক লৌহপূর্ণ গাড়ী আনিয়া উপুড় করিয়া দেওয়া হয় তখন আকরি
লৌহগুলি লাইনের ফাঁক দিয়া তলায় আসিয়া জমা হয় কিন্তু জমিতে গহ্বর থাকায়
লৌহগুলি সেই গহ্বরের ভিতর আসিয়া জমা হয়।

গহ্বর হইতে ফার্নেস পর্যন্ত বৈদ্যুতিক চুম্বক চালিত দুইটি ট্রলি আছে এ
উহারা "রোপ্ওয়ে" দ্বারা গহ্বর হইতে লৌহ লইয়া ফার্নেসের মুখ পর্যন্ত যাওয়া আ
করিতেছে অর্থাৎ একটি যাইতেছে, অপরটি আসিতেছে। এই ফার্নেসগুলি উচ্চে প্র
৯০ হইতে ১০০ ফুট হয় এবং ইহা শূন্য গহ্বর হয়। টাটার এই বৃহৎ কারখানায় সর্ব
৪টি ফার্নেস আছে তন্মধ্যে পর্যায়ক্রমে একটিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। ইহা ছাড়াও এ
নূতন প্রস্তুত করা হইতেছে। লৌহবাহিত ট্রলি চিমনির মুখ পর্যন্ত যাইয়া
ঢালিয়া দেয়। এই লৌহ প্রস্তরের সহিত কয়লা ও চুনাপাথর দিয়া লৌহ গলান
ইহার পর ফার্নেসে প্রবল বেগে বায়ু চালনা করা হয়। লৌহপ্রস্তর গলিতে থাকে
ফার্নেসের তলদেশে গলিত লৌহ জমে।

এই লৌহ প্রস্তরের সহিত বহু আবর্জনা ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত থাকে,
গলিবার সঙ্গে সঙ্গে গাদ বা ময়লাগুলি উপরে জমা হয়। এই গাদগুলিও নষ্ট
না। ইহাদিগকে লইয়া যাইয়া সুপরিকল্পনানুযায়ী কারখানার চারিদিকে প্রাচীরের
ঢালা হয় তাহাতে এই কারখানা ও শহরের সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে।

ইহার পর গলিত লৌহকে বাহির করিবার জন্য যে সকল ছিদ্র আছে তাহা খু
দেওয়া হয়; এখন এই গলিত লৌহ নালা দিয়া বাহির হইতে থাকে এবং ত
উহাকে বিভিন্ন ছাঁচের মধ্য দিয়া চালিত করা হয়। তাহার পরে iron slab গু
(ম্যাগনেটিক্ ক্রেন) magnetic crane-এ করিয়া বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত করা

এই লৌহের সহিত বিভিন্ন হারে কার্বন মিশ্রিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লৌহে রূপান্তরিত করা হয়।

আকরিক লৌহ কিভাবে মূল লৌহে রূপান্তরিত হয় তাহা বলা হইল। এবার লোকোশেড সম্বন্ধে বলিব। এই লোকোশেডটি দুইটি অংশে বিভক্ত (ক) "অ্যাক্সেল" এবং (খ) "চাকা"। এক অংশে কেবল মাত্র অ্যাক্সেল ও অপরাংশে কেবল মাত্র চাকা প্রস্তুত হয়।

প্রথম অংশে একটি ছোট থামের ন্যায় লৌহস্তম্ভ লওয়া হয় এবং উহাকে এক বিরাট আকার সেদের মধ্য দিয়া কাটা হয়, এইরূপ কাটিতে কাটিতে যখন পরিমাণ মত হয় তখন উহাকে সেদ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া ফার্নেসে দেওয়া হয়। যখন ওই থামটি লাল হইয়া উঠে তখন উহাকে ফার্নেস হইতে বাহির করিয়া আনা হয়।

একটি 'স্টীম-এঞ্জিন'এর মত যন্ত্র আছে এবং উহার সম্মুখভাগে একটি লৌহ আকর্ষক দণ্ড আছে। এই দণ্ডটি তখন উত্তপ্ত লৌহস্তম্ভকে ফার্নেস হইতে বাহির করিয়া আনে। উত্তপ্ত লৌহস্তম্ভটিকে বাহিরে লইয়া আসার অব্যবহিত পর উহার উপর ক্রমাগত ভারী বস্তুর দ্বারা আঘাত করা হয়। এই সমগ্র যন্ত্রটি বিদ্যুৎচালিত। ইহার পরই লৌহদণ্ডটিকে পরীক্ষা করা হয় ও পরীক্ষার পর রেলের চাকার সহিত লাগাইবার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। এই লৌহদণ্ডটিকে অ্যাক্সেল বলা হয়। এই অ্যাক্সেলগুলি অত্যন্ত মজবুত হয়, কারণ এই অ্যাক্সেলের উপরই সমগ্র বগীগুলির ভার পড়ে, যদি ইহা মজবুত না হয় তবে যে কোনো দিন গাড়ী ভাঙিয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে।

এখন ৩ ফুট উচ্চ ও প্রায় ১½ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট লৌহস্তম্ভগুলিকে চুল্লীতে দিয়া ভীষণ ভাবে উত্তপ্ত করা হয়। তাহার পর চুল্লী হইতে উহাকে বাহির করা হয় এবং উহাকে প্রথমে ২৫ হাজার পাউণ্ডের হাইড্রলিক-প্রেস (hydraulic press)-এর মধ্যে দেওয়া হয়, তখন ইহার আকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাহার পর উহাকে ২৫ শত টনের hydraulic press-এর মধ্যে প্রবেশ করান হয়। এখন এইভাবে একটি চাকার মত আকার হইলে উহাকে কলসীর ন্যায় একটি যন্ত্রের কাছে ধরা হয়। সেই যন্ত্রটির দ্বারা চাকাটির ঢাল ঠিক করা হয়। ঢাল ঠিক করিবার পর উহাকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয় তথায় চাকা পরীক্ষা হয় ও পরীক্ষা শেষে উহাকে বৈদ্যুতিক ক্রেনে করিয়া লাইনের উপর লইয়া যাওয়া হয়। কারখানার মধ্যেও রেলের লাইন পাতা আছে, তথায় তৈরী চাকাগুলিকে

চালাইয়া পরীক্ষা করা হয়। লাইনে চাকা দুটিকে রাখিয়া পূর্বেকার লৌহদণ্ড অর্থাৎ অ্যাক্সেলটিকে চাকার সহিত লাগাইয়া দেওয়া হয়।

ইহার পর শীটমেটাল মিলটি দেখিতে গেলাম। এই শীটমেটাল মিলটিই সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক। এই যন্ত্রটি অতি অদ্ভুত রকমের, ঠিক যেন আখমাড়া কলের ন্যায়। এই কলের দুই দিকে ক্ষুদ্র রোলার সন্নিবিষ্ট আছে এবং এই রোলারগুলি সব সময়ে ঘুরিতেছে কিন্তু এই ঘোরার মধ্যেও একটি নিয়ম আছে। এই রোলারগুলি একবার দক্ষিণাবর্তে (clockwise) ও অন্যবার বামাবর্তে (anti-ockwise) ঘুরিতেছে। এই ক্ষুদ্র রোলারগুলি মূল রোলারের ঠিক সমতলে অবস্থিত নহে, সামান্য উচ্চে অবস্থিত।

এখন প্রায় ১০ ইঞ্চি পুরু ও ২২ ফুট লম্বা একটি উত্তপ্ত লৌহ চাঙড়কে ছোট রোলারগুলির উপর দেওয়া হয়। এই রোলারগুলি পূর্বোক্ত নিয়মানুযায়ী ঘুরিতেছে বলিয়া লৌহখণ্ডটি ওই রোলারের উপর একবার এদিক ও আবার ওদিক যাইতেছে। কিছুক্ষণ এইরূপ ঘুরিবার পর হঠাৎ রোলারের প্রান্তভাগটি ঈষৎ উঁচু হইয়া যায় ও মূল রোলারের দিকটা সামান্য নিচু হইয়া যায়। তখন ওই লৌহখণ্ডটি মূল রোলারে পিষ্ট হইয়া বিপরীত দিকে চলিয়া যায়। আবার মূল যন্ত্রটির মধ্য দিয়া পূর্বেকার স্থানে চলিয়া আসে। এই-রূপ কয়েকবার যাওয়া আসা করিবার পর ইহার কলেবর ৪ ইঞ্চি পুরু ও ৯ হইতে ১০ ফুট লম্বা হইয়া যায়। ইহার পর দ্বিতীয় যন্ত্রে এই লৌহ চাদরটি স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয় যন্ত্রটি প্রথমটির অনুকরণ মাত্র, তফাত শুধু ইহার মূল রোলারের ফাঁকটুকু প্রথমটি হইতে কম। এই যন্ত্রে লৌহ চাদরটিকে চালনা করার পর ইহার দৈর্ঘ্য একটি কাপড়ের ন্যায় ও $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি পুরু হয়। ইহার পর এই চাদরটি পরীক্ষা করা হয় ও কোম্পানির সীল দেওয়া হয়। সীল দেওয়ার পর ওয়াগনে মাল তুলিয়া দেওয়া হয়। বিস্ময়ের কথা এই যে একটি বিরাট লৌহচাঁই হইতে ওয়াগনে ডেলিভারী দেওয়া পর্যন্ত মাত্র ২০। ২৫ মিনিট সময় লাগে।

ইহার পর মার্চেন্ট মিল সম্বন্ধে বলিয়াই এই কাহিনী শেষ করিব। প্রতি কারখানার মৃত্যুর হার হিসাব করিলে এই মার্চেন্ট মিলই প্রথম স্থান অধিকার করিবে। গড়পড়তা হিসাবে এখানে প্রতি সপ্তাহে একজন কর্মীর মৃত্যু হয়।

লৌহের শিক, গরাদ—যাহা আমরা সচরাচর বাড়ী-তৈয়ারীর কাজে এবং জানালায় ব্যবহার করি তাহা—এই স্থানেই প্রস্তুত হয়। এই যন্ত্রটিকে দেখিলে ধর্মতলার ট্রামের লাইন গুলির কথা মনে হয়। সমগ্র কারখানাটিই যেন ট্রামের লাইনের মত যন্ত্র দিয়া পরিপূর্ণ, এইরূপ দুইটি লাইনের সংযোগস্থলের জমিতে এক এক জন কর্মী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাধারণ

সাঁড়াশি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। যখন অধতরল পদার্থের ন্যায় শিক বা গরাদেগুলি একলাইন দিয়া আসে তখন কর্মীরা সাঁড়াশি দ্বারা শিক ও গরাদেগুলিকে অন্য লাইনে চালিত করে। এইরূপে এক লাইন হইতে অন্য লাইনে যাতায়াত করিবার সময় বিভিন্ন যন্ত্রের সংস্পর্শে আসিবার পর বিভিন্ন প্রকারের শিক ও গরাদে রূপে বাহিরে আসে।

মোটামুটি এই আমাদের ভারতবর্ষ ও তাহার লৌহ শিল্পসম্পদ। আজ যদি যন্ত্রশিল্পে আরও উন্নতি করিতে হয় তবে ভারতের পক্ষে প্রয়োজন আরও অধিক লৌহশিল্প প্রতিষ্ঠান।

এ যুগের বিস্ময়

পিনাকী ভাদুড়ী

[তৃতীয় বার্ষিক বিজ্ঞানের ছাত্র। বহু-আলোচিত আণবিক বোমা এ-যুগের সবচেয়ে একটা বিস্ময়ের বস্তু। লেখক সহজ ভাষায় এই বিষয়টি অবৈজ্ঞানিকদেরও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।—সম্পাদক]

৬ই আগস্ট, ১৯৪৫। নিশুতি রাত। পৃথিবী ঘুমোয়। আঁধারের বুক চিরে একটি মার্কিন বোমারু বিমান জাপানের হিরোশিমা শহরের ওপর এল। প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ। চমকে ওঠার আগেই সমগ্র হিরোশিমা ভস্মস্তূপে পরিণত হ'ল। বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাবার আগেই ৯ই আগস্ট ধ্বংস হ'ল নাগাসাকি।

বলা বাহুল্য, সে বিস্ময়কর বস্তুটি হচ্ছে আণবিক বোমা।

আণবিক বোমা সম্বন্ধে জানতে গেলে প্রথমে জানা দরকার অ্যাটম কাকে বলে! এক টুকরো খড়ি নিন্। তাকে ভাঙতে থাকুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ আরো। শেষে খড়ির এমন একটি অংশ পাবেন, যেটা হ'ল খড়িটির ক্ষুদ্রতম অংশ, কিন্তু যার মধ্যে খড়ির গুণ সম্পূর্ণ বজায় আছে। এর নাম 'মলিকিউল' বা 'অণু'। এই মলিকিউলকে ভাঙলে পাওয়া যায় অ্যাটম বা পরমাণু। সুতরাং একে আণবিক বোমা না বলে পরমাণবিক বোমাই বলা উচিত।

এখন এই অ্যাটমে কি আছে দেখা যাক্। যে কোন পদার্থের অ্যাটমের ঠিক মাঝখানে থাকে নিউক্লিয়াস, আর তাকে ঘিরে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসের মধ্যে দুটো জিনিস আছে, প্রোটন আর নিউট্রন। প্রোটন আর ইলেকট্রন হ'ল দুটি বিপরীতধর্মী শক্তি, পজিটিভ্ আর নেগেটিভ্। নিউট্রনের কোন শক্তি নেই, আছে ওজন।

আণবিক বোমা তৈরী করতে গেলে ইউরেনিয়াম ধাতু কাজে লাগে। ইউরেনিয়ামের তিনটি আইসোটোপ আছে—U234, U235, U238. U235য়ের প্রয়োজন হয় এই বোমা প্রস্তুতকালে। এখন 'আইসোটোপ' কি সেটা একটু জেনে নেওয়া দরকার।

যখন একাধিক জিনিষের (একই পদার্থের বিভিন্ন রূপ) অ্যাটমে ইলেকট্রন ও

প্রোটনের সংখ্যা সমানই থাকে, কিন্তু তাদের 'অ্যাটমিক ওয়েট' নিউট্রনের সংখ্যাধিক্যের জন্য বদ্‌লে যায়, তখন তাদের বলা হয় আইসোটোপ। এদের রাসায়নিক গুণাগুণের কোন পরিবর্তন হয় না। অ্যাটমিক ওয়েট বলতে আমরা বুঝি যে কোনো পদার্থের অ্যাটম হাইড্রোজেনের অ্যাটম থেকে কতগুণ ভারী।

এ বোমা তৈরীর ইতিহাস খুঁজলে আমরা দেখব বৈজ্ঞানিক লরেন্সকে। লোহাকে বা পারাকে সোনায় পরিণত করার সাধনায় তিনি মগ্ন। নানা গবেষণার পর তিনি দেখলেন যে লোহা বা পারার অ্যাটমের নিউক্লিয়াসকে যদি বাইরে থেকে ইলেকট্রন প্রবেশ করিয়ে আঘাত করা যায়, তবে লোহা সোনায় পরিণত হ'তে পারে। বেকারেলের পিচ থেকে ইউরেনিয়াম এবং মাদাম কুরীর রেডিয়াম আবিষ্কার জগতে তখন সাড়া এনে দিয়েছে। এই ধরনের এক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেল, যার নাম পোলোনিয়াম। লরেন্স দেখলেন যে এই পদার্থ থেকে প্রতি সেকেণ্ডে ছুটি করে ইলেকট্রন বেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি আবিষ্কার করলেন সাইক্লোট্রোন। পোলোনিয়াম থেকে নির্গত ইলেকট্রন এ যন্ত্রের মধ্যে ফেললে, সে এক ভীষণ গতিবেগের অধিকারী হয়, যার ফলে সে প্রচণ্ড বেগে লোহা বা পারার অ্যাটমের ভেতর প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু দেখা গেল যে ইলেকট্রন প্রচণ্ড গতিশীল হয়েও প্রবেশ করতে পারছে না। তার কারণ-স্বরূপ জানা গেল, যে অ্যাটমের ভেতর ইলেকট্রনটি প্রবেশ করবে, সেই অ্যাটমের চারপাশের ইলেকট্রনগুলো একে বিকর্ষণ করছে এবং ইলেকট্রনটির পক্ষে কিছুতেই এই বৈদ্যুতিক বাধাকে এড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং এমন একটা জিনিস এর মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে, যাকে ইলেকট্রনগুলো বাধা দিতে পারবে না। দেখা গেল, নিউট্রন দিয়ে এ কাজ সম্ভব। এর ফলে আরো একটা সুবিধে হ'ল যে নিউট্রনকে সাইক্লোট্রোন যন্ত্রে ফেলতে হয় না; কেননা এ নিজেই পোলোনিয়াম থেকে ভীষণ গতিশীল হয়েই বেরোচ্ছে।

জার্মানীর অটো হান্ ও ষ্ট্রাস্‌ম্যান লক্ষ্য করলেন যে এই গতিশীল নিউট্রন দিয়ে যদি U235য়ের অ্যাটমে আঘাত করা যায়, তবে নিউট্রনটি অ্যাটমের নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করবে। ফলে অ্যাটমটি অস্থির হয়ে পড়বে এবং আরো নিউট্রন বেরিয়ে আসবে। এদের মধ্যে একটা নিউট্রন আবার আরেকটি অ্যাটমকে আঘাত করবে। সেখান থেকেও নিউট্রন বেরিয়ে আসবে এবং তারাও অন্যান্য অ্যাটমকে আঘাত করবে। একে বলে chain reaction. সুতরাং একটা নিউট্রনের বদলে যদি একাধিক নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা যায় তাহ'লে ইউরেনিয়ামের আরো বেশী অ্যাটম ভাঙতে সুরু করবে। এই ভাঙনের নাম fision. এই ভিত্তিতে তৈরী হ'ল এই মারণাস্ত্র। আণবিক বোমার

মধ্যে দুটি কক্ষ থাকে ইউরেনিয়াম ও পোলোনিয়াম। মাঝখানে থাকে মলিবডেনিয়াম
পর্দা, যেটি পোলোনিয়াম থেকে নির্গত নিউট্রনগুলো শুষে নেয়। ঠিক যখন বোমা
ফেলা হয়, তখন একটি বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সাহায্যে পর্দাটি সরিয়ে নেওয়া হয়। ফ
পোলোনিয়াম থেকে নির্গত নিউট্রনগুলো ইউরেনিয়াম ২৩৫য়ের অ্যাটমে আঘাত ক
এবং ইউরেনিয়ামের ভাঙ্গন সুরু হয়। তার ফলে এক প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ হয়। যার ফ
১০। ১৫ মাইল দূরবর্তী ব্যাসার্ধের মধ্যে কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। ৫০০। ৬০০ মা
দূরের দেশগুলি পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ থেকে 'গামা রে' নামে যে রশ্মিটি বেরোয় তার ফ
৫। ৬ শ' মাইল দূরবর্তী মানুষেরও জীবনীশক্তির হ্রাস বা মৃত্যু ঘটে। বোমাটি যেখা
পড়ে সেখানে এক সেকেণ্ডের জন্য সূর্যের থেকেও বেশী তাপ (১০ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রে
উৎপন্ন হয়। তারপরে এর তাপ হয় ৬০ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। বায়ুর চাপ ভী
বেড়ে যায় এবং ঘণ্টায় ২০০০ মাইল গতিতে বাতাস ছুটে আসে। এখনো একটা অ্যাট
সম্পূর্ণ শক্তিকে কাজে লাগানো যায়নি, তা হ'লে নাকি পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ ধ্ব
হয়ে যাবে। কিন্তু আণবিক বোমা সহজে তৈরী করা যায়না, কেননা U 235 তৈ
করা খুবই শক্ত ও ব্যয়বহুল।

বিশ্বের মানুষ ভয়ে ও বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে এই বিরাট পরমাণবিক শক্তির দি
এর সাহায্যে মানুষের ধ্বংস ও উন্নতি উভয়ই করা যেতে পারে। ভবিষ্যতের দি
তাই আমরা চেয়ে রয়েছি। এ শক্তি কি আনবে—ধ্বংস না সৃষ্টি?

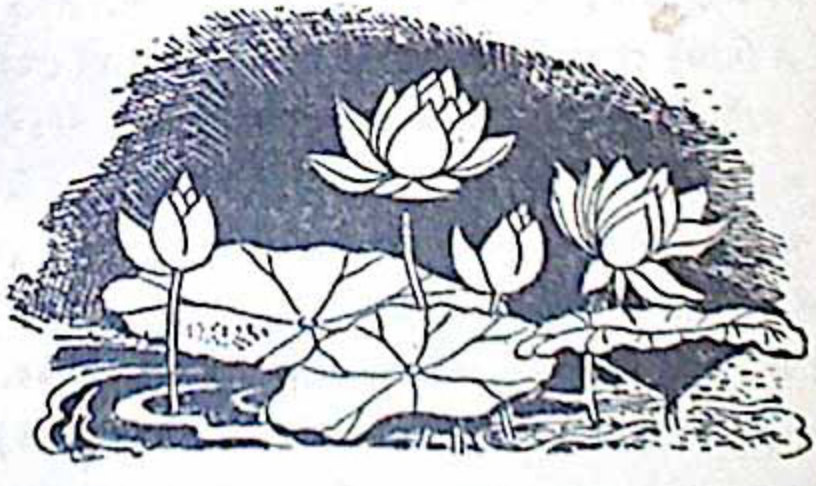

অস্তিত্ববাদ প্রসঙ্গে

মানস রায়চৌধুরী

[তৃতীয় বার্ষিক বিজ্ঞানের ছাত্র। স্বপাঠ্য কবিতা রচনায় হাত আছে। এবার একটি গুরুপাক প্রবন্ধ দিয়েছেন—এটি অস্তিত্ববাদের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয়। সাধারণ লক্ষণটি তুলে ধরেছেন মাত্র; অস্তিত্ববাদ-দর্শন সম্পর্কে উদ্ধৃত প্রধান মতগুলি লক্ষ্য করবার মতো। পরবর্তী সংখ্যায় এই প্রবন্ধের বাকিটা শেষ করবেন।—সম্পাদক]

যুদ্ধপরবর্তী য়ুরোপ সম্পর্কে আমাদের উৎসাহ স্বাভাবিক। তার সাহিত্য, দর্শন ও নব্য বিজ্ঞান সম্পর্কে আমরা সবিশেষ কুতুহলী। এতবড় একটা যুদ্ধের হনন, মৃত্যুর বীভৎসতা, গ্লানি, ক্লেদ য়ুরোপের ভাবজগতে যে প্রভাব বিস্তার করবে একথা জানাই ছিল। ফলে আমরা দেখেছি, এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার ঢেউ সমগ্র য়ুরোপের বুদ্ধিজীবি-মানসে বিরাট আলোড়ন এনেছে, নতুন নতুন দার্শনিক চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছে। জঁা-পল-সাত্র্ (Jean-Paul-Satre) সম্প্রদায়ের অস্তিত্ববাদী দর্শন ও সাহিত্য এরই ফল হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানমার্গে ঐ দর্শন প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। কারো কারো বা ধারণা অস্তিত্ববাদ এ যুগের অন্যতম মানব-দর্শন মার্ক্সবাদের পাশাপাশি দাঁড়াতে সক্ষম। কেননা মার্ক্সবাদের অসম্পূর্ণতার বেড়াজাল ছিন্ন হয়েছে এ দর্শনে। কাজেই জীবনের সামগ্রিক মুক্তির জন্যে কোনো দর্শনকে অবলম্বন করতে হলে সাত্র্-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ববাদ-কে বাদ দিলে চলবে না—এ ধরনের মনোভাব বিভিন্ন মহলে দানা বাঁধছে। ইংরেজী কবি ও শিল্প-সমালোচক হার্বার্ট রীড তাঁর 'Existentialism, Marxism and Anarchism' নামক পুস্তিকায় মার্ক্সবাদ ও অস্তিত্ববাদের তুলনামূলক সমালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আজকের দিনে ঠিক এমনি একটি দর্শনের প্রয়োজন যেখানে অস্তিত্ব (existence), সত্তা (essence)-র সঙ্গে দ্বান্দ্বিক নিয়মে এক আকার ধারণ করেছে। যেখানে দর্শন শুধু বস্তুবাদ নয়, ভাববাদও।

"I believe that another philosophical attitude is possible and that it preserves the concept of freedom without which life becomes brutish. It is materialistic philosophy, but it is also an idealistic philosophy ; a philosophy that combines existence and essence in dialectical counter play."—Pp. 20, 'Existentialism, Marxism and Anarchism.'

অস্তিত্ববাদী দর্শনের উৎসমুখ মুখ্যতঃ উনবিংশ শতাব্দীর ডেনিশ দার্শনি
কিয়ের্কেগার্ড। কিয়ের্কেগার্ড সাধারণের কাছে স্বল্প-পরিচিত হ'লেও, দর্শনের ছাত্রের কা
অপরিচিত নন। এই কিয়ের্কেগার্ড বলেছিলেন: মানুষের অস্তিত্বের সত্যতা আসে
তার অন্তর্মুখিতা (inwardness) থেকে। মানুষের ব্যক্তিগত বিচারবোধের উপ
যে বাস্তব নির্ভর করে, এসত্য কাণ্ট বা হেগেল অস্বীকার করলেও, কিয়ের্কেগা
এগুলির উপর বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু হার্বার্ট রীড, কিয়ের্কেগার্ড
অস্তিত্ববাদী দর্শনের জন্মদাতা বলে মানতে রাজী নন। তিনি মনে করে
অস্তিত্ববাদী দর্শনের জন্মদাতা হচ্ছেন জার্মান দার্শনিক শেলিং। এবং এই শে
-এর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে স্বয়ং কিয়ের্কেগার্ডও জার্মানীতে গিয়েছিলেন। এ-ছা
বিগত যুগের কবি কোলরিজও কিয়ের্কেগার্ডের আগে অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারার ক
ভেবেছিলেন। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই : বিগত দশকেই এই দ
পরিণত আকার ধারণ করে এবং কিয়ের্কেগার্ড এই দর্শনের সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যমণি।

অস্তিত্ববাদী দর্শনের আরো কিছু পরিচয় আছে জার্মান দার্শনিক নীট্‌শে
পরবর্তী চিন্তাধারার মধ্যে। নীট্‌শের দর্শনে ছিল ব্যক্তির স্বাধীন-বিচারবো
প্রকাশ, আবেগ ও অস্থিরচিত্ততার ঔজ্জ্বল্য। কিন্তু এ দশকের অস্তিত্ববাদীরা নীট্‌শে
কিয়ের্কেগার্ডকে ততটা নিকট বলে মনে করেন না। বরং অস্তিত্ববাদী চিন্তানায়
হাইডগার তাদের অনেক বেশী আপন। সার্ত্র্ নিজের দর্শনেরই নাম দিয়েছেন "যুক্তি
নিরীশ্বরবাদী দর্শন" (coherent æetheist philosophy)। সার্ত্র্-র নিজের বিশ্ব
এই পার্থক্য ও ভিন্নতা উপলব্ধি না করেই অনেকে তাঁর প্রতি মিথ্যা আক্রমণ করেছে
কিন্তু তাই বলে সার্ত্র্কে কার্ল জেস্‌পারস্ বা মার্শেল (নীট্‌শের ধারারক্ষী বলে খ্যাত
-এর সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে মনে করবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

অস্তিত্ববাদী দর্শনের দুটো রূপ আমাদের কাছে প্রতিভাত। প্রথমটি ধর্মে
আকারে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চায়, অপরটি ধর্মহীন মানবতার (æetheist humanism
উপর দাঁড়াতে চায়। সার্ত্র্ নিজেকে এই দ্বিতীয় দলের লোক বলেই মনে করে
তাঁর নিজের উক্তিতেই এটি পরিস্ফুট হয়—"There are, on the one han
the Christians amongst whom I shall name Jaspers and Gabriel Marc
both professed Catholics ; and on the other existential ætheis
amongst whom we must place Heidegger as well as French existentiali
and *myself*. What they have in common is simply the fact that th

believe that existence comes before essence, or if you will, that must begin from the subjective."—'Existentialism and Humanism', translated by Philip Mairel. Pp. 26.

সার্ত্র্-র নিজস্ব দর্শনের আলোচনার পূর্বে অস্তিত্ববাদের পটভূমিকা সম্পর্কে দৃষ্টি সজাগ রাখতে হবে।

আমরা দেখেছি সমগ্র য়ুরোপে যুদ্ধের নারকীয় পরিণতি, ঘাতকের পৈশাচিক উৎপীড়নের ফলে মানুষের সহজাত মন হতাশার ভিতর দিয়ে আত্মগত ভাবালু হয়ে উঠতে চেয়েছে। রাষ্ট্রনীতির উপর মানুষের অবিশ্বাস, প্রচলিত সংস্কারের প্রতি বিমুখতা, এ সবই অস্তিত্ববাদী দর্শনের উদ্ভাবনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একেই 'futile soil for the seed of subjective absolutism' বলা চলতে পারে। কিন্তু এর পিছনে ছিল আরেকটি ঐতিহাসিক পরিণতির ক্রিয়াশীলতা।

উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থায় যে উদারনীতির প্রবাহ বইছিল, বিংশ শতাব্দীর ধনতন্ত্রবাদের অভিব্যক্তি তাকে রুদ্ধ করল। শুধু অর্থনীতি বা রাষ্ট্রনীতিতেই নয়, সমাজমানসেও তার প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হল। তাই দেখা গেল, মুনাফার জন্যে, বাজার দখলের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে ধনতন্ত্রবাদ। আর তার থেকেই জন্ম নিচ্ছে যুদ্ধ-বিগ্রহ। ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে মুনাফা-লোভীদের নিপীড়নে। ব্যক্তি নেই, তার জীবন নেই, শুধু লুণ্ঠন! ফরাসী অস্তিত্ববাদীদের সম্পর্কে আলোচনার প্রাক্কালে তাই এইসব বাস্তব পটভূমিকাকে বিস্মৃত হলে চলবে না।

হার্বার্ট রীড অস্তিত্ববাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে বলেছেন—'It would seem that the philosopher who calls himself an existentialist begins with an acute attack of self-conscious or inwardness, as he prefers to call it. He was suddenly aware of his separate lonely individuality and he contracts this not only with the rest of human species, but with the whole goings-on of the universe.'

আত্মাকে এ-ভাবে উপলব্ধি করবার মূলে রয়েছে একটি ধারণা—যে অস্তিত্ব সত্তার প্রথম কথা, তাকে উপলব্ধি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সার্ত্র্-র কথা, মানুষ শুধু মানুষ-ই (Man simply is), সে নিজেই তার অস্তিত্বের প্রতিভূ। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ব্যক্তির নিজের সমগ্র জীবনের দায়িত্ব নিজের উপরে নির্ভরশীল। অন্য কেউ সেখানে নেই।

সমাজের সব পরিবেশ এড়িয়ে মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হ'তে হবে। নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কোনো দৈবীশক্তি তাকে পরিচালিত করছে না। সার্ত্র্-র দাবী, এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মনির্ভরশীলতার উপর সমাজের, সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য নির্ভর করছে। কর্মক্ষেত্রে নিত্য নতুন লোকের সংস্পর্শে আসতে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু চিন্তার ব্যাপারে সকলেই একক, নিজের উপলব্ধিতে সকলেই স্বতন্ত্র। আর মানবজাতির উন্নতি এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে কেন, তা বলতে গিয়ে সার্ত্র্ বলেছেন—'In fashioning myself, I fashion man'—অর্থাৎ নিজের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে, নিজের আত্মগত গঠনের মধ্যে দিয়ে গোটা মানুষ সমাজকেই গড়ে নিতে হচ্ছে। ব্যক্তিকে নিয়েই তো সমাজ।

হার্বার্ট রীড-এর মতে, এ জায়গায় সার্ত্র্-র অস্তিত্ববাদ মার্ক্সবাদের সংকীর্ণতার অনেক উর্ধ্বে উঠেছে এবং সত্যকারের মুক্তির রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে। 'No sort of materialism will ever explain this transcendence of situation, followed by a turning back to it'—নিজের অন্বোপলব্ধির সাহায্যে মানুষ পরিবেশ হ'তে মুক্ত হবে এবং তখন পরিবেশের দিকে আবার ফিরে তাকাবে পরিবেশকে উন্নততর করবার জন্যে।

আইনস্টাইন তাঁর 'Science and religion' প্রবন্ধে এই শতকের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বর্ণনে বলেছেন—"It is the aim of science to establish general rules which determine the reciprocal conceptions of objects in time and space". কারো কারো মতে অস্তিত্ববাদ 'reciprocal conceptions of objects in time and space'-কেই গ্রহণ করেছে। এখানে সার্ত্র্-এর বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি—'we had to present creatures whose reality would be tangled and contradictory tissue of each one's evaluations of all other characters—himself included—and evaluations by all others of himself.'

যাতে অস্তিত্ববাদকে 'ইউটোপিয়া' আখ্যা না দেওয়া হয়, তার জন্যে সার্ত্র্-এর এই উক্তি চিন্তাকর্ষক : 'Revolutionary men must be contingent being, unjustifiable but free, capable of transcending this society by his effort to change it.....Revolutionary philosophy must be a philosophy of transcendence.' সার্ত্র্-এর 'transcendence of situation' ও 'effort to change it' বুদ্ধিজীবিদের কাছে বিশেষ চিত্তচাঞ্চল্যকারী।

সার্ত্র্-এর দর্শনের এই আত্মসংবেদনার মূল্য বিচার করতে গিয়ে আমরা দেখি, তার কোনো স্বতন্ত্র মূল্য নেই। কেননা, সার্ত্র্বাদের মূলভিত্তি হচ্ছে, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, মানুষের আত্মগত মহত্ত্বের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।—এতে হয়তো আত্মপ্রসাদ আছে, কিন্তু মুক্তি নেই। ব্যক্তির দৃষ্টির সম্মুখে যা নেই তাকে অস্বীকার করে (I must confine myself to what I can see—Satre) সার্ত্র্ বলেছেন "In reality things will be such as men have decided thay shall be" মূলতঃ আমরা দেখছি সমাজ-সভ্যতাকে খেয়ালখুশীর উপর নির্ভরশীল করে তোলা এবং সমগ্র বিশ্বকে 'সংবেদনসিদ্ধ' ভাবা ভাববাদেরই নামান্তর। এর কোনো বস্তুভিত্তি নেই।

ভাববাদী দর্শনের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত চোখধাঁধানো চিন্তাধারা punch করে সার্ত্র্ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ববাদ গড়ে উঠেছে; phenomenologist দর্শনের কথা—ঘটনা ও বস্তু সম্পর্কে আমাদের ধারণা প্রত্যেকের আত্মগত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ pre-existence choice,—এবং এর সঙ্গে অহম্-বাদ, ইন্দ্রিয়জ-অভিজ্ঞতাবাদ এবং সর্বোপরি সংশয়বাদ মিশিয়ে খাড়া করা হয়েছে অস্তিত্ববাদকে। এমনকি বিশ শতকের প্রথমদিকে যে emperio criticism-এর প্রবাহ চলেছিল, তা-ও চিহ্নিত আছে ঐ দর্শনে।

সার্ত্র্ এতেও শেষ করেননি। তিনি বলেছেন, তাঁর দর্শনের উদ্দেশ্য হবে—to complete marxism on the side of subjectivism. কেননা তিনি মানুষ ও ব্যক্তির চিন্তনে মার্ক্স-এরই সমগোত্রীয়—'not far from the conception of man found in Marx'. আসলে বস্তু-জগৎকে 'universe of human subjectivity' বলে কল্পনা করে সার্ত্র্ মার্ক্স এর কাছে না গিয়ে সরাসরি 'emperio critic'-দের কাছে হাজির হয়েছেন। ইন্দ্রিয়-সংবেদন যেমন মানব-জ্ঞানের সুরুতে কাজ করে, তেমনই তাকে বাস্তবজগতের প্রতিবিম্ব বলে গ্রহণ করাই মার্ক্সবাদের শিক্ষা। তাই মার্ক্সবাদ বলে, আত্মগত ভাববাদী ও বস্তুবাদী উভয়েই ইন্দ্রিয়জ-সংবেদনকে জ্ঞানের উৎস বলে মনে করেন। জ্ঞানের সুরুতে তাঁরা একমত। ঠিক তেমনি সার্ত্র্-এর যাত্রা সুরু subjectivism থেকে। তাঁর পথের শেষ আত্মগত ভাববাদে। পূর্বেও আমরা এরকম দেখেছি—'বার্কলে' ও 'দিদেরো' দুজনেই লকের (Locke) জ্ঞানতত্ত্বে আস্থাশীল ছিলেন।

হার্বার্ট রীড মার্ক্সবাদের সঙ্গে পরিচিত, তাই অস্তিত্ববাদীর আত্মগত ভাবালুতা লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়েছিলেন, কিন্তু সার্ত্র্ বাস্তবে চোখ ফেরাতেই তিনি আশ্বস্ত হয়ে ওঠেন। তবে কোনো মার্ক্সবাদীর এতে আশ্বস্ত হবার সংগত কারণ নেই। কেননা

সমগ্র বাস্তব জগৎকে আত্মোপলব্ধির মধ্যে দিয়ে পালটে ফেলার চিন্তা, নেহাতই ভাববাদীসুলভ। বস্তুবাদী এতে কখনোই বিমুগ্ধ হ'তে পারেন না। ভাববাদী দর্শনের এই সব স্পষ্ট লক্ষণ যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, সার্ত্র্ অস্তিত্ববাদকে ভাববাদী ন্যায়শাস্ত্র ও অধ্যাত্মবাদের বিরোধী বলে চালালেন কেন? কারণ অতি সহজ, প্রতি যুগেই এটা হয়েছে। যখনই কোনো দর্শনের সংজ্ঞা পুরনো এবং বহু প্রচলিত হয়ে পড়ে তখনই পুরাতনের সমগোত্রীয় দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে চিন্তানায়কদের নতুন সংজ্ঞার আশ্রয় নিতে হয়েছে। ব্রহ্মবাদের নামে, চৈতন্যবাদের নামে কিংবা সমস্তই ইন্দ্রিয়জ-অভিজ্ঞতার সমষ্টি বলে দর্শনকে খাড়া করায় বিপদ অনেক, সার্ত্র্ এটুকু বুঝেছিলেন বলেই অস্তিত্ববাদের সৃষ্টি করলেন। তাই জগৎ, জীবন, ও পরিবেশ সম্পর্কে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা আর কারো কাছে আশা করলেও, সার্ত্র্-পন্থীদের কাছে আশা করা যায় না। ব্যক্তি তার আত্মসংবেদনসিদ্ধ সিদ্ধান্তের উপর জগৎ, জীবন সবকিছুকে নির্ভরশীল করে তুলেছে—সার্ত্র্-এর মুখেই শুনি।

সার্ত্র্ তথা তাঁর দর্শন সম্পর্কে এত কথা বলবার পর, তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে কিছু না বললে বক্তব্যের অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। সার্ত্র্ মূলতঃ সাহিত্যিক, গৌণতঃ দার্শনিক। তাঁর দর্শন গড়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যিক জীবনদর্শনের আলোবাতাসে। তাঁর উপন্যাসের নায়কনায়িকার মুখ থেকে আমরা অস্তিত্ববাদী দর্শনের কথা শুনেছি। তাঁর 'Age of Reason' উপন্যাসের নায়ক ম্যাথুর মুখে আমরা শুনেছি "Liberty—I sought it far away, it was so near that I can't touch it, it is, in fact myself. I'm my freedom." পাশাপাশি অন্য চরিত্রগুলো 'Liberty' সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা পোষণ করছে। দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সংশয়ে আচ্ছন্ন প্রত্যেকটি চরিত্রই নিজের খাতে বয়ে চলেছে। এটাই যেন অস্তিত্ববাদী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। নাৎসী-নিপীড়িত য়ুরোপের জনসাধারণের দুঃখদৈন্যের চিত্র উদ্ঘাটন করতে গিয়ে অস্তিত্ববাদী সাহিত্যিকেরা এই নেতির জগতে জীবনকে 'a living warmth' বলে কল্পনা করেছেন; একথা ভেবেও উত্তাপ অনুভব করি। ম্যাথুর চরিত্রে দেখি, এক একটি মুহূর্ত তার কাছে জীবনের মতোই নিবিড়, অস্তিত্বের স্বাদে মধুর।

এদেশের সার্ত্র্ পন্থীদের মতে উপলব্ধির যে-সূক্ষ্মতা নিয়ে অস্তিত্ববাদের কারবার প্রচলিত মার্ক্সবাদ বা খ্রীষ্টধর্মের স্থূল পরিবেশ ও সহজ বুদ্ধি সেখানে প্রবেশ করতে রাজী হবে না।

কিন্তু বস্তুবাদী ডায়ালেকটিক্স্ দর্শনের মানুষ প্রকৃতির মধ্যে বাস করে। তার কার্যকারণ সম্পর্কে অভিহিত হ'য়ে ঐতিহাসিক যুগেই আবার প্রকৃতিকে জয় করার জন্যে —নিজের ক্ষমতাকে ক্রমপ্রসারিত করার দিকে অগ্রসর হয়। মানুষের স্বাধীনতা, পরিবেশের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুক্তির পথে অগ্রগতির পথ, আত্মগত ভাবে মগ্ন হ'য়ে থাকা নয়—বস্তু জগতের মধ্যে থেকেই তাকে পরিবর্তিত করে নিজের মুক্তিকে আদায় করার পথ। মানুষই ইতিহাসের স্রষ্টা, সে কখনোই ইতিহাসের দাস নয়—একথা মার্ক্সীয় দর্শনই বলে।

তাই সাত্র্বাদীর মুক্তির পথ শুনে বড়ো একটা বিস্মিত হইনা। কারণ তাঁরা মানুষকে, ব্যক্তিকে অমানুষ করে তুলেছেন। ঐতিহাসিক 'necessity' তাঁদের কাছে বন্ধন—determinism, আর সাত্র্ এই determinism-এর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত।

ফরাসী সাহিত্যে সাত্র্-র পূর্বসূরী আঁদ্রে জিদ সাত্র্ সম্পর্কে বলেছেন: "A talented writer, no doubt; but not the intellectual leader as he is regarded by his followers. The so-called existentialism is quite a messy affair—no philosophical doctrine, no programme, no solution." মন্তব্যটি ভেবে দেখবার মতো।

বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে নরনারীর প্রেম-প্রকৃতি

অধ্যাপক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ.

[সুখের কথা, আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সুকুমার বাবুকে আমরা বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইনি ১৯৪৭ সালের কলেজ পত্রিকার সম্পাদকগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। বঙ্কিম সাহিত্যে জীবন-জিজ্ঞাসা আর শরৎ-সাহিত্যে বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গী—এই দুয়ের মধ্যে থেকে প্রবন্ধকার নর-নারীর প্রেম-প্রকৃতির মূল সুরটি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন।—সম্পাদক]

পুরুষ এবং প্রকৃতি বিশ্বের লীলাভূমিতে অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। তাহাদে লীলাচঞ্চল আবর্তে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইতেছে। ইউরোপীয় দৃষ্টি হইতে দেহবাদ, বিজ্ঞানবাদের দৃষ্টি, প্রাচ্য-দেশ দেহ অপেক্ষা দেহাতীতের প্রতি চিরদিন জীবনে সার্থকতা লক্ষ্য করিয়াছে, সে দৃষ্টি অধ্যাত্মমূলক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের এই মিলি বিন্যাস ও দ্বন্দ্ব স্রষ্টার লেখনীতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের সৃষ্টিতে জীবন-জিজ্ঞাসা উত্থাপন করিয়াছে এবং সমাধানেরও চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সমাধান মিলিয়াছে কি?

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে জীবন-জিজ্ঞাসা কয়েকটি শাশ্বত সত্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকা পাইয়াছে। তিনি দেখিয়াছেন প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম-পাশকে এবং প্রবৃত্তির দাসত্বে অতিক্রম করিয়া যাইবার চেষ্টায় মানুষের জীবন-সংঘাত দেখা দিয়াছে। তাহার ফ হয় জীবনকে অস্বীকার করিয়া অধ্যাত্মলোকে প্রয়াণ, নয় তো সম্পূর্ণভাবে প্রবৃত্তির কা আত্মসমর্পণ। জীবনের এই অতি সত্য উপলব্ধিকে উপন্যাসের মধ্য দিয়া ব্যাখ্যা করি গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পুরুষের মধ্যে জীবন-সংগ্রাম, চিত্ত-দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রে দৃষ্টিতে নারী-প্রকৃতি প্রবৃত্তির ইন্ধন-স্বরূপা। অনতিক্রমণীয় নিয়তির পাশ জড়াই দিয়াছে নারীই পুরুষের পায়ে—শক্তিমান এই বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়াছে, কিন্তু নারী নিকট তাহাকে দিতে হইয়াছে জীবনের চরম মূল্য। কিন্তু তবুও কি শেষ পর্যন্ত নগেন্দ্রনা ভবানন্দ, চন্দ্রশেখর, সীতারাম জীবনকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারিয়াছে? অপর দিকে দুর্বল পুরুষের কাছে নারীর আবির্ভাব শাসনদণ্ড লইয়া—এখানে অভিশপ্ত জীবনে পথ-নির্দেশ করিয়াছে নারী। দেবেন্দ্রনাথ, পশুপতি, গঙ্গারাম প্রভৃতির জীবন তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

এখন অত্যন্ত সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মূলমন্ত্র শুনাইতে চেষ্টা করিব। নিশ্চল, নির্বিকার, সরল অথচ কঠিন প্রকৃতির অপূর্ব সুন্দর প্রতিবিম্ব কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষুব্ধ করিয়াছে। যে নবকুমার সংযমে, দৃঢ়তায় মতিবিবির বন্ধনকে অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছে, কপালকুণ্ডলার সান্নিধ্যে তাহার সমস্ত পৌরুষ নির্বাপিত। "বিষবৃক্ষ" উপন্যাস বঙ্কিম-কবি-মানসের প্রেমতত্ত্ব বিশ্লেষণের অপূর্ব ক্ষেত্রভূমি। কুন্দ-হীরা-সূর্যমুখী-কমল নারীপ্রকৃতির চার বৈশিষ্ট্য। এখানে পুরুষকে প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে এবং পুরুষ-সত্তার উত্থান-পতনের পরিমাপক ও পরিশোধকরূপে নারী-চরিত্রগুলি ক্রিয়াশীল। "চন্দ্রশেখর" উপন্যাস প্রবৃত্তিপাশে পুরুষ এবং নারীর চরম নিঃসহায়তার ইতিবৃত্ত। প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেম সামাজিক অনুশাসনে অস্বীকৃত। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহার অধ্যাত্ম-সাধনার ফল প্রবৃত্তির পাদমূলে অর্পণ করিল কেন? তাহার উত্তর বঙ্কিম-চন্দ্র পাইয়াছেন প্রতাপের জীবনে প্রবৃত্তি ও পৌরুষের দ্বন্দ্ব হইতে। "রজনী" উপন্যাসে অমরনাথের জীবনব্যাপী স্বার্থত্যাগ ঘটিয়াছে অথচ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার অধিকারটুকু তাহার নাই। গোবিন্দলাল-রোহিণীর পরিণতিতে "কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসে প্রবৃত্তির দাসত্ব স্বীকারের কথা লিপিবদ্ধ। এইভাবে নারী ও পুরুষের প্রেম-প্রকৃতির অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব বঙ্কিমের শিল্পচেতনাকে অগ্রগতি দিয়াছে। অবশেষে অধ্যাত্ম-জীবনকে প্রাধান্য দিয়া নিষ্কাম ধর্মের মধ্যেই প্রবৃত্তির পরিশোধন সম্ভব করিয়া লইবার চেষ্টায় যথাক্রমে আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরাণী-সীতারাম উপন্যাস-ত্রয়ীর আবির্ভাব। কিন্তু ভবানন্দের মতো সর্বত্যাগী পুরুষের জীবন নিষ্কৃতি পায় নাই কল্যাণীর পার্থিব মনোবৃত্তির সংস্পর্শে। বিরাট শক্তির অধিকারী সীতারাম রাষ্ট্র-পরিচালনা করিয়াছে, কিন্তু রূপ-মুগ্ধতায় শেষ পর্যন্ত জীবনকে লইয়া আসিয়াছে চরম ট্রাজিডির মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত জীবনব্যাপী প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সমন্বয়-প্রচেষ্টার নিষ্ফলতা সূচিত হইয়াছে সীতারামের পরিণতিতে।

কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে একটি বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় লাভ করি। ভারতীয় পুরাণ-সাহিত্যে শিব এবং দুর্গার প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য প্রাচ্যের নরনারীর রূপ-পরিকল্পনায় প্রেরণা জোগাইয়াছে। অনার্য-প্রভাবযুক্ত শিব ভোলানাথ, গঞ্জিকাসেবী, নিষ্ক্রিয়। এই সন্ন্যাসীকে ঘরে বাঁধিবার জন্য অন্নপূর্ণার চেষ্টার অবধি নাই। কামদেব পর্যন্ত ভস্মীভূত। জগৎ-তত্ত্বের নিষ্ক্রিয় ভোলানাথ পুরুষ-প্রকৃতি এবং চঞ্চলা অন্নপূর্ণা প্রকৃতিরূপা নারী প্রকৃতির স্বরূপটি শরৎচন্দ্রের পরিকল্পিত নায়ক-নায়িকার মধ্যে জীবন্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। পুরুষ চির উদাসীন, নির্লিপ্ত—কঠোর নয় কিন্তু গভীর ধরাছোঁয়ার বাহিরে। নারী স্নেহ-মমতা-করুণা-সেবা-প্রেম লইয়া এই বন্ধনহীন পুরুষগুলিকে চিরকাল বন্ধনগ্রস্ত করিয়াছে,

আত্মক্ষয়ের মধ্য দিয়া জয় করিয়াছে পুরুষের মন। অসহায়, একান্ত নির্ভরশীল পুরুষকে নারী তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া আশ্রয় দিয়াছে এবং নিজের দানের মর্যাদা অপেক্ষা পুরুষের প্রাপ্তির গৌরবকে নারী দেখিয়াছে শ্রদ্ধার সহিত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাই যেখানে প্রেম-প্রকৃতি প্রবৃত্তির দাবদাহে পরিবর্তিত, শরৎচন্দ্রের রচনায় সেখানে প্রেম হৃদয়ের স্নিগ্ধতায় মাধুর্যময়। শরৎ-সাহিত্যে তাই পুরুষের প্রবৃত্তি ভোগ-ব্যাকুল হইয়া উঠিলেও নারীর ত্যাগ-মহিমায় তাহা শান্তরূপ ধারণ করিয়াছে। এক হিসাবে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে পুরুষ নারীর সান্নিধ্যে আত্মসচেতনতা হারায়—তাহার সমগ্র সত্তা নারীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত; কারণ নারী প্রেম-স্বরূপা। স্নেহ-ভালবাসা লইয়া সে পুরুষের পদতলে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। কিন্তু সে রক্ষণশীলা, সমাজ ভাঙিতে পারেনা। তাই পুরুষের সম্ভ্রমহানি করিয়া নিজের দায়িত্বে পুরুষের জীবন নষ্ট করিতে চায় না। বহিরঙ্গ সমস্ত বাধা-নিষেধ ছাড়াও কেবলমাত্র প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিয়া যে দ্বন্দ্ব অহরহ নরনারীকে আকর্ষণ-বিকর্ষণের আবর্তে বিক্ষুব্ধ করিতেছে—সে কথাই শরৎচন্দ্রের স্রষ্টার স্বরূপকে স্রষ্টার পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। সাম্প্রতিক সমস্যার নজির দেখাইয়া যাঁহারা শরৎ-সাহিত্যকে আগামী কালে স্থানচ্যুত করিবার প্রয়াসী, তাঁহাদের জানা উচিত, প্রাত্যহিক জীবনে নরনারীর আপাত-মিলনের পশ্চাতে একটি চির-ব্যবধানের সুর ধ্বনিত হয়। সবণাক্ত অশ্রুসমুদ্র পাড়ি দিয়া দুইটি জীবন প্রেমডোরে মিলিতে পারে কই? "দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া" অথবা "জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর যায়না, হায় ভীরু প্রেম!"—এই তো শ্রীরাধার প্রেম-বৈচিত্র্য। এই তত্ত্বটুকু যে জীবন-তত্ত্বের মূলীভূত কত বড় পরিচয়, শরৎচন্দ্র তাহা জানিতেন। তাই তাঁহার অপরিণত লেখনীপ্রসূত গল্প "কাশীনাথ" হইতে শেষ পর্যায়ের রচনা পর্যন্ত কখনও সুস্পষ্টভাবে, কখনও বা অস্পষ্টভাবে পুরুষ-নারীর জীবন-সংঘাতে চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য ক্রিয়াশীল।

কাশীনাথ সেই উদাসীন পুরুষ, যাহার দারিদ্র্যে নৈরাশ্য নাই, ঐশ্বর্যে উচ্ছ্বাস নাই। কিন্তু কমলা কিছুতেই পারেনা এই স্বামীটির মন বুঝিতে। তাই তাহার যত অভিমান-আক্ষেপ ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হইয়া যখন স্বামীকে আঘাত করিল, তখনও ঔদাসীন্য, ন্যায়-পরায়ণতা এবং ক্ষমা কমলাকেই দুঃখ দিল দ্বিগুণভাবে। সুরেন্দ্রনাথের নির্লিপ্ত প্রকৃতি বড়দিদির মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। মাধবীলতা সুরেন্দ্রনাথের ভালমন্দ, সুখ-সুবিধার জন্য "বিশেষ" আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। "পল্লীসমাজে" রমার পক্ষে বৈধব্য এবং রমেশের পক্ষে উচ্চ-কুলহীনতা যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, সেখানে উভয়ের প্রণয় আত্ম-প্রকাশে বিচলিত। রমেশ বলিষ্ঠ পুরুষ, রমাকে গ্রহণ করিবার মত উদারতা তাহার

হয়তো ছিল। কিন্তু সে কোনও প্রকার আবেগের উচ্ছ্বাসে অথবা ভালবাসার দাবি লইয়া রমাকে বিব্রত করে নাই, পরন্তু রমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা রমেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়াছে। রমা রমেশের এই সংযমকে শ্রদ্ধা করিয়াছে, তাহার মন চায় রমেশের সেবা করিতে। কিন্তু প্রিয়জনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে তাহার নারীপ্রকৃতি বাধা দিয়াছে। তাই সমাজের উদ্যত বিধানকে যখন রমা অতিক্রম করিতে পারিল না, তখন ছোট ভাই যতীনের ভারটুকু দিয়া রমেশের বাঁধনছেঁড়া জীবনে একটি গুরুতর বন্ধন দিয়া গেল। অকৃতার্থ জীবনে রমার হয়তো এই সান্ত্বনা।

"গৃহদাহ" ঘটিল মহিমের গভীর নিস্তরঙ্গ চরিত্রের ফলে। অচলার প্রেম স্বামীর অটল চরিত্রে যেন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়াছে। পুরুষের ব্যগ্রতা লইয়া মহিম অচলাকে চঞ্চলা করিয়া তুলে নাই; সুরেশ কিন্তু নারীকে আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা রাখে। তাই অচলা সুরেশের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছে এবং তাহার নারী-প্রকৃতি অশুভ আশঙ্কা মুহূর্তেই সচেতন হইয়াছে। কিন্তু তাহার জীবনে ধ্যান-নিশ্চল স্বামীর প্রেম এবং ক্ষমায় কোনও বৈচিত্র্য নাই। নারীর প্রেম এখানে ক্ষত-বিক্ষত ও লাঞ্ছিত।

উপীন্দ্রের ভাবান্তরহীনতা কিরণময়ীর জীবনে আনিয়াছে চরম দুঃখ। কিরণময়ী সাবিত্রী নয় সত্য, কিন্তু দিবাকর চরিত্র-স্খলনের পরিণাম তাহাকে আতঙ্কিত করিয়াছে এবং চিরজীবন সে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। উপীন্দ্রের সহানুভূতি এবং ভালবাসা (উদারতা) যেখানে সাবিত্রীর প্রতি নিঃশেষে বর্ষিত হইয়াছে, কিরণময়ীর দুর্ভাগ্যে তাহার কণাটুকুও মিলে নাই। সাবিত্রী ছন্নছাড়া সতীশের জীবনে কল্যাণী মূর্তি লইয়া দেখা দিয়াছে। গৃহত্যাগিনী বিধবা সাবিত্রী সতীশকে বিবাহ না করিয়াও যে মর্যাদা পাইয়াছে, সতীশকে স্বামিত্বে বরণ করিয়া তাহা পাইত কিনা সন্দেহ। সাবিত্রীও কিন্তু সতীশকে শেষ পর্যন্ত গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

ষোড়শী-জীবানন্দের "দেনা-পাওনা" প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীর দেনা-পাওনায় পর্যবসিত হইয়াছে, যখন শিভারের ব্যথায় জীবানন্দ ষোড়শীর কাছে একটু সেবা প্রার্থনা করিয়াছে। জীবানন্দের ওই অসহায় দেহটাকে বাঁচাইয়া তুলিতেই ষোড়শীর সন্ন্যাস-সংযমের প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া ষোড়শী ছুটিয়া আসিয়াছে জীবানন্দের কাছে।

অভয়া হিন্দুঘরের পতি-প্রাণা সাধ্বী—রেঙ্গুন-যাত্রা করিয়াছে স্বামীর উদ্দেশ্যে। যাহাকে খুঁজিতে তাহার এই অভিযান, তাহার সন্ধানও সে পাইয়াছে, তবুও কেন

রোহিণীবাবুর কাছে সে ফিরিয়া আসিয়াছে—কোন্ আকর্ষণে? স্বামীর অত্যাচ
বাঙালী-বধূর কাছে কোনও কালেই অসহনীয় নয়। অভয়ার নিকটও হয়তো ক্রম
স্বামীর অত্যাচার সহনীয় হইয়া উঠিত। কিন্তু রোহিণীর একান্ত নির্ভরশীল ম
নিশু-সুলভ চরিত্রের আকর্ষণ অভয়াকে সমাজ-বিরোধী করিয়া তুলিয়াছে। অভ
রোহিণীবাবুকে লইয়া নূতন সংসার পাতিয়াছে।

অভয়া যে পথ-নির্দেশ করিয়াছে, রাজলক্ষ্মী সেই পথ দিয়াই শ্রীকান্তকে লই
ঘর বাঁধিতে পারিত। সামাজিক বোধ অপেক্ষা সহজাত নারী-প্রকৃতি লইয়া রাজল
ভবঘুরে শ্রীকান্তকে একদিকে যেমন গৃহশীল দেখিতে চাহিয়াছে, আবার গৃহজীবনে
দুর্বলতায় শ্রীকান্তের পৌরুষ স্খলিত হইতে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী সঙ্কুচিত হইয়াছে
রাজলক্ষ্মীর প্রেম আত্মভোলা শ্রীকান্তর চতুর্দিক পরিবৃত করিয়া রাজলক্ষ্মীকে
অন্তর্দ্বন্দ্বে দগ্ধ করিয়াছে। শ্রীকান্তর নির্বিকার চরিত্র কমললতাকেও আকৃষ্ট করিয়াছে।

'শেষ প্রশ্নে' কমলের তীব্র তীক্ষ্ণতার কাছে ক্রমশঃ শিবনাথ, অবিনাশ, অক্ষ
হরেন পরাভূত। আশুবাবু, রাজেন এবং অজিত—এই তিনটি পুরুষকে কমল তাহা
যুক্তিজালের একটি পাশে সরাইয়া রাখিয়াছে। আশুবাবুর প্রতি কমলের অকুণ্ঠ শ্র
আছে, অজিতের অসহায় জীবনে কমল দায়িত্ব লইয়া অগ্রসর হইয়াছে; কি
রাজেনের বিকারহীন, বন্ধনহীন, অভিযোগহীন পৌরুষকে কমল যেন বুঝিয়া উঠিতে পা
নাই। কমলের সমস্ত অঙ্গে রাজেনের অবজ্ঞা সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে
আশুবাবুর নির্লিপ্ত, উদার জীবনে নীলিমার গোপন-সঞ্চিত প্রেম একদিন আত্মপ্রক
করিয়াছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বঙ্কিম-সাহিত্যে নারী-চরিত্র স্থির (শৈবলিনী
রোহিণী বাদে), পুরুষ নারী-প্রকৃতির নিকট আপন শক্তির পরীক্ষা দিয়াছে এ
তাহার দ্বারা তাহাদের জয় অথবা পতন নির্ধারিত হইয়াছে। শরৎ-সাহিত্যে পুর
নিশ্চল, নারী-প্রকৃতি সেখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে বিপর্যস্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যা
"সীতারাম"-এ স্বামী-স্ত্রীর সামাজিক বন্ধন-স্বীকৃতির মধ্যেও যে ট্র্যাজিডি রচিত হইয়া
শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা "কাশীনাথ"-এও দেখি স্বামী-স্ত্রীর সামাজিক স্বীকৃতি হইলে
উভয়ের মিলনে কোথায় যেন বিরোধের বীজ নিহিত রহিয়াছে। সীতারাম চঞ্চ
বিক্ষুব্ধ, শ্রী স্থির, নিষ্কম্প। কিন্তু কাশীনাথ স্থির, অচঞ্চল, কমলা অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত
শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের নরনারীর প্রেমপ্রকৃতি বিশ্লেষণে দুই স্রষ্টার বিপরী

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই। আবার বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনায় যেখানে যাত্রা শেষ করিয়াছেন, শরৎচন্দ্রের যাত্রা শুরু সেখান হইতেই। প্রেম-প্রকৃতি বিশ্লেষণের যন্ত্র-স্বরূপ নরনারীর প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন স্রষ্টার নিকট বিচিত্র রূপ লইয়া উপস্থিত হয়। বৈচিত্র্যই জীবনীশক্তি, সৃজনী ক্ষমতার প্রেরণা।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (কটক)

শ্রীসুনীলময় ঘোষ

[তৃতীয় বর্ষ—কলা, সাম্মানিক বাঙলার ছাত্র। সম্প্রতি নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ২৮তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো কটকে। আশুতোষ কলেজের পাঁচজন ছাত্র ও শিক্ষক নিয়ে গঠিত প্রতিনিধিবৃন্দ গিয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে। এই সম্মেলনের মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন—আমাদের কলেজের পরিচালক সমিতির সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। আমাদের কলেজ থেকে যে পাঁচজন প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাঁরা হলেন—ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, অধ্যাপক বিভাস রায় চৌধুরী, অধ্যাপক অমিয়-রতন মুখোপাধ্যায়, শ্রীসৌরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য (তৃতীয় বর্ষ—কলা সাম্মানিক বাঙলার ছাত্র) ও প্রবন্ধকার শ্রীসুনীলময় ঘোষ। একটি অনাবিল আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়া গেল সুনীল বাবুর এই বিবরণীমূলক প্রবন্ধে। স্বীকার করা ভালো, বিবরণীটি আগাগোড়া খবর কাগজের খবরদারি নয়, লেখকের ব্যক্তিহৃদয়ের স্পর্শ কোথাও যদি থেকে থাকে তবেই তো তার সার্থকতা। —সম্পাদক]

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় এবং যাদবপুরস্থ ছাত্রবন্ধুদের উৎসাহে আমার কটক সাহিত্যসম্মেলনে যাওয়া স্থির হইল। মনে মনে সব ঠিক হইল বটে, কিন্তু যতই দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল ততই যেন আমার মন নিরাশ হইয়া এদিক-ওদিক ছুটিতেছিল। জামা নাই, কাপড় নাই, শীতবস্ত্র—তাও একটি মাত্র চাদর—তার উপর তখনও টাকা জোগাড় করিয়া উঠিতে পারি নাই। ছাত্রবন্ধুরা এই অবস্থা কি করিয়া যেন জানিতে পারিল, তাড়াতাড়ি কোথা হইতে কি করিল বুঝিয়া উঠিতে পারিলামনা—একে একে সব জোগাড় হইল। মন আমার শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। তাহাদের শুভেচ্ছা লইয়া আমি হাওড়া রওনা হইলাম।

আমার একমাত্র না হইলেও অন্যতম সঙ্গী জুটিল সহপাঠী সৌরেন। উভয়ে কত অনাগত আনন্দের কথা স্মরণ করিতেছিলাম যে মাঝে মাঝে আমাদের আত্মগর্বটাও প্রকাশ পাইতেছিল। যাহা হউক, 'জনতা'য় আমরা উঠিয়া বসিলাম। একি : একেবারেই ফাঁকা! বড়ই আনন্দ হইল আমরা DELEGATES এবং গাড়িটির দরজায় একটি কার্ড লাগানো ছিল 'For DELEGATES ONLY.' এই কয়টি কথা পড়িয়া মর্যাদাবোধ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। চুপচাপ, নানাকথা,—এর মধ্যে কখন রাত্রি কাটিয়া গেল।

কটক। গাড়ি দাঁড়াইতেই 'কোথায়-কোথায়' ভাব। একটু পরেই দেখি, একদল ভদ্রলোক আমাদের কামরার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমাদের তখন কি আনন্দ!

আগন্তুকরা আমাদের সঙ্গে লইয়া গেলেন—কোথায় না 'Delegates-Camp'-এ। তাঁহাদের কথা, তাঁহাদের চাহনি যেন অপ্রত্যাশিত। আমার নিজেরই একটু কেমন-কেমন বোধ হইতেছিল। সাধারণ একটি ছাত্র, এর জন্য এত বিনয়, এত কৌলীন্য কেন? পরে মনে হইল—আমি 'Delegate' সুতরাং গম্ভীর হইলাম। আরও গম্ভীর হইলাম তখন যখন একটি 'পরিচয়-পত্র' লাভ করিলাম। 'প্রতিনিধি' এই ব্যাজটি যাহাতে সকলে দেখিতে পায় তাহার প্রতি এই কয়দিন বিশেষ নজর ছিল। আর তাঁহারাও এই চিহ্নটি দেখিলে বিনয়াবনত হইয়া বলিতেন, 'নমস্কার, চা খেয়েছেন; কোনো অসুবিধা হয়নিতো?' কোনো উত্তর দিতে পারিতাম না; কেবল হাসিতাম।

তারপর দেখা হইল বিজনবাবুর সঙ্গে। আমাদের দেখিয়া তিনি কি খুশি! আমরাও যেন স্বর্গ পাইলাম। স্নান করিয়া বিজনবাবুর সঙ্গে সম্মেলনে যাই। স্থানীয় র‍্যাভেন্‌শ কলেজ-প্রাঙ্গণে সম্মেলনের অনুষ্ঠান। তোরণ সজ্জাই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। উড়িষ্যার সুকুমারশিল্প-প্রতিভা যেন বর্ণে বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পৈশ্বর্যে উজ্জ্বল সেই মঞ্চ-পরিকল্পনা। সম্মুখে যে সুদৃশ্য আলপনা তাহা সমস্ত আবেষ্টনীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর অভ্যর্থনা সমিতির যুগ্ম-সভাপতি শ্রীললিতকুমার দাশগুপ্তের অনুরোধে ভারতের শ্রমমন্ত্রী শ্রী ভি. ভি. গিরি সম্মেলনের উদ্বোধন করিলেন। তারপর একদল বালিকা গান গাহিতে গাহিতে মাঙ্গলিক অর্ঘ্য হস্তে সংস্কৃতি-প্রদর্শনীর দিকে অগ্রসর হইল। আমরাও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সেই দিকে যাত্রা করিলাম। প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে একটি মৃৎ-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হইল। তখনও পর্যন্ত উড়িষ্যা ও বাঙলার নিকট সম্পর্ক সম্বন্ধে ততটা সজাগ ছিলাম না। উভয় প্রদেশের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের একটি ঐক্য যেন ধরা পড়িয়াছে এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে। আদিবাসীদের বিচিত্র জীবন ও সংস্কৃতি, দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্য, উড়িষ্যার শিল্প-ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের কিছু কিছু নিদর্শন পাইলাম। এই প্রদর্শনীতে এমন কতকগুলি ছোটোদের আঁকা ছবি ছিল যাহা দেখিয়া অধ্যাপক অমিয়রতনবাবু বলিলেন, "জানো সুনীল, এই ছেলেদের আঁকাই আমার বড়ো ভালো লাগছে। বাইরের দিকটা দেখোনা, আমি ওর মধ্য দিয়ে জীবন্ত শিশুকে দেখতে পাচ্ছি।" চিত্র ছাড়াও উড়িষ্যার বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি ও বাঙলা ভাষার নানারকম সাময়িক পত্রও ছিল।

বিকালের দিকে মূল সভার অধিবেশন। "প্রতিনিধি"—তাই একটু গম্ভীর হইয়া শিবির হইতে আমি ও সৌরেন দুইজনে বাহির হইলাম। মনে একটা আশঙ্কা ছিল,

জায়গা পাইব তো ! কিন্তু দেখা গেল মণ্ডপের কাছে আসিতেই ভিতরে যাইব পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইল। একজন কাছে আসিয়া একেবারে সামনের সারি বসাইয়া দিলেন এবং হাতে কয়েকটি কাগজ গুঁজিয়া দিলেন। মন বড় খুশি। অভ্যর্থ সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সুখলতা রাও তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তাঁহ অভিভাষণ আমাকে অবাক করিয়া দিল। বাঙলা ও উড়িষ্যার মধ্যে এত মিল! তি বলিলেন—"বাঙলা দেশের সঙ্গে উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক সংযোগ অনেক কালের।...ক পুরাতন কীর্তিমণ্ডিত, ঐতিহাসিক স্মৃতিজড়িত এই উৎকল। এখানে পর্বতে অরণ্যে, মন্দিরে-মন্দিরে প্রাচীন ভারত আপন মহিমায় যেন ধ্যানস্থ হয়ে আছে। এইখা বসে বাঙলার চৈতন্যদেব তাঁর প্রেমধর্ম প্রচার করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জননী পুণ্য সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষায় বাঙলাদেশ হতে এসে জগন্নাথের মন্দিরে তাঁর শে দিনগুলি কাটিয়েছিলেন...।"

একমাত্র ভাষার প্রভেদই উড়িষ্যা ও বাঙলাকে পৃথক করিয়াছে। শ্রীযুক্তা রা উৎকলসাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বাঙলা প্রবাদের স উড়িয়া প্রবাদের কতখানি মিল আছে তাহাও উদাহরণ সহ উল্লেখ করিলেন। সত্যই আশ্চর্যবোধ হইল, এত কাছের হইয়াও কতদূরে ছিল এই উড়িষ্যা। তারপর মূল সভাপ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ। তাঁহার ভাষণে সাহিত্যের বিশেষতঃ বাঙল সামগ্রিক রূপ ধরা পড়িয়াছে। সমাগত প্রতিনিধি ছাড়াও স্থানীয় অধিবাসীদের মনে ভ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ বিশেষ রেখাপাত করে। তিনি তাঁহার ভাষণে উড়িষ্যা ও বাঙল সম্পর্ক উল্লেখ করিতে যাইয়া বলেন—"এই কটক নগরী বাঙলার তথা সারা ভারতে 'শ্রেষ্ঠ বীর সন্তান' সুভাষচন্দ্রের জন্মস্থান।" সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতে যাই বলেন—"কেবলমাত্র মাতৃভাষার উন্নতিসাধন ও সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রীতি স্থাপনই সাহিত্যসম্মেলনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এই সাহিত্যসভা কেবলমাত্র বঙ্গ সাহি সেবীদের সভা নহে। নিজেরা লেখক না হইয়াও যাঁহারা সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতি সমস্যা সমাধানের জন্য, জনগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ভাবকে রূপায়িত দেখিতে চ তাঁহারাও এখানে আজ উপস্থিত আছেন।..." তিনি বাঙলার উদার মতের কথা উ করিয়া বলেন—"সংকীর্ণ মনোভাব বাঙলার কোনোদিন ছিলনা, পরকে সে আপন করিয়া দূরকে নিকট করিয়াছে এবং বাহিরকে ঘর করিয়াছে। তাহার সাহিত্যে বৃহ ভারতের রূপ সে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।" বাঙালী আজ দুঃখের আঘাতে বিভ্রান্ত হ পড়িয়াছে। তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—"দুঃখের ভীষণ আঘাতে সকল মানু

প্রথম বিভ্রান্ত ও বিচলিত হইয়া পড়ে। বাঙালীরও আজ সেই দশা ঘটিয়াছে। কিন্তু সেই জন্য হতাশ হইলে চলিবে না। বাঙালী কোনোদিন তাহা হয় নাই। যে-বাঙালী একদিন মাৎস্যন্যায় দূর করিয়া মনের মত রাজা নির্বাচন করিয়াছিল সেই বাঙালীর বংশধরেরা যে আজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবন ক্ষয় করিবে, এ কথা আমি বিশ্বাস করিনা। দুঃখই শক্তির উৎস। দুঃখই মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। সুতরাং দুঃখ হইতে, বেদনা হইতে আজ যদি আমরা শক্তি সঞ্চয় না করিতে পারি, শিক্ষালাভ না করিতে পারি, তবে তাহার অপেক্ষা বড় ক্ষোভের কথা আর কিছু থাকিবে না।" রাষ্ট্রভাষা কি হওয়া উচিত এবং এই ক্ষেত্রে 'হিন্দী'কেই সমর্থন করার পক্ষে যুক্তি সহ একটি মনোজ্ঞ বিষয়ও সভাপতির অভিভাষণে ছিল।

ইহার পর সম্মেলনের কার্যবিবরণী পাঠ হইল। বিকালে 'উদ্যান-সম্মেলন'। এইটাই আমাদের বিশেষ কৌতুকের বিষয় ছিল। ইহার সম্পূর্ণ ভাবটি আমরা তখনও ধরিতে পারি নাই। বন্ধু সৌরেন কি কাজে চলিয়া গেল। আমি চুপচাপ ভাবিতেছি। পরিচিত কাহাকেও পাইতেছি না যে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইব। যাহা হউক, মণ্ডপ হইতে বাহির হইলাম। সামনেই দেখি সারিবদ্ধ ভাবে স্বেচ্ছাসেবকের দল দাঁড়াইয়া প্রতিনিধিদের কলেজের ভিতরকার প্রাঙ্গণে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। আমিও চলিলাম। সিঁড়িতে উঠিতেই শোনা গেল—"দয়া করে আপনি যাবেন না।" এ আবার কি! ভয় হইল। পিছনে তাকাইতেই দেখি একজন ব্যাজবিহীন ব্যক্তি আমার সঙ্গে। স্বেচ্ছা-সেবকেরা যাহাতে আমার সেই পরিচয়টা ভাল করিয়া দেখিতে পায় তাহার জন্য একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইলাম—যেই দাঁড়ানো, অমনি একজন আমাকে সঙ্গে করিয়া উদ্যান-সম্মেলনে লইয়া গেলেন। সে এক মজার ব্যাপার। ঢুকিয়াই দেখি, সবারই হাতে একটি খাবারের প্লেট আর মুখ সেই সঙ্গে অনর্গল নাচিতেছে। অবাক হইলাম, এই কি উদ্যান-সম্মেলন?

রাত্রিতে সভামণ্ডপে ছউনৃত্য। সম্পূর্ণ নূতন। তাই কৌতূহল বেশী। আমরা রাত্রির আহার শেষে সেই নৃত্যানুষ্ঠানে যোগদান করি। নৃত্য আরম্ভ হইল। বাঙ্‌লায় এমনটি দেখা যায়না। যেমন ছন্দজ্ঞান তেমনি নৃত্যের আঙ্গিক ভঙ্গী সমস্ত মণ্ডপে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিল। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত এই "ছউনৃত্য"। সব কয়টি নৃত্যই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে পরিকল্পিত। সভামণ্ডপে শুনিয়াছি নটরাজ নৃত্যের আঙ্গিক পরিচালনা করিয়াছেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্বয়ং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন শুনিয়া বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, কিন্তু প্রথমে বিশ্বাস হইতেছিল না। পশ্চাতে তাকাইলাম, কই কোনো রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন কোনো

চিহ্নই তো নাই। পরে ভুল বুঝিলাম। সেই অনাড়ম্বর সাজপোষাক, সহজ, সরল, সুন্দর স্বভাব ইহাই তো ভারতের ঋষির প্রতীক। আরও বেশি মুগ্ধ ও আশ্চর্য হইলাম যখন দেখিলাম নৃত্যের সময় একটি বৈদ্যুতিক বাল্‌ব ভাঙ্গিয়া যায় এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজে দ্রুত আসিয়া ভগ্ন কাঁচের টুকরাগুলি কুড়াইতেছেন। এই অনাবিল সরলতা ও কর্মপ্রাণতায় মন ও প্রাণ শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল।

পরের দিন, পঁচিশে ডিসেম্বর—একটি বিশেষ দিন। বিজনবাবুর কাছে শুনিলাম যে আজ বিভাসবাবু ও অমিয়রতনবাবু আসিবেন। কি মজা! তাই কেবল মন বাহিরের দিকে তাঁহাদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ভোরের খাবার আসিল—বিস্বাদ লাগিল ভালো লাগিল না; স্নানের সময় হইল—একটু দেরী করিতেছি যদি-বা দেখা হইয়া যায় এমন সময় দেখি—ওই তো? স্মিত হাস্যে অগ্রসর হইলাম। মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। বিভাসবাবুর সে কি আনন্দ! চোখেমুখে যেন মুহূর্তের জন্য সব রাত-জাগা অবসাদ দূর হইল। আমি ও সৌরেন ছুটিয়া গেলাম। অমিয়রতনবাবুরও সেই চাপা হাসি, যেন তিনি সব জানিতেন—এমনি একটা ভাব। যাহা হউক সব ঠিক করা হইল। নিজেদের ঠিক করিয়া লইলাম—"আশুতোষ কলেজের ছাত্রশিক্ষক-প্রতিনিধিবৃন্দ!" সবাই আমাদের জানিত, এরা আশুতোষ কলেজের। আমি ও সৌরেন বেশ একটু গর্ব অনুভব করিতাম। যাঁহাদের দূর হইতেই দেখি তাঁহারা আজ কত কাছে। আমার সমস্ত ভাবনা চিন্তা সেই দূরে দেখার আধো-আধো পরিচয়ের বেড়া চুরমার করিয়া কাছের মানুষটাকে উপলব্ধি করিল। সেদিন যদি কিছু পাইয়া থাকি তাহা হইতেছে তাঁহাদের স্নেহ যাহা সত্যই দুর্লভ। কলেজের পঠন-পাঠনের যোগে যাঁহাদের পরিচয় সে কত কৃত্রিম তাহা সেইদিন বুঝিলাম। সেই বিজনবাবু, বিভাসবাবু, অমিয়রতনবাবু যেন এক একটি উপলব্ধির মহাভারত। বিপুল উৎসাহে নানা আলোচনা করিতে করিতে সম্মেলনে উপস্থিত হইলাম। "বাঙলা দেশের হৃদয় হতে" গানটি গীত হইবার পর শ্রীযুক্ত আর্তবন্ধু মহান্তি মহাশয় সাহিত্য শাখার উদ্বোধন করিলেন। তিনি উড়িয়া ভাষায় বক্তৃতা কালে বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত উড়িষ্যার সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিগূঢ় আত্মীয়তার কথা উল্লেখ করিলেন। উড়িষ্যার ভাবনা-চিন্তা, চরিত্রগত ঐতিহ্য প্রতিবেশী বাঙলার সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করিয়া চলিতেছে। এই সম্মেলন এই সমন্বয়ের ভিত্তিভূমিকে দৃঢ় করিল।

ইহার পর শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর তাঁহার স্বরচিত একটি স্বদেশী কবিতা পাঠ করিলেন। সাহিত্য শাখার সভাপতি বনফুল (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) তাঁহার

অভিভাষণে ইতিহাসের পটভূমিকায় সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্যদিয়া বাঙলার চরিত্র ও সংস্কৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলেন। বর্তমান বাঙালীর জীবনে যে দুর্দিন ও বিপর্যয় ঘনাইয়া আসিয়াছে তাঁহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"যে আবর্জনা ও জঞ্জাল আজ আমাদের জীবনে স্তূপীকৃত হইতেছে, তাহাই একদিন সারে পরিণত হইয়া নবীন সৃষ্টিকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করিবে।..."

বিকালে ভারতীয় সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহতাব ইংরেজী ভাষায় তাঁহার অভিভাষণে বলিলেন—"Language, as you know, is the greatest cementing factor which binds human beings together for all serious purposes. It transcends all differences, such as religious, political, etc. and it brings out some deep-laid oneness inspite of other differences....." সাহিত্যিকগণকে সর্বশেষে তিনি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ঐক্যমত গঠন করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইলেন।

তারপর বিজ্ঞান শাখার অধিবেশন—উদ্বোধন করিলেন ডক্টর প্রাণকৃষ্ণ পরিজা। তিনি তাঁহার ভাষণে মানব ও সমাজ কল্যাণে বিজ্ঞানের সাধনার কথা উল্লেখ করিলেন। অবশেষে তিনি 'বিজ্ঞান শিক্ষায় ভাষা' সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য বিজ্ঞান শাখার সভাপতি বিজ্ঞানঋষি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। বৈজ্ঞানিক বসুমহাশয় কোনো লিখিত ভাষণ পাঠ করেন নাই। সহজ ও সরল ভাষায় ধীরে ধীরে ঠাকুরমার গল্পের মত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করিলেন। তিনি বলিলেন—".....ভারতীয় ভাষার মধ্যে বিজ্ঞান আলোচনা করা উচিত; মাতৃভাষায় যদি বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যায় তবেই বিজ্ঞান সর্ববিদিত ও সুচারু হইবে। পরিভাষা যতদূর সম্ভব ভারতীয় ভাষাতেই গ্রহণ করা উচিত।" ছোটো ছোটো বাক্যে তিনি এমন সুন্দর ভাবে বলিয়া যাইতেছিলেন যে, মণ্ডপের এক কোণে (যেদিকটা শ্রোতার ভীড়) যেখানে রৌদ্র সোজা মণ্ডপে পড়িতেছিল তাহার অসহ্যতা সকলে ভুলিয়া গেল।

এই সময়ে অভ্যর্থনাসমিতির যুগ্ম-সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় জানাইলেন যে, এখন সম্মেলনের কাজ দ্বিধা-বিভক্ত হইবে। একদিকে (মণ্ডপে) ইতিহাস শাখা ও অপরদিকে র‍্যাভেনশ-কলেজ ল্যাবরেটরীতে বিজ্ঞান বিভাগের demonstration চলিবে। খবর শুনিবামাত্র চেয়ার হইতে উঠিয়া সমস্ত মণ্ডপ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেছি কোথায় সৌরেন, কোথায় বা বিভাসবাবু, বিজনবাবু ও অমিয়রতনবাবু। মনটা চঞ্চল হইল।

এদিকে বিজনবাবুও বোধহয় আমার জন্য ব্যস্ত আছেন। যদি demonstration আমার কিছুটা দরকার হয় তাই তাড়াতাড়ি সেই জনতায় ভীড় বাড়াইলাম। ভিত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া কাতারে কাতারে লোক ছুটিতেছে। এদিককার মণ্ডপ একেব শূন্য ; মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে "সব যাবেন না, সকলে যাবেন না।" বেশ ভ পাইল। আমিও দ্রুত ছুটিলাম। সে কী ভীড়—যতবার নিজেকে প্রতিনিধি প্র করিতে গিয়াছি, ততবারই দরজা হইতে দশহাত দূরে ছিট্‌কাইয়া আসিতে হইয়াছ অনেক কষ্টে প্রবেশ করিলাম।

বিরাট ল্যাবরেটরী। বেশ বড়রকমের একটা হলঘর। আমাদের কলেজ হলের চেয়েও বড়। ঘর ভর্তি লোক। পিছনের সারিতে সব দাঁড়াইয়া কৌ দেখিতেছে। আর এদিকে বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক বসু, উড়িষ্যার ডাক ও তার বিভাগ ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত কে-পি-সেন বসিয়া আছেন। অধ্যাপক বসু মহাশয় বিজনবাবুকে দে ভাষায় তারবার্তা প্রেরণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বিজন ধীরভাবে প্রথমেই সহজ ভাষায় তাঁহার নবাবিষ্কৃত পদ্ধতির উপযোগিতা ব্যাখ্যা করিলে ইতিমধ্যেই সমাগত অতিথি ও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে তখন সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "আমরা এই ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে ই করি"। উপস্থিত কৌতূহলী দর্শকদের মধ্যে একজন উড়িয়া ভাষায় তাঁহার এক বন্ধু টেলিগ্রাফ-ফরমে সংবাদ পাঠাইলেন। সংবাদটি অপর একটি ঘরে লইয়া যাওয়া হইল এবং মর্স্‌-কোড্‌ সহযোগে এই সংবাদটি এক স্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরিত হইল, পুনরা উহা যথাযথ নির্ভুলভাবে সেই জনতার মধ্যে আনীত হইল। তখন চারিদিকে কী-এ চাঞ্চল্য! হলঘর কলমুখর। উৎসুক জনকয়েক দর্শক বিজনবাবুকে তারবার্তা প্রে সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। তিনি তাঁহার উত্তর দিলেন। সভাপতি বসু মহা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ধন্যবাদ দিতে যাইয়া বলেন—"বিজনের উৎসাহ ও শক্তি সত্য প্রশংসনীয়.....কিন্তু সরকার এ-বিষয়ে কতটুকু সাহায্য করিবেন বলা যায় না যদি সরকার এই পদ্ধতিটিকে সুন্দরভাবে কাজে লাগান তবে সত্যই আমাদের তথা ভারতে উপকার হইবে। বিজন, গীতার আদর্শে তুমি কাজ করে যাও, ফলের দিকে নজ দিও না.....।"

এদিকে ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ শেষ হইল। শাখা-সভাপ শ্রীযুক্ত নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় ইতিহাসে যে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিয়াছে এ

বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী ইতিহাস চর্চায় যে একেবারেই দুর্বল সে সম্বন্ধে একটি হৃদয়স্পর্শী অভিভাষণ পাঠ করেন। সন্ধ্যায় উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ চৌধুরী ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী মালতী দেবীর আমন্ত্রণে তাঁহাদের গৃহে প্রতিনিধি ও অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ একটি চা মজলিশে সমবেত হন।

সম্মেলনের শেষ দিন—এই দিনটিতে আমরা অধ্যাপকদের সঙ্গে কটক শহর পরিভ্রমণে বাহির হই। অগাধ আনন্দ ও বিস্ময়ের মধ্যে এই দিনটি আমাদের স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। দর্শন-শাখার উদ্বোধক শ্রীযুক্ত রাধানাথ রথ মহাশয় উড়িয়া ভাষায় তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন। দর্শন শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত শিশির কুমার মৈত্র মহাশয় অভিভাষণে বলেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুত্থানের মূলে মহাত্মা রামমোহন রায়ের দান অমূল্য।

দর্শন-শাখার শেষে বৃহত্তর বঙ্গশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবেশ দাস বর্তমান যুগসংকটে বাঙালীর বিপর্যয় ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে এক তথ্যপূর্ণ ভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন—"বৃহত্তর ভারতের পটভূমিকায় বাঙালী কোথাও প্রবাসী নয়।....."

এইরূপে তিনদিন ব্যাপী নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টাবিংশতিতম অধিবেশন সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হল। বাঙ্গালী ও বাঙলার বাহির হইতে আগত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সমস্ত কটক শহর কল-কোলাহল মুখর ছিল। সাহিত্য হইতেছে মানবতার মিলনভূমি, সেই মহামিলনের অমূল্য স্মৃতি সম্পদ বহন করিয়া আবার কখন আমরা কটক ষ্টেশনে ব্যস্তসমস্ত ভাবে গৃহাভিমুখী ট্রেণে চাপিয়া বসিলাম।

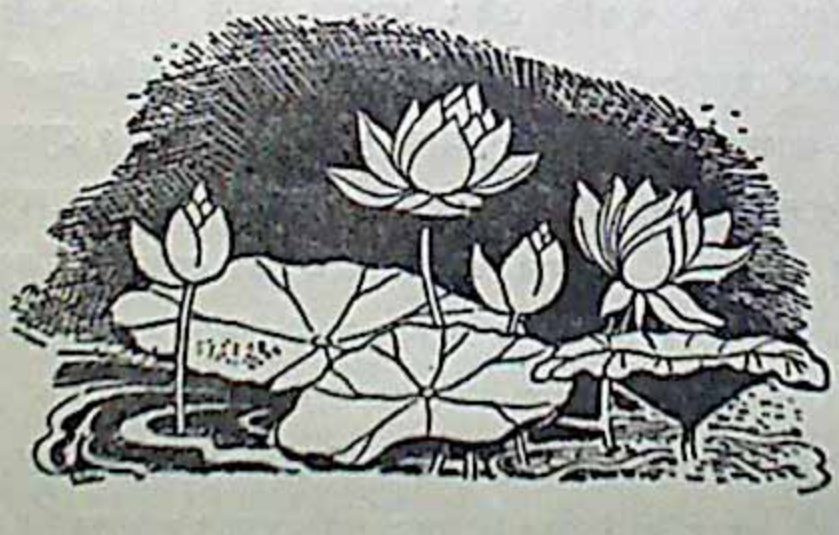

আমি ও আমার চারপাশ

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী

[কিছুদিন আগে পর্যন্ত সংশয় ছিল বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনার স্থান কোথায় হবে। আজ যে-কেউই স্বীকার করবেন নৈর্ব্যক্তিক চড়াসুরের প্রবন্ধের চেয়ে লঘুতর রম্যরচনার আদর এবং কদর দুই-ই বেড়েছে। তবে কি আমরা হাল্কা করে ভাবতে শিখেছি? কিংবা হাঁপিয়ে-পড়া জীবনে আবার হাসির ঝড় উঠলো? তবুও সেই প্রশ্নই থেকে যায়—এখন বলুন তো করি কি? শ্রদ্ধেয় অনিলবাবু আমাদের কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। ১৯৩৪ সালে যে-দুজন মিলে কলেজ-পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন অনিলবাবু তাঁদের একজন।—সম্পাদক]

আমাকে নিয়ে আমার বাবা বেশ চিন্তিত হ'য়ে পড়েছেন এবং গত বারের চা তার ভাবনাটা এবার একটু বেশীই ব'লতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন যে, আ বয়সটা অবিশ্বাস্য-রকম একটা মোটা সংখ্যায় এসে পৌঁচেছে এবং আমার স্বল্প-সঙ্গতিস পিতা আমার বিবাহের জন্যে পাত্র ও অর্থের সহজ সামঞ্জস্য ক'রে উঠ্‌তে পারছেন এইতো! বড্ড বেঁচে গেছি মশাই: বাঙ্‌লাদেশের বনেদী অভিশাপটুকু এবার অ আমায় জব্দ করতে পারলো না। আমি আমার বাবার অতি আদরের এবং ততো সমাজ-অভিশপ্তা কন্যা নই! সোনার চশমা চোখে, পার্কার পেন বুকে, অপূর্ব ঢেউ-খেলা টেরী মস্তকে এবং 'তিন কেল্লা' সিগারেট মুখে—চা-সিনেমার আড্ডাধারী রীতিমত আমি!—এইবার তাহ'লে আপনি বৈধভাবেই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন: চিন্তার কারণটা কি? উত্তরটা এই: গতবার আমি আই-এস্-সি পরীক্ষায় ক'রেছিলাম, এবার জোর্‌সে-জোর 'বাপুজী-বিভাগে' বেরিয়ে গেছি।—এইবার হাসা আপনি, এতে ভাবনার কি আছে? আচ্ছা! কি নেই বলুন? ফেল করতে বাবা গম্ভীর করে বললেন: যাও, আর একবার চেষ্টা করো। সংসারের অবস্থা তো বুঝ পারছো—একটু মন দাও। আমার একার পক্ষে এর বেশী আর কিছু করা তো স নয়।—খেলাধুলো, সিগারেট- সিনেমা ক'রে নাও সবই; তবে একটু র'য়ে-স'য়ে। ভবি টুকু খুইয়ো না। বাবা রাগে দুঃখে যা ব'ললেন তাইতে আমার মত অতি পাষণ্ডে বেদনা-বোধ হ'তে লাগলো আর সিগারেটের উল্লেখে সংস্কারগত ভাবেই লজ্জিত হ' প'ড়লাম। এমনি মুহূর্তে মা বাঁচিয়ে দিলেন: পড়া-শোনায় সকলের কি সমান মাথা হয় আর তাছাড়া সিগ্রেট খেতে ওকে আবার দেখলে কোথায়? অমন ছেলে আমি পে

ধরিনি।—বাবা আমার মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘশ্বাস চাপলেন। আমি তখনকার বিষম লজ্জা থেকে বাঁচলেও মনে মনে বেজায় একটা ভারবোধ করতে লাগলাম। 'তিন কেল্লা' মুখে একদিন ট্রাম থেকে নামবার সময় বাবার মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলাম। যাই হোক্, বাবার এবারকার ভাবনাটা হচ্ছে—পাশ-করা ছেলেকে নিয়ে কি করবেন? সত্যি! ফেল করলে আবার পড়ার পথ খোলা থাকে—পাশ করলে পর সমস্যার সমাধান হয় কি ক'রে?

পরীক্ষায় পাশ না করলে—ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, পত্রিকা-সম্পাদক, ইস্তক ছেলেবুড়ো সকলেরই ধিক্কার কুড়োতে হয়। ইচ্ছা করে, লজ্জায় একেবারে মরে যেতে আর নয়তো বেশ ক'রে বেহায়াপনা করতে। বেশ করেছি—ফেল করেছি। আবার করবো।—অথচ বুঝতে পারছি না, পাশ ফেলের মধ্যে তফাৎ কোথায়—অর্থাৎ পথ কই? একটা করে পরীক্ষার দেয়াল টপ্‌কে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দশটা ক'রে সমস্যা মাথা তোলে: এইবার কি করা যায়? টাকা কোথায়? ভবিষ্যৎ কি হবে? ও-লাইনে বড্ড কম্পিটিশন, ও-কি ও-সব পারবে? মিনিটার বিয়ে এ-বার না দিলেই নয়—উঃ! কি সমস্যা-কণ্টকিত জীবন বলুন তো? এরই মধ্যে থেকে যিনি কোনও রকমে একটা গোলামি জোগাড় ক'রে মাসিক শ'খানেক টাকার একটা সংস্থান করতে পেরেছেন তাঁর আর কোনও দিকে দৃক্‌পাত করবার অবকাশ নেই। তিনি সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সম-গোত্রীয়। তাঁর দৈনন্দিন কার্যক্রম দেখলেই বোঝা যাবে কথাটা: সকাল সাতটায় প্রথম চোখ চাইলেন এবং তাগিদের পর তাগিদ দিয়ে এক পেয়ালা চা ও তিনটি সিগ্রেট মুখ না ধুয়েই শেষ করলেন। অতঃপর অতিমন্থরে প্রাতঃকৃত্য সমাধা হ'ল। শুষ্ক-শ্মশ্রু-চর্চা এবং কোনও রকমে নানা কারণে-অকারণে ঝগড়া-চিৎকার-চেঁচামেচি রাগ ও ক্বচিৎ হাসির মধ্যে গ্রীষ্মকালে প্রায় চৌবাচ্চা-খালি-করা ও শীতকালে দু মগ জল গায়ে ঢেলে স্নান রূপ মহাপাঠ সেরে আরম্ভ হ'ল প্রথম অঙ্ক কেশ-প্রসাধন। এইবার আহার—অর্থাৎ নিতান্ত মামুলীভাবে সেই চিরাভ্যস্ত ডাল, ভাতে-ভাত ও হরাজনিত গুটি কয়েক বিষম খেয়ে প্রায় উচ্ছিষ্ট হাতে-মুখেই দ্বিতীয় অঙ্ক কেশ-বিন্যাস ও বস্ত্রাদি পরিধান। এ-ব্যাপারটি বড় সরল নয়! জুতো থেকে আরম্ভ ক'রে নানা রঙের আঁজিটানা রুমালটি পর্যন্ত সাধ্যাতিরিক্ত মূল্য প্রযত্নে সংগৃহীত। বার কয়েক চোখ বাঁকিয়ে, ভ্রূ-কুঁচকে, পাশ ও পিছন ফিরে—নানা অ্যামিতিক কসরৎ-অন্তে দেখা গেল তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে কেশে চিরুণী ও তারই পশ্চাৎ বাঁ-হাতের আঙুলের

চাপ সম্মুখ থেকে পিছনের দিকে। বলতে কি, যদি মন দিয়ে
তাহ'লে শুধু এই ব্যায়ামেই বাহুপেশী সুদৃঢ় ও পুষ্ট হ'ত। নাটক
শেষ হয়নি—যবনিকা পড়তে অনেক বাকি। রাস্তা চলতে চলতে পানে
আর্শিতে মুখ দেখা ও চুলে সযত্নে হাত-বুলিয়ে নে'য়া চলছে চোখে
গ্লাসের গাঢ়-পাঁশুটে আবরণ টানা।

এইবার ট্রাম অথবা বাসে একটু স্থান পাবার জন্যে প্রচেষ্টা
ঝঞ্ঝা লাগলো কেশ-পারিপাট্যে। কিন্তু চাকরির আকর্ষণ আর
দৃষ্টি দিতে দিল না। এইভাবে অফিসে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার পর সুরু
একটা নাটকের: এককালে অত্যন্ত অপমানকর ছিল এই অফিস-পরিবেশ
ঠিক অতটা নেই কিন্তু তবু এটা স্বীকার করতেই হবে খোসামোদ,
মনস্তুষ্টির জন্য হীনতা মেনে নে'য়া, এবং অফিস-রাজনীতি আজও পুরোনা
আছে। পাঁচটায় ছুটি হবে। চারটে থেকে সওয়া চারটের মধ্যে সরকারী
অফিসের সর্বত্র সাজ-সাজ রব অর্থাৎ রাখ-রাখ রব উঠল,—যা আছে
এর মধ্যে অবিশ্যি, চুপি-চুপি ব'সে রাখি, গতকাল ও তারও ক
আগেকার ওই 'কাল হবে' ব'লে রেখে-দেওয়া ফাইলও আছে।
সিনেমার লাইনে, পাড়ার বন্ধুর তাসের আড্ডায় এক একটি দল
ক্বচিৎ দুচার জন শুষ্ক চিন্তান্বিত মুখে ছেলে পড়াতে অথবা কোনও অ
সময়ের' (Part-time) কেরানীগিরি করতে গেলেন। বাড়ি ফিরবেন,
করতে গেলেন, রাত দশটা থেকে এগারটার মধ্যে। আর যাঁরা অর্থোপার্জনে
তাঁরা সাড়ে নটার মধ্যে। এঁদের মুখে জল অথবা গুড়ের চা ছাড়া আর কিছু
চানাচুর, মুড়ি, আইসক্রীম, পোট্যাটো-চিপ্‌স্ থেকে সুরু করে অমলেট্, কা
পোলাও ও কয়েক কাপ চা ও প্যাকেট কয়েক সিগারেট—কিছুই বাদ দেন
বাড়ি এসে ঠাণ্ডা আহার্য অল্পই উদরে গেল। দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার ক
মনে এল না। রুটি বা ভাত তরকারি সবই যেন ছাই-মাটির মত সহজ
সংসার চলে বা চলছে জানবার প্রয়োজন নেই। বাড়ির আর আর
সম্পর্কেও কোনো দায়িত্ববোধ নেই। এঁদের তবুও সব কিছু ক্ষমা আছে
মাসে কিছু অর্থ উপার্জন ক'রে আনছেন। শুধু কি তাই—অনূঢ়া কন্যার
পৌরুষহীন, অকর্মণ্যদের প্রতিই প্রলুব্ধ হচ্ছেন এবং সর্বস্ব দান ক'রে

ব্যস্ত হচ্ছেন: নগদ অর্থ চাই, ঘড়ি-বোতাম-আংটি-খাট-আলমারি—গহনা—বেনারসী উঃ-কি দীর্ঘ ফর্দ!—সমাজ এ-সম্বন্ধে মূঢ় অচেতন; সরকার উদাসীন। শিক্ষা-ব্যবস্থাও ক্ষীণ প্রতিবাদ জানায় কি জানায় না।

এখন বলুন তো। করি কি? আপনার সমাজ-ব্যবস্থা, শিক্ষা-ব্যবস্থা সবই যখন এলোমেলো, ক্ষীণ ও দুর্বল তখন আমার ফেলুদা পাশ ফাঁসের মত গলায় জড়িয়ে রাখেন কেন?

নতুন রাস্তা দিন আমাদের। সকলের চলা-পথ আজ বড় নোংরা আর সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়েছে—বিশেষ ক'রে নতুন ভারতে নবতর সূর্যের আহ্বানকে সার্থক করতে সহায়তা করুন। আর তা নৈলে এই রকম লুকোচুরি অর্থাৎ নিজের মনকে চোখ ঠারা চলতেই থাকবে। উপকার এতে কারুরই নেই এ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করতে পারি অকুণ্ঠিত ভাবে।

বর্ষ-বোধন

কক্ষ পথে ধায় পৃথ্বী।
একি শুধু তারই পুনরাবৃত্তি ?
নয়, নয়!

স্মৃতির নিগড়ে বাঁধা চিত্ত ;
একি শুধুই পিছনে চাওয়া নিত্য ?
নয়, নয়!

এযে প্রদীপ নবারুণ-বোধনা!
চাহে নব নব দিগন্ত-এষণা।
জয়, জয়!

এযে সুপ্তি ভাঙানো মহামন্ত্র।
যৌবন শোনো অতন্দ্র।
জয়, জয়!

জয়, নবীন, পুরাতন
জয় চিরন্তন
অশেষ উন্মোচন
জয়! জয়!

'প্রথমা'-র কবির প্রথম পরিচয়, তিনি আশুতোষ কলেজের প্রাক্তন ছা

বসন্ত-প্রস্তাব

তুষার চট্টোপাধ্যায়
প্রাক্তন ছাত্র

বহুবার হেঁটে গেছি
কুয়াশায় রুদ্ধশ্বাস নিরিবিলি আলপথে একা
বারবার চলে গেছি কোন দূর দূর
কাক, চিল, গোরু, মোষ
চাতক চিৎকার-ভরা ধূসর দুপুর
পার হয়ে গেছি।

হাহাকার শূন্যে ফেরা
ধু ধু মাঠ : বিস্তীর্ণ সাহারা,
নিথর আকাশ নীল রোদে পুড়ে খাক্‌—
নিঃশ্বাস চেপেছি বুকে।

সূর্য-রঙ মাখা-দিন
সবুজ—সবুজ প্রান্ত ফিরে কি পাবে না ?
ফিরে পাক ॥

সমাচার

শ্রীঅলোককুমার হালদার
প্রথম বর্ষ—সাহিত্য

এ জগতে তুমি বন্ধু পাবে না কো কভু
ভেবেছো যাহারে মিছে ছলনায় ভুলি',
বন্ধু হ'য়ে সে শত্রু তোমার, তবু
পাতালে ঠেলিছে আকাশে তোমায় তুলি'।
অমৃত-ফলের স্বাদটা কি বিষের [illegible]
হায় দুনিয়ার এইতো বিষম কাণ্ড ॥

মৃত্যু

শ্রীঅরুণ দাশ
তৃতীয় বর্ষ—বিজ্ঞান

মায়া আছে কায়া নাই
নাই কোন আশা ;
ফুল আছে মধু নাই
নাই কোন ভাষা।
স্মৃতি আছে প্রীতি আছে
নাই কোন রূপ ;
মন আছে প্রাণ নাই
সবি চুপ চুপ।
বেলা আছে খেলা নাই
শুধু মরুভূমি ;
সব ছিল, সবই গেছে,
যবে গেছ তুমি।

সন্ধ্যা

শ্রীগুণধর দাস মহাপাত্র
প্রথমবর্ষ—সাহিত্য

তপনেরে হেরি অস্ত-মগন রঙীন অস্তাচলে
বাহিরিনু আমি অবগুণ্ঠনে অসীম আকাশতলে।
সারা দেহে মোর লেপিয়া কাজল,
এলাইয়া দিই কালো কুন্তল,
নীল অঞ্চল বিছাইয়া দিই ধরার গাত্র'পরে।
সারা দিবসের শ্রান্তি হরিয়া পবিত্র স্নেহ ভরে।

জোনাকির আলো কালো-অঞ্চলে আলোকের ফুল বোনে।
হৃদয়-মদিরা উছলিয়া পড়ে মধুর ঝিল্লীস্বনে।

দরশন আশে তাই কবিদল
ধেয়ে আসে কাছে গেয়ে কলকল
আহরিতে মোর রূপ-খনি হ'তে কবিতা-রতন আনি।
আমি তমসার তন্বী কুমারী—রূপে হার নাহি মানি।

লুকাইয়া রাখি কালো ছায়াতলে গোপনীয় যত কিছু—
যত লোভাতুর আঁখিগুলি তাই ঘুরে মোর পিছু পিছু।
অধীরা বধূটি আসে আঙিনায়
অলক্তরাগ-রঞ্জিত পায়—
বহে আনি আমি বিরহের মাঝে মধু মিলনের বাণী—
ঢেকে রাখি তার মিলন-মধুর রঙীন স্বপন খানি।

কলমে-লাঙলে বীজ বপো ফসলের

শ্রীমলয়শংকর দাশগুপ্ত
প্রথম বর্ষ—বিজ্ঞান

হে কবি, তোমার কাব্য কাহার তরে,
আর কেন মিছে কাব্য রচনা করা,
কাহার জন্যে তোমার এ-আয়োজন :
উপবাস যদি কবির ভাগ্যে লেখা!

নতুন সৃষ্টি—হয়তো-বা উত্তর।
স্রষ্টা-বিলীন তাহলে কী-ফল হবে?
তরুদল দেখো ছায়াদান করে, তবু
কাঠুরে কখনো কাঠ নেওয়া থেকে থামে?
হলো কী যুক্তি ঠিক!

হে কবি, তুমি কি কাব্য রচনা করো,
কলমে-লাঙলে বীজ বপো ফসলের।
বন্ধ্যা-ভূমিতে সোনা-রোদ এসে পড়ে,

ছোটো ধান-শিষে আগুনের কণা ঝরে ;
ও-কবি তোমার কলমে ও-যাদু খেলুক।

ভাবনা কিসের ?
(তোমায় কলমে সৃজন-ক্ষমতা আছে,
তুমি বিধাতার অপরূপ সৃষ্টি-যে,
তোমার সৃষ্টি ফলবতী ঠিকই হবে।)

হে কবি তোমার কাব্যে ফসল ফলাও।

স্বাক্ষর

অজিত রায় চৌধুরী
চতুর্থ বর্ষ—সাহিত্য

'Saqi, hadess-i sarw-u Gul-u Lala mira vad.'—Hafiz
(Tr.—O Saqi! the spring has arrived, and we are talking of the cypress, the rose and the tulip.)

চুপিচুপি ফুলফোটা আর ফুলঝরা ;
কখনো-বা ভুলে যাওয়া, কখনো হঠাৎ মনে পড়া
একখানি মুখ :
গোধূলির আবছায়া তারার মতন,
মরণের বালুচরে স্মরণের কিছু আয়োজন
আর কিছু ভুলচুক।

অনেক ফুলের ভিড়ে প্রজাপতি দিশেহারা হয়,
অনেক মনের রঙে রামধনু-রঙীন সময় ;
আর বহু প্রহরের মুখর মিছিল
হৃদয়ের ছায়াপটে চিরকাল করে অভিনয় :

অনেক শ্রাবণ-ধোওয়া বিকেলের সাথীহারা চিল
অস্ত-আলোকে খোঁজে আপনার শাখা-আশ্রয়।

তাই যদি কোনো এক চাঁদ-ঝরা রাতে
দুজনেতে পাশাপাশি :
'ভালবাস ?'
'ভালবাসি।'—
অকারণ কথা বলি তোমাতে আমাতে।
তারপর অন্যমনায়
দুজনারই দেহে মনে সুনিবিড় রাত্রি ঘনায় ;
সব কথা শেষ হয়। নিশি ঘুম-ঘুম,
নীল নন্দনে ফুটে চাঁদের কুসুম।

তবু যদি কোনোদিন
লৌহ কঠিন
চরম পণের মূল্য নিয়ে কাছে আসে,
সেদিনেও একান্ত বিশ্বাসে
তুমি পাশে এলে,
পরম আশ্চর্য ভরে দুটি চোখ মেলে
শুধাই তোমার পরিচয়,
সেদিনেও রেখনা'ক কোনো সংশয়।
সে রাতের দেনা
তারার আখরে লেখা, ধূসর আকাশে হারাবেনা।
পূর্ণিমা পাশে কেন মিছে অনুনয়,
কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া-চাঁদে আছে আরো ক্ষয়।

শুধু তাই অবিরাম
চুপিচুপি ফুলফোটা আর ফুলঝরা।

দুহাতে কঠিন পণ, দুই চোখে স্বপন-পসরা
তোমার নামের পাশে আমার স্বাক্ষর রাখিলাম।

সাগরের গান

[শ্রীমান্ সুনীলময় ঘোষ, তৃতীয় বর্ষ—সাহিত্য বিভাগ,
কল্যাণীয়েষু]

অমিয়রতন মুখোপাধ্যা

সাগরে অনেক ঢেউ—
এই ওঠে, এই নেমে যায়।
যখন যেটাকে দেখি মনে হয়
সেটাই আসল,
সাগরের গান ভুলে
সাগরের প্রাণ দেখে মাতি।

সাগরে অনেক ঢেউ—
দেখি আর মনে মনে নাচি।
নাচা যদি শেষ হয়
মাথা তুলে দেখি নীলাকাশ,
আর দেখি :
প্রশান্ত আকাশ তলে
অনন্ত সাগর!

হর্ষশেষ

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পরীক্ষার পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধা বন্ধ-হারা ;
ছাত্র-ছাত্রী চিত্ত-কুঞ্জে সঞ্চারিছে আতঙ্কের ছায়া,
চক্ষে বহে ধারা।
দুইটি বৎসর শেষ, অধ্যয়ন হ'ল সমাপন,
—শিয়রে শমন ;
শুকাইছে কণ্ঠ-তালু, পিতৃনাম যাই বুঝি ভুলি,'
কাঁপে প্রাণ-মন ॥

ঊর্ধ্ব-শ্বাসে দলে দলে ছুটে চলি,—কোথা অধ্যাপক,
দাও 'সাজেস্‌শান'!
গাদা গাদা নোট বই, শর্ট কাট্, ডাইজেস্‌ট্ কিনি,
পর্বত-প্রমাণ।
কালীঘাটে পূজা দিই, হাতে বাঁধি আশীর্বাদী ফুল,
স্বপ্নাদ্য মাদুলি ;
দেব-দ্বিজ-গুরুজন, পথে ঘাটে যারে যেথা পাই,
লই পদধূলি ॥

কোথায় কানন দেবী ? কোথায় রেহানা, মধুবালা ?
কোথা বা নার্গিস্ ?
নিষ্ঠুর নিয়তি অতি ! বিচ্ছেদ-বেদনা-ক্লিষ্ট হিয়া
করে নিশপিশ।
রেডিও-য় বাজে গান,—ধনঞ্জয়, হেমন্ত কি লতা ?
দুর্ভাগ্য অপার !
আমি হেথা একা একা বন্ধ-ঘরে বই লয়ে হাতে
করি হাহাকার ॥

পি. রায় পিটিছে বল, উঠিয়াছে শতাধিক রান,
আমি মাঠে নাই ;
চলিছে জবর খেলা— পূর্ববঙ্গ-মোহনবাগান ;
—চিত্ত আইঢাই।
আমি আজি রুদ্ধকণ্ঠ ; চেঁচাইছে অপর জনতা,
চেঁচাইছে জোর ;
হারিবার অশ্রু কিংবা জিতিবার চপ কাট্‌লেট,
—কিছু নহে মোর॥

আমি হেরি বিভীষিকা, আঁখির সম্মুখে ভাসে শুধু
সরিষার ফুল ;
না হ'ল আনন্দ করা না হইব পরীক্ষায় পাস,
গেল দুই কূল !
সারা রাত্রি পড়ি বই, হিজিবিজি কত কি যে-লেখা,
বুঝে ওঠা দায় ;
মগজ তাতিয়া ওঠে, ছোটে ঘাম, চক্ষু করে জ্বালা,
প্রাণান্ত শঙ্কায়॥

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে প্রবীণ—নিষ্ঠুর প্রবীণ,
ওহে পরীক্ষক !
নিতান্ত নির্ভুল তুমি, বেঁধে না তোমার পায়ে শত
প্রমাদ কণ্টক।
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি—আমার খাতার পরে তব
লাল পেনসিল্
দাগিবে সহস্র রেখা, প্রশ্নে প্রশ্নে রসগোল্লা দিয়া
বাধাবে মুশকিল॥

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ ! কর তুমি আজি
মুশকিল আসান ;

টেনে টুনে পার কর ; আকাঙ্ক্ষা সামান্য অতি মোর,
—থার্ড ডিভিসান।
বিধাতৃ-সোদর তুমি, আমাদের ভাগ্য-বিধায়ক,
হর্তা-কর্তা প্রভু ;
করযোড়ে চেয়ে আছি, পড়াশোনা কিছুই করিনি ;
—কৃপা কর তবু ॥

হে দাদারা, সর্বহারা ছাত্রদল আশ্রয়ভিখারী,
হও আগুয়ান ;
মনুমেণ্ট-তলে কর সুমহান জন-সমাবেশে
'ডেমন্‌স্ট্রেশান'।
কিংবা চল, এসেম্বলীর চতুর্দ্বার করি অবরোধ
তোলহ আওয়াজ ;
গণ-গর্জনের সাথে অকস্মাৎ পড়ুক খসিয়া
কালান্তর বাজ ॥

চাব না সম্মুখে মোরা, করিব না পরীক্ষার ভয়,
পড়িব না বই,
শুনিব না কারো কথা, সুকঠোর এ প্রতিজ্ঞা—তবু
পাস করিবই।
"ছাত্র দাবী মানতে হবে" ; শুনে রাখ যে যেখানে আছ
শিক্ষক গার্জেন,—
কাগজে ছাপাতে হবে, পরীক্ষার তিন মাস আগে
সমস্ত কোশ্চেন ॥

তবু যদি করি ফেল, ত্রিশ মার্ক দিতে হবে গ্রেস,
প্রতিটি পেপারে।
বিচিত্র এ-পরিস্থিতি,—কর্ম নাই, আছে কর্মফল,—
দেখাব সংসারে।
প্রতিবাদ কর যদি, বিশ্ববিদ্যালয় সৌধরূপ
এ গন্ধমাদন
একটানে উপাড়িয়া গোলদীঘি বারিরাশি মাঝে
দিব বিসর্জন ॥

মা

শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[তৃতীয়বর্ষ সাহিত্য ; সাম্মানিক বাংলার ছাত্র। লেখক স্নেহপ্রবণ মাতৃহৃদয়ের একটি আলেখ্য অঙ্কিত করেছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি টুকরো কাহিনী ; পথের ভিখারী সুধন্যদাসকে জড়িয়ে যশোদার মাতৃহৃদয়ের স্পন্দন, মোক্ষদার নিরুত্তর প্রার্থনা— সব মিলিয়ে এটি একটি ছোটো গল্প।—সম্পাদক]

'সুধন্য দাসকে চেন ? বরিশাল জেলায় বাড়ি ?' বিকলাঙ্গ ভিখারীকে প্রশ্ন করে যশোদা।

'না।' ভিখারীটা ঘাড় নাড়ে। সুধন্য দাসকে চেনেনা।

মনটা কেমন করে ওঠে যশোদার। একটা চাপা বেদনাবোধ তার মনকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। অসংযত পদক্ষেপে ঘরে চলে আসে যশোদা। কিন্তু ঘরে মন বসেনা। বার বার সদর দরজায় দাঁড়াতে ইচ্ছা করে। এই সদর দরজায় দাঁড়ানো নিয়ে আজও তার স্বামীর সঙ্গে সকালবেলা বাক্‌যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রভাত স্পষ্ট করে জানিয়েছে এমনভাবে দিনরাত সদর দরজা ধরে দাঁড়ানো চলবেনা। প্রতিবেশীরাই বা কি মনে করে। আর যাই হোক সে প্রভাতের স্ত্রী এ কথা যেন তার সব সময় মনে থাকে। রাগ করেছিল প্রভাত আজ সকালে। দুধের বাটিটা আলগা করে রেখে যশোদা সদর দরজায় ছুটে গিয়েছিল একটি ভিখারীর কণ্ঠ শুনে। দাড়ি কামাচ্ছিল তখন প্রভাত। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ধারালো

ব্লেডটাকে সে বার বার গালের উপর দিয়ে বুলোচ্ছিল। 'মাগো! সবটুকু দুধ আজও বেড়ালে খেয়ে গেল, তোমার কি চোখ নেই গো?' প্রভাতের দিকে অনুযোগের দৃষ্টিতে তাকায় যশোদা। প্রভাত কিছুই বলল না। স্নান সেরে পাঞ্জাবী পরে সোজা সে আপিসের দিকে পা বাড়াল। পথরোধ করে দাঁড়াল যশোদা। 'ভাত খেয়ে যাও'—অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে সে। কিন্তু ভাত খায়নি প্রভাত। যশোদার হাত দুটো সজোরে ছাড়িয়ে সে সদর দরজা পার হল। যশোদা অবশ্য বুঝেছিল প্রভাতের রাগের কারণটা। বার বার প্রভাত তাকে সদর দরজায় দাঁড়াতে নিষেধ করেছে।

ঘরের বধূর পক্ষে সদর দরজায় দাঁড়ানো যে মস্তবড় অপরাধ একথা প্রভাত নানাভাবে তাকে বলেছে। প্রভাতের নিষেধ অমান্য করে ভিখারীর কণ্ঠ শুনে সদর দরজায় ছুটে গিয়েছিল বলেই তো বিড়ালে দুধটুকু দিব্যি খেয়ে গেল। সুতরাং প্রভাত রাগ করবেই।

খোকার ছবির দিকে চোখ পড়ল যশোদার। দশ বছরের খোকন হাসছে। আশ্চর্য জীবন্ত ছবিটা। মনে হয় সত্যিই খোকন হাসছে, যেমন করে সে হাসতো দুবছর আগে।

প্রভাত কি যশোদার মনের কথা জানেনা? জানে, খুব ভাল করেই জানে এবং জানে বলেই যশোদার সদর দরজায় দাঁড়ানো সে বরদাস্ত করতে পারেনা।

সে বলে, 'খোকন মারা গেছে, জানি তুমি দুঃখ পেয়েছ, কিন্তু কি করবে বল? আবার খোকন আসবে, আবার তাকে তুমি আদর করবে। রাস্তার ভিখিরীর ছেলেকে নিয়ে কি আদর করা সাজে?'

'এসেছ নেংটা যাইবে নেংটা মাঝখানে কেন গণ্ডগোল'—গানটা মনে পড়ল যশোদার। আর মনে পড়ল কানা ছেলেটির কথা।

এক বছর আগে ঐ সদর দরজায় দাঁড়িয়ে গভীর দরদ দিয়ে গানটা গেয়েছিল কানা ছেলেটি। একটি বছর কোথা দিয়ে চলে গেল, টেরই পেলনা যশোদা। প্রত্যহ সদর দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে,—প্রতীক্ষায় আর প্রত্যাশায়। কবে সেই কানা ছেলেটি আসবে, কবে আবার সেই কচিগলায় শুনতে পাবে যশোদা,—'এসেছ নেংটা যাইবে নেংটা মাঝখানে কেন গণ্ডগোল'। আশ্চর্য মিষ্টি গলা ছেলেটির। আর তার চাইতেও আশ্চর্য তার গান। এ গান কোথায় পেল বরিশাল জেলার সুধন্য দাস? এ গান বোধহয় যশোদার জন্যই লেখা হয়েছিল।

কানা ছেলেটি। নাম তার সুধন্য দাস। সুন্দর গান গাইতে পারত সে। আর তার চাইতেও বড় কথা, তার চাইতেও বিস্ময়কর—ঐ কানা ছেলেটির মুখের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল যশোদার ছেলের মুখের, মৃত খোকনের। আজ খোকন নেই, কিন্তু তার অস্তিত্ব ঘরময়

ছড়িয়ে আছে। ঐ তো খোকনের ছবি। খোকন হাসছে, খোকনেরও একটি চোখ কা
আজন্ম নয়। ডাংগুলি খেলতে গিয়ে গোল কাঠটি ছিটকে এসে লাগে তার চো
কত বিনিদ্ররাত কেটেছে যশোদার। কত সেবা, কত পরিশ্রম! কিন্তু বাঁ চোখটা
হয়ে গেল। সেই থেকে খোকন কানা। একটা চোখ নষ্ট হলেও আর একটা চোখে
তীব্র চাউনি! খোকন মারা গেছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব ছড়িয়ে আছে সারা ঘরে। খোক
অস্তিত্ব আছে ঐ টেবিল-ক্লথের উপর সাজান বইগুলোতে, তক্তপোষের নী
ক্রিকেট ব্যাট আর বলে।

যশোদার ছেলের ভালো নাম ছিল সুবিমল আর ঐ কানা ছেলেটির নাম সুধ
নামের দিক থেকেও গোড়াতেই মিল আছে বৈকি। ছেলেটি প্রায়ই আসত এ পাড়া
গান গেয়ে ভিক্ষা নিয়ে চলে যেত তার আস্তানায়। ছেলেটিকে প্রথমে নজরে পড়ে
যশোদার। রোজ তো হাজার ভিখারী আসে, সকলকে কি মনে রাখা চলে? একদি
দুপুরবেলা যখন সে রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল সেই সময় হঠাৎ শুনতে পেল তার গান,
'এসেছ নেংটা যাইবে নেংটা মাঝখানে কেন গণ্ডগোল'। কি মিষ্টি গলা ছেলেটি
খুন্তি হাতে করেই যশোদা সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দেখবা-মাত্র
চমকে উঠেছিল সে। অমাবস্যার রাত্রিতে সে যেন চাঁদ দেখতে পেয়েছে
ঠিক সুবিমলের মত দেখতে না? বুকের ভিতরটা তার মোচড় দিয়ে উঠেছিল
দ্রুতপদে সে চলে গেল ঘরে। একদৃষ্টে সুবিমলের ছবির দিকে তাকাল কে
না, ভুল হয়নি যশোদার। ছেলেটির মুখখানা ঠিক সুবিমলের মুখের মত। বুক কাঁপছি
যশোদার। কাছে ডাকল ছেলেটিকে। ভয়ে ভয়ে যশোদার কাছে এগিয়ে গিয়েছি
কানা ছেলেটি।

'কি নাম তোমার?' যশোদার গলা কাঁপছিল।

'সুধন্ত দাস, বরিশাল জেলায় বাড়ি,' ছেলেটি মিষ্টিসুরে জবাব দেয়।

তারপর যশোদা তাকে নিয়ে গেল তার ঘরের ভেতর। উসখুস করছিল ছেলেটি
এমনতরো ব্যবহার সে প্রত্যাশা করেনি। লজ্জায় ভয়ে তার কান-দুটো রাঙা হয়ে উঠল

অনেকক্ষণ তাকে বসিয়ে রাখল যশোদা। চিবুক ধরে আদর করে বললে
'তুমি রোজ আসবে কেমন? তোমাকে আমি চাল দেব, ডাল দেব, রোজ আসবে কেমন?

যশোদা সেদিন তাকে পেটভরে ভাত খাওয়াল। কোঁচড় ভ'রে দিল চাল আ
আনাজ। অনেকক্ষণ পরে বরিশালের সুধন্ত দাস চলে গেল। সদর দরজায়

সেদিনও দাঁড়িয়েছিল যশোদা। মিলিয়ে গেল সুধন্ত রাজপথের জনারণ্যে। চলে যাবার পর জিহ্বায় যশোদা অনুভব করল নোন্‌তা স্বাদ। এতক্ষণ তাহলে সে কাঁদছিল?

প্রভাত বেরিয়ে গেছে সেই সকালে, আসবে রাত্রি ন'টায়। সুবিমলের মৃত্যুর পর প্রতিদিন এই তপ্ত দুপুরটা অসহ্য মনে হতো যশোদার। সীমাহীন শূন্যতায় সে বারবার কাঁদত। সেদিন ভারী আনন্দ হয়েছিল যশোদার। মনে হয়েছিল সুবিমলের মৃত্যু হয়নি, সুবিমল আবার যশোদার কোলের কাছে ফিরে এসেছে।

নোংরা পার্ক। শিমুল গাছের ছায়ায় শুয়েছিল মোক্ষদা। দুপুর গড়িয়ে চলেছে। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে মোক্ষদার। ছেলেটা এখনও ফিরছে না? কি হল সুধন্তর? অনাগত বিপদের আশঙ্কায় মন কেঁপে ওঠে মোক্ষদার। কলকাতার গাড়িগুলো তো যন্ত্র নয়, জীবন্ত দৈত্য সব। দক্ষিণ দিকে কুষ্ঠরোগী অক্ষয় মাটির ভাঙা হাঁড়িতে ভাত রাঁধছে, ভোঁতা বঁটিটার উপর দেহের সমস্ত জোর দিয়ে শোল মাছ কুটছে বাতাসী। চুপ করে বসে রইল মোক্ষদা।

ঐ, ঐ আসছে সুধন্ত, আধখানা পা নিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল মোক্ষদা।—
'কিরে এত দেরী করলি কেন?'

'তুই বড্ড ভীতু মা'—সুধন্ত জড়িয়ে ধরল মাকে। 'জানিস্ আজ এক বাড়ি গেলাম, বৌটি আমায় কত আদর করল, কত চাল দিয়েছে দেখছিস্ মা!'

চালের থলিটা মায়ের চোখের সামনে এগিয়ে আনল সুধন্ত।

হাঁপানি আবার বেড়েছে মোক্ষদার। হঠাৎ তার চোখ দুটো লাল হয়ে এল। থক্ থক্ কাশতে কাশতে মাথা নীচু করল মোক্ষদা। সুধন্ত জড়িয়ে ধরল মাকে। বাঁটশূন্য পাখাটা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। সব কথা চাপা পড়ল সেখানেই।

তারপর রান্না হল, খাওয়া হল। সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল মায়ে ছেলেয়।

পরদিন সুধন্ত আবার গেল যশোদার কাছে। যশোদা সদর দরজায় দাঁড়িয়েই ছিল। সুধন্তকে দেখতে পেয়ে তার চোখ দুটো হেসে উঠল। সুধন্তর হাত ধরে সে সোজা চলে এল তার শোবার ঘরে। অনেকক্ষণ সুধন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল যশোদা, তারপর···তারপর কাঁদতে লাগল যশোদা, চোখের কোণে তার জল এল। সুধন্তকে জড়িয়ে ধরে তার কপালে চুমু খেল যশোদা। কাঁদতে কাঁদতে বলল—

'তুমি আমার কাছে থাকবে সুবিমল?'

সুধন্য অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল যশোদার দিকে। মেয়েটি নিশ্চয় পাগল। নইলে-- ভয় পেল সুধন্য।

'আমার নাম তো সুধন্য দাস, বরিশাল জেলায় বাড়ি।'

ট্রাঙ্ক খুলে সুবিমলের জামা কাপড় বের করল যশোদা। বলল,—'এই জামাটা তো সুবিমল!'

'না। আমি জামা পরবোনা, আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে ছেড়ে দিন!' সু ভয়ে কাঁপতে লাগল।

'চলে যাবে?' চীৎকার করে উঠল যশোদা। 'তোমায় যদি আমি নে না দিই, যদি এখানে আটকে রাখি?'

'আটকে রাখবেন?'—সুধন্য তাকাল যশোদার দিকে।

যশোদার চোখ দুটোয় আগুন জ্বলছে। হঠাৎ তার চোখ পড়ল খোলা দরজ দিকে। এখুনি একলাফে সে দরজা পেরিয়ে রাজপথের জনস্রোতে মিশে যেতে পা খোলা দরজার দিকে আবার তাকাল সুধন্য। তারপর সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

যশোদা চীৎকার করে উঠল,—'আসবে তো আবার? এসো, এসো, আবার এসো

'না। না। না।'

গলি পার হয়ে রাজপথের জনারণ্যে মিশে গেল সুধন্য।

সুবিমলের ফটোর দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলল যশোদা। মনে হল, এতদিন প তার মনে হল, তার ছেলে সুবিমল সত্যিই মারা গেছে। এ পৃথিবীতে কেউ তা আর খুঁজে পাবেনা।

দৌড়তে দৌড়তে পার্কের ভেতর ঢুকে পড়ল সুধন্য। দিক-বিদিক্ জ্ঞান হারি সে ঐ মেয়েটার বাড়ি থেকে পালিয়েছে। ভাগ্যিস্ সে মোটরের তলায় পড়ে

অবাক হল মোক্ষদা। আজ এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল কেন সুধন্য।

'এত তাড়াতাড়ি ফিরলি কেন? আজ বুঝি কেউ ভিক্ষা দেয়নি?'

মোক্ষদার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুধন্য। কাঁদতে কাঁদতে বলল,—'জানিস্ ম মেয়েটা আমায় আটকে রেখেছিল। বলে কি জানিস্, খাবি দাবি এখানে থাকবি

আর শুনতে চায়না মোক্ষদা। তার কাশি আসে। কাশতে কাশতে তার চোখদু লাল হয়ে ওঠে। তবুও সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ভগবান, ও আ ছেলেকে আটকে রাখতে চেয়েছিল। ও মেয়ের কোল যেন চিরদিন শূন্য থাকে।'

প্রভাত রাগ করে। প্রতিবেশীরা বিদ্রূপ করে বলে—'অনেক দেখেছি বাপু কিন্তু একটা ভিখিরীর ছেলেকে নিয়ে এত মাখামাখি দেখিনি!'

কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে যশোদা। প্রভাতের নিষেধকে অগ্রাহ্য করে। প্রতিবেশীদের বিদ্রূপকে অবহেলা করে। আজও সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে যশোদা। কত কুষ্ঠরোগী আসে, কত বিকলাঙ্গ করুণসুরে দু'মুঠো ভাত প্রার্থনা করে। কিন্তু না। সুধন্ত দাস আসে না। 'এসেছ নেংটা যাইবে নেংটা মাঝখানে কেন গণ্ডগোল'—গানটি আর শুনতে পায়না যশোদা। প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশায় তার দিন কাটে। হাজার হাজার ভিখারীকে সে প্রশ্ন করে—

—'সুধন্ত দাসকে তোমরা চেন? বরিশাল জেলায় বাড়ি। ভারি সুন্দর গান গাইতে পারে!'

ঝংকার

শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

[প্রথম বর্ষ-সাহিত্য বিভাগের ছাত্র। 'র‍্যাডক্লিফ্ রোয়েদাদে' শুধু বাঙলা দেশটাই ভেঙে দুটুকরো হলোনা, হারাণ চাটুজ্যের সুখী পরিবারের কপালটাও ভাঙলো। অপর্ণার সুরক্ষিত দৈনন্দিন জীবনের সেবা থেকে বঞ্চিত হলেন বৃদ্ধ বিপত্নীক শ্বশুর মশাই হারাণ চাটুজ্যে। ঝংকার তারই একটি কাহিনী। —সম্পাদক]

হারাণ চাটুজ্যে অবাক হয়ে নন্দ মিত্তিরের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তাড়া দিলেন নন্দ মিত্তির,—বলি আমি কি মাইয়া লোক নাকি যে এমন ক মুখের পানে দেখচস ?

তাড়া খেয়ে অবশ্য চমকালো না হারাণ চাটুজ্যে। শুধু একটু নড়েচড়ে বল্‌লে,—আজ্ঞে সেতো অনেক দাম।

—আরে কত দাম, সেডাতো কও ?

—আজ্ঞে শ-খানেক।

নন্দ মিত্তির একবার হারাণ চাটুজ্যের হাসি-হাসি মুখের দিকে চাইলেন। তারপ দিলেন সোজা একেবারে রাস্তায়।

একশ টাকা!

নন্দ মিত্তির যেন জ্বলে উঠতে লাগলেন। তিনি রোজ এক পয়সার তামাক আর তাঁর পুত্রবধূ বাজাবে কিনা একশ টাকার সেতার! হুপ্‌দাপ করে পা ফেলে চল্‌তে লাগলেন নন্দ মিত্তির। বাড়ি গিয়ে আজ অপর্ণাকে দেখে নেবেন!

নন্দ মিত্তির সোজা গিয়ে ঢুকলেন ঠাকুর ঘরে।

—বৌমা, বৌমা!

নবপরিণীতা বধূ তখন সন্ধ্যাপ্রদীপটি হাতে নিয়ে, ঘাড়ের ওপর দিয়ে আঁচলটি ঘু ফেলে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির কাছে প্রণাম করতে যাচ্ছে। শ্বশুরের গ আওয়াজে তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টেনে বল্লে,—কি বাবা। নন্দ মিত্তির কেমন একটা ধাক্কা খেলেন। সন্ধ্যাপ্রদীপের স্তিমিত আলোয় ঝল্‌মল্ করছে রাধাকৃ

পেতলের যুগল মূর্তি, আধো-ঘোমটা-টানা অপর্ণার শ্যামচিকন মুখখানিতে পড়েছে সেই আলোর আভা। শীতের হাড়কাঁপানো উত্তুরে হাওয়া আসছে খোলা জানালা দিয়ে।

এই মুহূর্তের এই পরম শান্তিটুকুকে নন্দ মিত্তিরের নষ্ট করতে ইচ্ছে হলনা। বল্লেন,—না থাক্ পরে হবে'খন।

বাইরের দাওয়ায় গিয়ে বসলেন নন্দ মিত্তির। শাঁখ বাজালো অপর্ণা, নন্দ মিত্তির যোড় হাত করে কৃষ্ণনাম স্মরণ করলেন।

নন্দ মিত্তির বিপত্নীক। একটি মাত্র ছেলে। কিন্তু নন্দ মিত্তির বলেন সে নাকি একেবারে বখাটে হয়ে গেছে। তার অবশ্য অনেক দোষ, সে নন্দ মিত্তিরের ছেলে হয়েও বি-এ পাশ করেছে এবং ধুতির সঙ্গে পাঞ্জাবী তো চড়িয়েছেই আবার মাথার চুলগুলো-কেও সে ঐ ফিন্‌ফিনে বাবুদের মত উল্টিয়ে ফেলেছে। সে কলকাতায় থাকে। কি একটা অফিসে কাজ করে। নন্দ মিত্তির খবর নিয়ে আরো জেনেছেন, সে অফিসে যাওয়ার সময় নাকি কোট-প্যাণ্টালুনও পরে। শুনে নন্দ মিত্তিরের গা জ্বলে গিয়েছে। কিছুদিন আগে ছেলেটির তিনি বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন অপর্ণার সঙ্গে। বিয়ে অবশ্য তিনি দিতেন না, এই আটখানা ঘর, গোয়ালঘর আর রান্নাঘর তিনি আর বাচ্চা বুদ্ধু চাকরই দেখাশোনা করে দিন কাটাতে পারতেন অনায়াসে। ও-ছেলের নামও তিনি মুখে আনতেন না। কিন্তু লোকে কুমন্ত্রণা দিল। ছেলের জোয়ান বয়েস তায় আছে কল্‌কেতা সহরে—বয়ে যেতে কতক্ষণ? একে তো কোট-প্যাণ্টালুন পরছে। লোকে জানতো এ কখনই সহ্য করতে পারবেন না নন্দ মিত্তির। কিন্তু লোকে আর একটা জিনিস জানতো না—যেটা নন্দ মিত্তির জান্‌তেন। কেমন করে লোক না খাইয়েও ছেলের বিয়ে দেওয়া যায়, একটা ছেলের বাপ হয়েও নন্দ মিত্তির সে আইনে খুব পাকা ছিলেন।

সে যাক্, ছেলের বিয়ে দিয়ে নন্দ মিত্তির এখন খুব ভালো ফল পেয়েছেন বল্‌তে হবে। সকাল বেলা উঠেই এখন আর তাঁকে ঝাঁটা হাতে করতে হয়না বুদ্ধুর সঙ্গে, তারপর গরুর গোয়ালও আজকাল তিনি পরিষ্কার করেন না, তামাক সাজা আর আজকাল বুদ্ধুর কাজ নয়, সর্বোপরি আজকাল আর বৃদ্ধের থালায় আধসের আর আধপোড়া অন্নব্যঞ্জনের সমাবেশ হয় না। রসাল রান্না খেয়ে খেয়ে বৃদ্ধের শুক্‌নো মনটাও আজকাল একটু একটু রসিয়ে উঠছে।

বৌটি বেশ লক্ষ্মী। সারাদিনের সারারাত্রের সব গৃহস্থালী কাজ সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। বৃদ্ধের এখন অফুরন্ত অবসর। ক্ষেতে-খামারে, মাঠে-ঘাটে, হাটে-গঞ্জে আর

কতক্ষণ ঘুরে বেড়ান যায়;—সুতরাং বৃদ্ধ আজকাল প্রায়ই একটু একটু করে তাবি
ঠেস দেন দাওয়ায় মাদুর পেতে, সন্ধ্যার সময় দাওয়ায় বসে গল্প করেন বুদ্ধুর সঙ্গে।

কিন্তু এহেন লক্ষ্মী বৌয়েরও একটা খুঁৎ বের করে ফেলেছেন নন্দ মিত্তির। একমাত্র দোষ সে রোজ দুপুর বেলায় হারমোনিয়াম সহযোগে গান গাই নন্দ মিত্তিরের মেজাজটা ভালো থাকলে নেহাৎ মন্দ লাগেনা অপর্ণার গান শুন বিশেষ করে রাত্তির বেলায় যখন একটা পেলব ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ নামে টাক বহুদিনের ক্লান্ত মাথাটায়। তখন ঐ গুন্ গুন্ সুরটা তাঁর অত্যন্ত ভাল লাগে। আজ রাত্তিরে ঐ হাতের সঙ্গে ঐ সুরটার মিশ্রণ না ঘট্‌লে ঘুমুতে পারেন না। অপর্ণার এই দোষটি তিনি মার্জনা করেছেন একেবারে।—

কিন্তু সেতার—একশ টাকা! অসম্ভব, এ অন্যায় আবদার!

ঐ বাক্সের মত হারমোনিয়াম যন্ত্রটার যেদিন আমদানি হয় অপর্ণার বাপের ব থেকে সেদিনই ভাল ঠেকেনি নন্দ মিত্তিরের। আজ আবার সেতার! একশ টাকা!

হাঁক পাড়লেন নন্দ মিত্তির,—বুদ্ধু ওরে ও বুদ্ধু।

ঘুমের ঢুলুনির মাঝখানে বাধা পেয়ে বুদ্ধু নড়ে চড়ে বসে বল্‌লে,—এজ্ঞে কত্তামশায়

কম্বলটাকে গায়ে বেশ করে জড়িয়ে নিলেন নন্দ মিত্তির। —একছিলিম তাম লইয়া আয়।

তামাকে টান দিলেন নন্দ মিত্তির। তামাক সাজায় বৌটার হাত নেহাতই ভালো তবু একবার যাচাই করলেন নন্দ মিত্তির,—আজকাল তামাকু কি তুই সাজস্?

আবার ঢুলুনির আয়োজন করতে করতে জবাব দিল বুদ্ধু,—আইজ্ঞা না, মাঠাহ সাজন।

একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন নন্দ মিত্তির,—বুদ্ধু ওরে ও বুদ্ধু।

—কি কয়েন? বিরক্ত হয়ে কাঁথাটা গায়ে জড়িয়ে বসল বুদ্ধু।

—আচ্ছা তোরে যদি কেউ কয় একশডা টাহা জলে ফেইল্যা দিতে।

—না কত্তা আমি কখনই দিমু না।

বুদ্ধুকে অর্থনৈতিক সদুপদেশ দেওয়ার একটা প্রচ্ছন্ন কারণ ছিল। অদূরে রান্নাঘ বসে রাঁধছে অপর্ণা, কথাগুলো তার কানে ঢুকলেও ঢুকতে পারে।

কিন্তু সেদিন মাংস খেয়ে বৃদ্ধের মেজাজ একেবারে গলে জল হয়ে গেল। পুত্রবধূ তাঁর দ্বিতীয় দ্রৌপদী—রান্না করে বটে!

বেশ অনেকক্ষণ ধরে খেতে খেতে ভাবলেন নন্দ মিত্তির, এমন বৌকে আর বকাবকি করা যায় কি করে। থাক্, আজকের দিনটা আর কিছু বল্‌বেন না নন্দ মিত্তির, কাল সকালে একটু বুঝিয়ে বল্‌লেই চুকে যাবে। বৌমা তাঁর লক্ষ্মী—বাদ প্রতিবাদ করবে না।

লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন নন্দ মিত্তির, শীতের নিঝুম রাতে অতন্দ্রঝিল্লির পাঁহারায় চুপচাপ চোখ বুজে পড়ে থাকতে খুব ভালো লাগে। বিশেষতঃ কেউ যদি অনেক কালের অনেক পথ-হাঁটা ক্লান্ত পা দুটোয় হাত বুলিয়ে দেয়। অপর্ণাও তাই দিচ্ছিল। শুধু তাই নয়, আর একটু তার সঙ্গে যুক্ত ছিল: সে হল তার মধুর গলার গান। নন্দ মিত্তির মোহিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ভাবলেন ভাগ্যে এরকম বৌমা একটা জুটেছিল।

রাত্রে যে গান শুনে মোহিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নন্দ মিত্তির, সেই গানের প্রতিক্রিয়া হল সকালে। ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে চা খেলেন নন্দ মিত্তির। তারপর বুদ্ধুকে বল্‌লেন,—তুই আজ একলাই যারে, আমি যামুনা আজ।

বুদ্ধু ভাবলো, নন্দ মিত্তিরের মাথা খারাপ হয়েছে, পুরো একটা দিন ক্ষেত খামারের অবস্থা না দেখে তিনি থাকবেন কি করে।

বুদ্ধুর মত হারাণ চাটুজ্যেও তাই ভাবল যখন দেখলো সে, ফোক্‌লা দাঁতে হাসতে হাসতে দশখানা দশটাকার নোট বার করছেন নন্দ মিত্তির ফতুয়ার পকেট থেকে। —আমি খালি হাতে আসি নাই হারাণ, খালি হাতে আসি নাই। নাও, দাও দেখি সেতারখানা।

বার বার করে নোটগুলো গুণলো হারাণ। তারপরে বাক্সে সেগুলো বন্ধ করে রেখে ঝকঝকে তকতকে সেতারখানা নামিয়ে আনল সে। একবার ঝংকার তুলে দেখে নিল তারগুলো ঠিক আছে কিনা, তারপর তুলে দিল নন্দ মিত্তিরের হাতে।

বেলা নয়টার সময় রান্না করতে করতে শ্বশুরের ডাক শুন্‌তে পেয়ে তাড়াতাড়ি করে বাইরে এসে ফিক্ করে হেসে ফেল্‌লে অপর্ণা।

—কেমন পছন্দ হয়েছে তো বৌমা।

অপর্ণা নীরব হাসিতে কথার উত্তর দিলে।

দুপুর বেলায় বাজনা শুন্‌তে চেয়েছিলেন নন্দমিত্তির, কিন্তু অপর্ণা তাঁকে বুঝিয়ে দিল

যন্ত্রের তার ঠিক করে বাঁধতে হবে তবেই সে বাজবে ঠিক মত। সুতরাং ব
শোনাই বিধেয়। বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

খাওয়া দাওয়া সেরে, সকলকে খাইয়ে দাইয়ে, ঘরের খিল দিয়ে সেতার নিয়ে ব
অপর্ণা। সুর উঠল 'জয় জয়ন্তী রাগে'। সুদের কারবারী নন্দ মিত্তির সুরের কার
কোনদিন করেন নি জানি, কিন্তু আজ তাঁর মনে হল এ মর্ত্যলোকে তিনি যেন
নেই। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ তুফানী সাগরের উজান ঠেলে তিনি যেন চলে গিয়েছেন কে
অরূপ লোকের পরীর দেশে। সেখানে তারা নাচছে, গাইছে, তিনি শুধু ক্লান্ত অব
চোখ মেলে চেয়ে রয়েছেন, কিছু বুঝতে পারছেন না।

বেশীদিন কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে সেতার শুনতে পারলেন না নন্দ মিত্তি
কন্যাকুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত একদিন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল, আর তার স
চঞ্চল হয়ে উঠল এই ছোট্ট মহকুমা সহরটা।

এল পনরই আগস্ট, উনিশশো সাতচল্লিশ। এলো র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌ রোয়েদাদ। খবর শুনলে
নন্দ মিত্তির, এই বিরাট দেশটার মাঝখান দিয়ে কারা যেন একটা লোহার বেড়া বসি
দিয়েছে। এপারটাকে বলছে তারা পাকিস্তান। ওপারটার নাম নাকি হিন্দুস্থান
শুধু তাই নয়, হারাণ চাটুজ্যের দোকানে একদিন ফিস্‌ফিস্‌ করে আরো খবর কা
এলো নন্দ মিত্তিরের :—পাকিস্তানে নাকি হিন্দুদের ধন-মান বিপন্ন। হিন্দুনারীর সম্ভ
নাকি লুপ্ত। শুধু কানে শুনলেন না নন্দমিত্তির চোখের ওপর দেখলেন দুখে গোঁসাই
বাড়িতে সেদিন ডাকাতি হয়ে গেল। শুধু টাকা-কড়ি কাপড়-চোপড় নয়, সঙ্গে সঙ্গে দু
গোঁসাইয়ের সোমত্ত মেয়েটাও।

কলকাতা থেকে ঘন-ঘন চিঠি আসতে লাগলো ছেলের, অপর্ণাকে নিয়ে আপ
এখানে চলে আসুন। জমিজমা সব বিক্রি করে দিন।

নন্দ মিত্তির সে চিন্তায় শিউরে উঠলেন। অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করলেন।—কি
হবে বৌমা?

মুখে হাসি আসেনা, জোর করে টেনে এনে উত্তর দিল অপর্ণা।—আপনি কিছু ভাববে
না বাবা, আপনাকে ছেড়ে কোথায় যাবো আমি। ঘাড় নাড়লেন বৃদ্ধ, দুখে গোঁসাইয়ের মেয়ে
কথা মনে পড়ে গেল। না, না! তুমি চইল্যা যাও বৌমা, কালই তোমারে দিয়া আসি
—আপনাকে ছেড়ে কোথায় যাবো বাবা? কে দেখবে আপনাকে?

অপর্ণার ঠাণ্ডা হাতটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলেন বৃদ্ধ। শেষে একদিন ছেলে নিজে এসে হাজির হল।

—আপনি কি পাগল হয়েছেন বাবা ? চলুন কলকাতায়।

বৃদ্ধ অনেক কষ্টে উত্তর দিলেন,—নারে বাবা না, তুই বুঝছনা তুই বৌমাকে লইয়া চইল্যা যা। আমি যামুনা।

ধমক দিল ছেলে,—ওসব খেয়াল ছাড়ুন কালই জমিজমা বিক্রি করে দিন।

কেঁদে ফেল্‌লেন নন্দ মিত্তির—ওরে না, না। একটি একটি পয়সা কইর‍্যা এই ভদ্রাসন করছি। বুকে ছুরি বস্‌লেও এ আমি বেচতে পারমু না, পারমু না।

অপর্ণার হাত ধরে ছেলে বেরিয়ে গেল একেবারে শুধু হাতে।

বৃদ্ধের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল, আবছা দৃষ্টিতে তিনি ওদের পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

প্রতিদিনের মত সেদিনও আকাশে সূর্য্য উঠল জলভরা শাওন-মেঘকে তুচ্ছ করে। কিন্তু প্রতিদিনের মত একটা মিষ্টি গলার আওয়াজ আর বৃদ্ধের কানে গিয়ে পৌঁছলনা। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে বসলেন নন্দ মিত্তির। পুকুরের জলে হাত মুখ ধুতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেলেন ঘাটে। তাঁর জন্যে আজ আর কেউ জল তুলে রাখেনি। মেজাজ আবার সপ্তমে উঠল তাঁর। খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলেন,—কইরে তোর উঠবার সময় হইল ?

ধড়মড় করে বুদ্ধু উঠে বসল।

তামাক খেতে গিয়ে বুদ্ধুর মাথায় হুকো কল্‌কে ছুঁড়ে মারলেন নন্দ মিত্তির। খেতে বসে পোড়া ভাতের গন্ধে হুংকার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন নন্দ মিত্তির, দুপদাপ্ করে ঘরে ঢুকে দারুণ আক্রোশে খাটের ওপর রাখা সেতারটাকে দুহাতে মুঠো করে চেপে ধরলেন নন্দ মিত্তির। তীক্ষ্ণ আর্তনাদে শেষ ঝংকার বেজে উঠল সেতারে। ছেঁড়া তারগুলোর দিকে চেয়ে হঠাৎ হুহু করে কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধ। তাঁর চোখের জল পড়তে লাগলো অঝোর ধারায়, বাইরের শাওন-ধারার মত।

টাকার অঙ্ক

শ্রীহরিশঙ্কর পাল

[তৃতীয় বার্ষিক সাহিত্য বিভাগের ছাত্র। মধ্যবিত্ত পরিবারের এমন অনেক গৃহিণী আছেন যাঁরা টাকার অঙ্ক দিয়ে গৃহশিক্ষকের নিষ্ঠিমাপা কাজ আদায় করতে চান। সুশীলবাবুর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের মাইনে দিয়ে যখন পুরো কাজ আদায় করার প্রত্যাশা করেন সরমার মা, সরমার মনে তখন ভাবনার অন্ত থাকেনা। শৈলেন বাবুর লেখা আর পড়া, পড়া আর লেখা নিয়ে আনন্দময় জীবন, নিজের পড়ার খরচ চালানো নিয়ে ভাবনাগ্রস্ত সুশীল বাবু, তাঁর গৃহশিক্ষকতা ত্যাগ, সরমার সুশীল বাবুকে ফিরিয়ে আনবার দৃঢ়পণ—এইসব নিয়ে টাকার অঙ্ক শুধু টাকার অঙ্কই নয়, একটি ছোটো গল্প।—সম্পাদক]

অনুরূপা আজ একটু তীব্র ভাবেই বলল—"তুমি কি রকম বলত? কদিন ধ বলছি সরমার একটি ভাল মাষ্টার দেখ, তা তোমার যদি একটু খেয়াল থাকে। সেই আর বই। পড়া আর লেখা, লেখা আর পড়া। কোথা থেকে এমন কবিতা লে বদখেয়াল যে পেয়েছ! যদি ঘরের দিকে একটুও নজর দিতে—তা নয় নাই দি ঐ একমাত্র মেয়ে—লেখাপড়া না শিখে উচ্ছন্নে যাবে তাও একবার চোখে দেখবে ন আচ্ছা ও সব মাথামুণ্ডু লিখে কি পাও তুমি?"

শৈলেন একটু হেসে বলল—"আনন্দ।"

—"আবার কলম চালাচ্ছ!"

—"বললাম তো এতে আনন্দ পাই, আর সত্যি বলতে কি তুমি এখানে থাক আর আমার কলম থামায় কে? তুমি যে আমার কাব্যের উৎস।"

– "থাক আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই, এখন দয়া করে আমার একটি কথা শুনবে

—"কবে আর না শুনেছি? এত শুনেও যদি অবাধ্য বলে দুর্নাম দাও তবে....."

—"থাক, তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসাই আমার দোষ। বাবারে বাবা, য ভুলেও একটি সোজা কথা বলতে? কেবল হেঁয়ালী আর ঠাট্টা।"

—"রাগ করছো? আচ্ছা, এই কলম রাখলাম। দরকার কি আমার কলমে জিভে না থাক, সামনে যখন তুমি তখন ভয় কিসের? তবে একটু যদি সময় দিতে—তাহ এতদিন শুধু শান্ত মূর্তিরই স্তবস্তোত্র রচনা করে এলাম, তার পাশে আজ একটু রুদ্র মূর্তি বর্ণনাটা জুড়ে দিতাম।"

—"আচ্ছা তবে লেখো আমি চললাম।"

—"না থাক। বল কি বলতে চাও।"

—"কি আর বলব। মাথা আর মুণ্ডু।"

—"কেন, পাশের বাড়ীর সুমিতার নূতন হারের ডিজাইনটা? শাড়ির পাড়ের নক্সাটা, না হয় ধরো....."

—"না গো না, তোমাকে আমি গয়নার কথা বলতে আসিনি আর শাড়ির কথাও না। কবে কি বলেছি সে দুর্নাম আজও গেলনা। এসেছিলাম তোমারই মেয়ে সরমার লেখাপড়ার কথা বলতে, তা আমার ঘাট হয়েছে; স্বীকার করছি আর কোনদিন বলবনা। তোমার যা ইচ্ছে কর।"

—"এই গুণেই তোমাকে আমার সব চেয়ে ভাল লাগে অনু। একটু কথা কাটাকাটি করলেই রেগে এত সুন্দর হয়ে ওঠো যে তা দেখে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে হয় না।"

—"এত করেও আমাকে অপমান করা শেষ হলনা?"

—"অপমান করব কাকে? জান না সাপকে মারলে শিবকে বাজে? তা যাক্ আমার মেয়ের কথা কি বলছিলে?"

—"বলবার আর কি আছে? মেয়েটাকে বোকা করে রাখলে যদি তাতে তোমার সুনাম হয় তাই কর।"

—"আমার মেয়ে তা বেশ বেশ। তবে মনে রেখো আমার যখন মেয়ে তখন সে আর যাই হোক, বোকা হবেনা। সে দিকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তা ছাড়া লেখা-পড়ার ত্রুটিও তো দেখছিনা। টিউটার রেখেছি নিয়মিত পড়িয়ে যান। স্কুলেও যাচ্ছে।....."

—"স্কুলে গেলে আর টিউটার রাখলে যদি লেখাপড়া হত তা হলে আর কেউ পণ্ডিত হতে বাকী থাকতনা। আজকাল মেয়েরা স্কুলে যায় শুধু আড্ডা দিতে—ট্রামে বাসে পয়সা খরচ করতে। আর বাপমাকে টিউটার রাখতে বলে সকাল সন্ধ্যে পড়ায় ফাঁকি দেবার সুযোগ করবার জন্যে।"

—"কথাটা খুবই সত্যি, তবে মনে হয় এটা শুধু এ কালের নয়। তোমাদের কাল থেকেই হয়ে আসছে। তবু এর মধ্যে যে ব্যতিক্রম নেই তা ঠিক বলা যায় না আর টিউটারদের যে দোষ দিলে ওটা ঠিক ওদের কিনা সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ। কেননা ভাগ্যদোষে আমিও একজনের টিউটার ছিলাম। যাক্ সে কথা।"

অনুরূপা আর কৃত্রিম গাম্ভীর্য বজায় রাখতে না পেরে হাসি চেপে বলল—সাধুতা দেখিয়ে কাজ নেই। এখন সব দোষ আমার ঘাড়ে দেবে বৈ-কী!"

—"না এতটা বলবার দুঃসাহস আমার নেই, তবে নিঃসন্দেহে এটুকু বলতে যে আমার উদ্দেশ্য ছিল মাত্র টাকা।"

—"টাকা! তবে শুধু টাকা নিয়েই নিশ্চিন্ত রইলে না কেন?"

—"নিশ্চিন্তে থাকতে পারতাম কিন্তু তুমিই কি স্থির থাকতে দিলে? আমি একটু বেশী সময় থাকি তার জন্যে চেষ্টা করতে না?"

অনুরূপা মুখ টিপে হেসে বলল—"আমার আর খেয়ে দেয়ে তো কাজ ছিলনা তুমি চলে এলে বসে বসে কাঁদব? বরং তুমিই....."

—"থাক্ এতদিন তুমি সত্যবাদী বলে আমার একটা ভুল ধারণা ছিল।"

—"আজ আর রইলনা এইতো? তা নাই থাক্ এখন তুমি সরমার মা কি করছ বল?"

—"কেন সুশীল বাবু তো আছেন। তিনি কি আর আসবেন না বলেছেন?

—"না, তিনি কিছু বলেন নি। সরমার ওঁর কাছে পড়ার ইচ্ছে নেই, নাকি ভাল পড়াতে পারেন না। সরমা কেবলই বলছে আমার মাষ্টারের দরকার আমি নিজেই পড়তে পারব।"

—"সুশীল বাবু পড়াতে পারেন না এটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। আসল ব কি জানতে পার?"

—"কি জানতে বল তুমি? ওইটুকু মেয়ে..."

—"তা জানি। তবে আমার মনে হয় সুশীল বাবু একটু strict principl লোক কিনা তাই। কিন্তু তাবলে তো আর ভদ্রলোককে জবাব দেওয়া যায়না। তা এমন একজন উপযুক্ত লোক পাওয়াও সহজ নয়। আচ্ছা, সুশীল বাবু তো আ এখুনি তার সঙ্গেই কথা বলে দেখি।"

* * * * *

সুশীল বাবু যথা নিয়মে তিনটার সময় পড়াতে এলেন। সরমা চায়ের কা খাবার প্লেটটা টেবিলে রেখে বলল—"বাবা আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।"

হঠাৎ কারণ কিছু বুঝতে না পেরে সুশীল বাবু খাবার ও চা না খেয়ে সোজা শৈলেন বাবুর ঘরে ঢুকলেন।

সুশীল বাবুকে ঘরে ঢুকতে দেখে শৈলেন বাবু আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলেন—"এই যে সুশীল বাবু—আসুন আসুন বসুন। আপনার সঙ্গে কদিনই দেখা করব ভাবছি কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না তাই আজ আপনাকেই একবার আসতে বলেছি। সরমা কেমন পড়া শুনা করছে? দেখে কেমন আশা করেন?"

—"সরমার বুদ্ধিসুদ্ধি রয়েছে তবে ভারি অমনোযোগী। যদি মন দিয়ে পড়াশুনা করে তা হলে ভালই আশা করা যায়। নৈলে কিছু বলা যায় না।"

—"সে আমি জানি, তবে কি জানেন—একমাত্র মেয়ে একটু বেশী রকম লেখাপড়া শেখাবার ইচ্ছা আছে। যতটুকু পারেন চেষ্টা করে দেখুন।"

—"সেজন্যে আপনাকে কিছু বলতে হবে না শৈলেন বাবু। ওর বুদ্ধি দেখে আমার বেশ আনন্দ হয় কিন্তু মাঝে মাঝে এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে যে লেখাপড়ায় ভীষণ অবহেলা করে। দেখে বড় দুঃখ হয়।"

—"না না, দুঃখের কোন কারণ নেই। আপনি পড়িয়ে যান তার পরে ওর ভাগ্য।"

—"আচ্ছা দেখি কতটুকু কি করতে পারি" বলেই বেরিয়ে এলেন সুশীল বাবু।

• • • • •

চারটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। সরমা বই খাতা তুলে রেখে চেয়ারে বসে কি ভাবছিল। সুশীল বাবু কখন ঘরে ঢুকেছেন তা লক্ষ্য করেনি। সরমাকে বই খাতা তুলে দিয়ে বসে থাকতে দেখে সুশীল বাবু বিষণ্ণভাবে বললেন—"একি সরমা তুমি আজ পড়লে না?"

—"চারটা তো বেজে গেছে মাষ্টার মশাই।"

সুশীল বাবু ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন—"তা বেজেছে কিন্তু আমি তো এতক্ষণ কেবল গল্প করে এলাম।"

—"তাতে কি হয়েছে। আপনি তো আর আপনার কাজে সময় কাটিয়ে এলেন না?"

কি উত্তর দিবেন ঠিক করতে না পেরে সুশীল বাবু বললেন—"তুমি তো বসে আছ একটু পড়ো না।"

—"না। আমার মাথা ধরেছে। আজ পড়তে পারব না আপনি যান মাষ্টার মশা

কোন কথা না বলে সুশীল বাবু বেরিয়ে গেলেন। ভাবলেন টিউশনি ছাড়তে হবে; কিন্তু ছাড়াও তো দায়। ছাড়লে কলেজ খরচ চলবে কি করে?

সুশীল বাবু বেরিয়ে গেলে সরমা নিঃসঙ্কোচে চোখের জল মুছে ভাবতে কি করা যায়। বাবাকে বলতে সাহস হয় না কিন্তু মাকে তো বলেছে। কিছুই তো ফল হল না। তবে কি বাবার কাছেই বলতে হবে? দরকার হলে সে বলবে। এমন সময় শুনতে পেল কে যেন সদর দরজায় কড়া নাড়ছে। তাড়া উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখল একজন অপরিচিত লোক।

—"এটা কি শৈলেন বাবুর বাড়ী?"

—"হ্যাঁ, কাকে চান?"

—"শৈলেন বাবুর নামে একখানা চিঠি আছে রাখুন, বাবুর কাছে পৌঁছে দেবেন

চিঠি খানা নাড়া চাড়া করতে করতে শিরোনামা দেখেই চমকে উঠল সর এযে মাষ্টার মশাইর হাতের লেখা! তাড়াতাড়ি খুলে ফেলল চিঠি খানা। চিঠি মুখ শুকিয়ে গেল সরমার। এ কি করল সে—এক নিমেষের ভুলে সব তার পালট হয়ে গেল! চিঠি নিয়ে ছুটে গেল সরমা তার বাবার ঘরের দিকে।

শৈলেন বাবু তখন মাসিক পত্রিকায় একটি গল্প পড়ছিলেন। হঠাৎ সরম ছুটে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হলেন।

চিঠিটা তাঁর হাতে দিল সরমা।

চিঠি খানা পড়ে সরমার সাদা মুখের দিকে চেয়ে শৈলেন বাবু বিস্মিত জিজ্ঞাসা করলেন "এ তো সুশীল বাবুর চিঠি! তিনি আর পড়াতে আসবেন না লিখেছে কিন্তু কি আশ্চর্য এই একটু আগে আমার সঙ্গে কথা হল কৈ তিনি তো বললেন না? কি হল এরই মধ্যে? তুমি কিছু জান?"

—"না" অতি কষ্টে উত্তর দিল সরমা।

—"একি তুমি কাঁদছ কেন সরমা? সুশীল বাবু কি তোমায় কিছু বলেছেন

—"না তিনি কিছু বলেন নি। আমিই তাঁকে এই চিঠি লিখতে বাধ্য করেছি তিনি আমায় ভুল বুঝেছেন বাবা।"

—"যাক্, তাতে আর হয়েছে কি? আমি দু-একদিনের মধ্যেই একজন টিউটর ঠিক করে ফেলব, কোন চিন্তা নেই। তুমি একটু বেড়িয়ে এস। আমি সুশীল বাবুর চিঠিটার উত্তর লিখে দিই।"

—"চিঠি লিখতে হবে না আর। আমাকে মাষ্টার মশাইর ঠিকানা বলে দাও আমি তাঁর কাছে যাব।"

—"তুমি এই সন্ধ্যে বেলায়..."

—"হাঁ, এখনই।"

—"ছেলে মানুষ আর কাকে বলে। না-হয় কাল যেও, তিনি তো কাছেই থাকেন।"

—"না বাবা, আমি এখনই যাব।"

—"কি পাগলের মত বকো সরমা!"

—"না বাবা, তুমি জান না আমি কত বড় ভুল করেছি। দেরী হলে আর হয়ত এ ভুলের সংশোধন করতে পারবনা। মাষ্টার মশাই হয়ত কাল সকালেই অন্য কোথাও বেরিয়ে যাবেন। আমি জানি তাঁর টিউশনি গেলে পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। আমিই তাঁকে এই বিপদের মুখে ঠেলে দিলাম।"

—"একথা তুমি জানলে কি করে সরমা?"

—"আমি তাঁর বন্ধুকে লেখা একখানা চিঠি দেখেছি। চিঠি খানা তিনি ভুল করে আমাদের এখানে ফেলে গিয়েছিলেন।"

—"তবে সুশীল বাবুকে একবার ডেকে পাঠাব, না তুমি যাবে?"

—"আমিই যাবো বাবা। আমার ভুল আমাকেই সংশোধন করতে দাও। তবে মনে রেখো বাবা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাঁর টাকার অঙ্ক মিল থাবেনা। সে ক্ষতিটুকু কিন্তু তোমার সইতেই হবে।"

একটি ভাঙা-মন্দিরের আত্মকাহিনী

শ্রীসন্তোষকুমার চক্রবর্তী

[প্রথম বর্ষ—সাহিত্য বিভাগের ছাত্র। মন্দিরের দেশ ভারতবর্ষ। এ দেশের প্রত্যেকটি মঠ-মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি কাহিনী একটি জনশ্রুতি। সবচেয়ে বড়ো বিস্ময়ের কথা, ভারতের সবকটি মন্দিরের আত্মকথার সুর যেন একই; এই সুর যেন শাশ্বত কালের। ভাঙা মন্দিরের আত্মকাহিনী ভারতের আত্মার কাহিনী—জীর্ণ দেবতা-লয়ের কাহিনী শুধু নয় ।—সম্পাদক]

কে? কে তুমি? ক্লান্ত পথিক উত্তাপে, পরিশ্রমে, অবসাদে শ্রান্ত পান্থ এসে বসেছ আমার প্রাঙ্গণে। তা বেশ, কেউ কোনদিন কাছে আসেনা; তাই তোমাকে কাছে পেয়ে খুব খুসী আমি। জানি না, ভাল লাগবে কি না কাহিনী, তবু একটুখানি থাক, আমার কথা রাখ। বিশ্রামের এই অবকাশে জীবনকথা শোন। দেখছ তো, আমার শেষ সময় উপস্থিত, তাই বড় ইচ্ছা ক আমার জীবনের দু'টি কথা শুনিয়ে যাই।

—আজ আমি জরাগ্রস্ত। আজ আমি এই অজানা বিজন গহন বন কালো আঁধারে মগ্ন। মানবচক্ষুর অন্তরালে এই বটচ্ছায়ায় প্রাচীন দিনগুলির স্মরণ ক'রে আমি দিন কাটাই। সারাটা মনের মধ্যে তোলপাড় করে অতীতের আসা দিনগুলির বিস্মৃত স্মৃতি। কি ছিলাম—কি হয়েছি!

দীর্ঘ একশ' বছর আগে পৌষ-সংক্রান্তির এক শুভদিনে হয়েছিল আমার আমার মাথায় ছিল স্বর্ণকলস; এ মন্দির এখানকার স্থানীয় জমিদারের সম্পত্তি। ধুমধামে যেদিন আমার কক্ষ-মধ্যে হয়েছিল শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা, সেদিনের সাড়ম্বর ম সবের কথা স্মরণ করলেও আমার আজকের এ নিঃস্পন্দ প্রাণ হাহাকার ক'রে কিন্তু সবই নিয়তির খেলা!

আমার প্রতিষ্ঠার কারণটাও বলি, শোন। এখানকার মহামান্য জমিদার ব ছিলেন নিঃসন্তান;—বিস্তীর্ণ জমিদারী তাঁর উত্তরাধিকারীর অভাবে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে —এটা তাঁর ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও কোন ফল হ'ল না। অ তিনি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও শিবপূজার আদেশ পেলেন স্বপ্নে। তৈরী হ'ল মন্দির—যে কক্ষটিতে হয়েছিল শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা, সে কক্ষটি ছিল স্বর্ণ ও মণিমাণিক্য-খ

বিপদে প'ড়ে এই মন্দিরে এসে যে যা প্রার্থনা ক'রত—তারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ত। বহু দূরদেশ থেকে আসত দলে দলে লোক। আমার যৌবনের সেই কোলাহল-মুখরিত আনন্দময় দিনগুলো আর জীবনে ভীড় ক'রে আসবে না। "এখানে একদা হাজার মানব দাঁড়াত নিত্য কৃতাঞ্জলি"—তাদের শ্রদ্ধাভক্তি, ও পূজাপার্বণে একদিন মহিমমণ্ডিত হ'য়েছিলাম আজকের এই হতভাগ্য আমি। লোকে সেদিন আমার নাম দিয়েছিল "কল্পমন্দির"।

সন্ধ্যার প্রারম্ভে দশদিক মুখরিত হয়ে উঠত আরতিকালের শঙ্খধ্বনি আর ঘণ্টাকাঁসরে। আবালবৃদ্ধবনিতা সানন্দে উদ্‌যাপন ক'রত এই আরতি-উৎসব। তখন আমি থাকতাম দীপশিখায় আলোকিত, ধূপধুনায় আমোদিত, শ্রদ্ধাভক্তিতে ভরপূর। আর আজ? আজ সেই মন্দিরের ধার দিয়ে জনমানব চলাচল করে না। আজ আর বাজে না কাঁসর-ঘণ্টা, পুরোহিত বসে না পূজায়, নেই ধূপামোদিত উদ্বেল বায়ু, না বিতরণ করা হয় দেবতার চরণামৃত।

তখন সন্ধ্যারতির পর আমারই বর্তমান ধূলিধূসর প্রাঙ্গণে বসত পাড়ার লোকের মজলিস, হ'ত রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদির কথকতা, গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ। এ সবের আমিও ছিলাম একজন নীরব শ্রোতা। কিন্তু 'অচিন্তিতানি দুঃখানি—'। জীবনের আনন্দজোয়ারে পড়ল ভাঁটা, ভাঁটার পর দুকূল প্লাবিয়ে এলো দুঃখের বন্যা, এলো মরণের বিভীষিকা, মৃত্যুর আহ্বান।—

—আজ হ'তে বিশ বছর আগে। অমানিশার তমোভারে সমাচ্ছন্ন মন্দিরগৃহ ও প্রাঙ্গণ। সারা বিশ্ব ঢলে পড়েছে সুষুপ্তির কোলে। এলো দারুণ বিপর্যয়। ডাকাতের দল এসে লুঠ ক'রে নিয়ে গেল মন্দিরাভ্যন্তরস্থ সমগ্র ধনসামগ্রী। নিয়ে গেল আমার শিরোপরি চির-ভাস্বর স্বর্ণকলস, ভেঙ্গে ফেলল মন্দিরদ্বার, চূর্ণ-বিচূর্ণ করল শিবলিঙ্গ। অথর্বের মতো আমি ঠায় দাঁড়িয়ে দেখলাম সবই, করবার ছিল না কিছু; বলবারও কিছু ছিল না। আমাকে তারা ঠেলে দিয়ে গেল মৃত্যুগুহায়। আমার দিকে ফিরেও তাকালো না গ্রামবাসী।

আজ আমি সম্পূর্ণ একাকী। আজ আমার সর্বাঙ্গে জন্মেছে আগাছা—ক্ষতের মত, লেগেছে মরণের ঢেউ, জমেছে জঞ্জাল, নেমেছে অন্ধকার, এসেছে দুঃখভার; আসছে জীবনের করাল যবনিকা। আজ আর হই না মৃত্যুভয়ে অধীর। নির্জনে নিভৃতকোণে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছি মৃত্যুর শুভলগ্নের জন্য।

তুমি পথিক;—তুমি তোমার চলার পথের যাত্রী, আর আমি অন্তিমপথের যাত্রী। জীবনপথের যাত্রা 'তোমার হ'ল সুরু, আমার হ'ল সারা।'

সার্কাস্

হিমাদ্রিকুমার চক্রবর্তী

[তৃতীয় বর্ষ—সাহিত্যবিভাগের ছাত্র। 'অদ্ভুত এই গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল সার্কাস,' আরো অদ্ভুত মুন্নুর জীবনযাত্রা, আফিংখোর বুড়ো সাহেব, বদমেজাজী প্রোপ্রাইটার। সমাজের সুখী পরিবারের ছোট মেয়ে ধূপশিখা; ওদের জীবনযাত্রা মুন্নুর চোখে ভারি অদ্ভুত লাগে। নোংরা পরিবেশের মধ্যে থেকে একটি সুন্দর জীবন লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা মুন্নুর। সার্কাস তারই গল্প।—সম্পাদক।]

ছোট্ট শহর।

ইদানীং একটু সরগরম হয়ে উঠেছে। ধুলো ভরা দু'টি রাস্তা স্টেশন বেরিয়ে দু'দিকে বেঁকে গিয়ে শহরের ভেতরে প্রবেশ করেছে।.....বাঁ-দিকের একধারে সারি সারি ছাউনি পড়েছে। চারপাশ টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা;—একটু এগিয়ে গেলে চৌমাথার উপর দেখা যায় ক্যাম্বিস কাপড়ে ঢাকা বিরাট ছা বড় বড় হরফে লেখা,—গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল সার্কাস।—শহরের প্রধানতম আকর্ষণ।

মরসুমী ফুলের মতো গজিয়ে উঠেছে আশে পাশে—চা আর পান-বিড়ির দোকান

তাঁবুর আরেক পাশে খাঁচায় আটকান বাঘ ও সিংহগুলি রাখা হয়েছে;—আনার টিকিট কিনে এই অস্থায়ী চিড়িয়াখানায় ঢুকতে হয়।—ভীড় জমেছে ছেলে মেয়েদের—এক একটা খাঁচার সম্মুখে। যারা টিকিট কিনতে পারেনি, ব টিনের বেড়ার ফুটোগুলোতে চোখ আটকে তারা নিজেদের উৎপীড়িত কৌতূহল নি নিচ্ছে। ছাউনিগুলোর আশে পাশে ঘুর-ঘুর ক'রছে শহরের নিকর্মা বয়াটে ছে গুলো—।

রিক্সাওয়ালা সুর করে হেঁকে যায়: সার্কাসতলা চার-আ-না।...বেলা গড়িয়ে রোদ্দুরে তেতে-ওঠা লাল ধুলো দমকা হাওয়ায় এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে।..... সার্কাস দলের লোকগুলো এদিক-ওদিক গা এলিয়ে, কেউ বসে-বসে ঝিমো কেউ বা আয়েস করে বিড়ি খেতে-খেতে, পুরোনো কথা মনে হলে, বুক চেপে দী নিঃশ্বাস ছাড়ে। এদিকে একটা গাছের তলায় জমেছে তাসের আড্ডা; নো তাসগুলো ভাঁজতে-ভাঁজতে একটি লোক কী-সব যা তা বকে, কেউ বা গান ধরে বেসুরো গলায়: "ঘর আয়া মেরে পরদেশী।".....

সাদা চামড়া বুড়ো সাহেবটা বসে বসে আফিং-এর নেশায় বুঁদ হয়ে ঢুলছে। দলের মেয়েগুলো একটা ছাউনির ভেতর ইতস্ততঃ এখানে সেখানে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

• • • •

মুন্নু একবার পাক দিয়ে সবটা দেখে নিল। এই সার্কাস দলের ক্লাউন সে, ওর চোখে ঘুম নেই। ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছে এ-তাঁবু থেকে ও-তাঁবু। যে লোকটা খেলা দেখানোর সময় বেহালা বাজায়, সে এখন একলা বসে বসে আপন মনে নূতন সুর ভাঁজছে। লোকটা বোবা। কিন্তু নিপুণ অঙ্গুলী চালনায়, বেহালা যেন ওর হাতে কথা কয়ে ওঠে। মুন্নুর কাছে এই লোকটি ভারি অদ্ভুত লাগে! সার্কাস দলের প্রোপ্রাইটারের ঘরে একবার উঁকি দিল মুন্নু। কি-একটা বিশ্রী তেজী গন্ধ এল নাকে। মাছিগুলো ভন্ ভন্ করে উড়ছে চারধারে। বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে লোকটি।

• • • •

মুন্নু বড় বড় খেলোয়াড়দের ফুট-ফরমাস খাটে, পা টেপে, আর প্রায় সব সময় প্রায় সবারই কাছে খায় মার। কারণে অকারণে সকলেই দু'চার বার হাতের সুখ সেরে নেয় ওর ওপর। সামান্য দোষত্রুটিতে চলে অবিশ্রান্ত কিল, ঘুসি আর লাথি। অন্ততঃ মুন্নু যে একটি মনুষ্য-শিশু এ বিষয়ে অনেকেই ওয়াকিবহাল নয়। খেলা দেখাবার সময়, সবাই যখন মারাত্মক কঠিন কঠিন খেলা দেখিয়ে দর্শকদের রোমাঞ্চিত করে তোলে, মুন্নু তখন মাটিতে ডিগবাজী খেয়ে, বানরের মতন অঙ্গভঙ্গী করে, বিচিত্র রকমের শব্দ করতে করতে দর্শকদের হাসায়। খেলা দেখানোর সময় সবাই ওকে যখন তখন লাথি মারে, ধাঁই করে চাঁটি কষিয়ে দেয় মাথায়; দর্শকেরা হেসে উঠে ওর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী দেখে। মুন্নু নিজে ভাঁড়ের মতন পোষাক পরে; রিংএর খেলা ট্রাপিজের খেলা দেখায়। আবার মাঝে মাঝে না পারার ভঙ্গী করে উল্টে পাল্টে আছাড় খেয়ে দর্শকদের হাসায়।

• • • •

আজকের খেলা একটু জাঁকজমক করে আরম্ভ হবে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসছেন সার্কাস দেখতে সপরিবারে।.....রোদ্দুর পড়ে আসে—উঁচু উঁচু তাল গাছগুলোর ঝির-ঝিরে পাতার ফাঁকে-ফাঁকে ছায়া নামে।

দলের কতকগুলো লোক চলে গেছে বড় ছাউনিতে। আসর সাজাতে আরম্ভ করে দিয়েছে তারা। কড়া পাওয়ারের বিজলি বাতি পর পর সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। সম্মুখের

আসনগুলো ঝেড়ে মুছে রাখছে পরিষ্কার করে। ততক্ষণে এ পাশের ছোট ছাউনিগুলোতে সাড়া পড়ে গিয়েছে। পশুগুলোকে এনে জড়ো করা হয়েছে জায়গায়। সেখান থেকে সার বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে বড় ছাউনিতে। ব্যস্ত ভাবে, হাঁকডাকে আর কুৎসিত গালাগালিতে বাতাস ভারি হয়ে উঠল। স দলের মালিক—প্রফেসার চ্যাঙসা এতক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পোষাকের আজ সর্বাঙ্গে। বুকে ঝুলছে ঝক্‌ঝকে একরাশ মেডেল। সারা গায়ে সস্তা দিলবাহ ভুরভুর গন্ধ—স্খলিত উত্তেজনা যেন মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে। বিগত রাত্রির ক্লান্তি চোখে।

* *

মুন্নু চটপট তার শতচ্ছিন্ন, সহস্র তালিমারা বিবর্ণ বিদকুটে পোশাকটি পরে নি সারা মুখে মেখে নিল খড়ির রং আর মাঝে আলতার ছোপ। মাথায় একটি ম কাপড়ের টুপি।

বিজলি আলোগুলো জ্বলে উঠছে। গ্যালারীতে দর্শকদের আসন ভরে উ অনেক আগেই। সামনের আসনগুলোতে বাবুরাও আসতে সুরু করেছেন—স্ত্রী সপরিবারে। বাইরে প্রচণ্ড ভীড়। বিড়ির শ্বাসরোধ-করা ধোঁয়া, ঘাম আর ঠেলাঠেলি এক বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

খেলা আরম্ভ হল। আসরের চার কোণে চারটি ট্রাপিজের দোলনা টাঙ হলো। পাশে ঝোলান আছে দড়ির মই। বাজনাদারের দল তালে তালে বিলিতী ব বাজাতে সুরু করেছে।

মুন্নু হাঁ করে দেখে। হঠাৎ তন্ময়তা ভাঙ্গলো কানের উপর প্রচণ্ড এক চ টাল খেয়ে পড়তে-পড়তে কোন রকমে ট্রাপিজের দড়ি ধরে ব্যাং-এর মতো ঝুল লাগল মুন্নু। প্রচণ্ড হাসির হর্‌রা এদিকে। ধপাস করে পড়ল সে টাঙ্গান দড়ির জালের ওপ আরেক দফা হাসির রোল উঠল। মুন্নুর সর্বাঙ্গ থেকে যেন ডেলা ডেলা আগুন ঝরছে

সামনের চেয়ারে একটি খুকী বসে আছে, সাদা ধবধবে ফ্রক পরনে। পায়ে সা জুতো আর মোজা। হাতের ছোট ব্যাগটিও সাদা। কানের পাশ দিয়ে নেমে গে গুচ্ছ গুচ্ছ রেশমের মতো নরম কোঁকড়া চুল।.....মুন্নুর ভারি ইচ্ছে হয় ওর স কথা বলে। কিন্তু সে কেমন করে হবে! অনেক বড়লোকের মেয়ে নিশ্চয়ই-

অনেক টাকা ওদের। বিরাট বপু এক ভদ্রলোক ওর পাশে বসে আছেন, নিশ্চয় ওর বাবা। মেয়ের সঙ্গে বাপের তুলনা করতে গিয়ে ভারি হাসি পেল মুন্নুর।

মুন্নু এইবার বাহাদুরী করে ট্রাপিজে উঠে দোল খেতে খেতে হঠাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে ডিগ্‌বাজী খেয়েই আবার রিং দুটো ধরে নিল। ছোট মেয়েটি মুগ্ধ বিস্ময়ে হাত-তালি দিয়ে উঠল,—আর চার পাশে বয়ে গেল হাততালির ঝড়।.....ট্রাপিজের একটি খেলোয়াড় হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে মুন্নুকে মারলো প্রচণ্ড এক লাথি ;—একটি পুঁটলীর মতো গড়িয়ে পড়ল মুন্নু। দর্শকেরা হাসিতে ফেটে পড়ল বেশ একটা রসিকতায়। লোকটি আসলে মুন্নুর প্রশংসালাভ সহ্য করতে পারেনি।

ছোট মেয়েটি তার ছোট মাথাটি দুলিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল। ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত মুছে ফেলে মুন্নু উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। মুক্তোর মত দাঁতগুলো ঝক্‌ঝক্ করছে ওর। মুন্নুর ভারি ইচ্ছে হয় একবার গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করে আমার খেলা তোমার কেমন লাগল। আপন মনের সঙ্কোচ আর ভয় ঘিরে ধরে তাকে। যদি এমনি করে ঐ মোটা লোকটা লাথি কষিয়ে দেয়। যন্ত্রণা-বিকৃত মুখে মুন্নু প্রাণপণে লোক হাসাবার চেষ্টা করে। একটি খবরের কাগজকে পাকিয়ে পাকিয়ে বিরাট লম্বা করে, এককোণে আগুন ধরিয়ে চোখ বুজে গম্ভীর চালে সিগারেট খাবার ভঙ্গী করে।...লোকে হেসে গড়িয়ে পড়ে মুন্নুর কাণ্ড দেখে।

—মাগো! এই পাজীটার কাণ্ড দেখ বাবা? মেয়েটি মহা উৎসাহে বাবার হাত টেনে ধরে।

ভদ্রলোক ডাকলেন—এ্যাই তোর নাম কিরে?

সভয় কণ্ঠে উত্তর আসে—মুন্নু।

—ভারি সুন্দর নাম তোমার! মেয়েটি মিষ্টি করে বলে।

বিহ্বল সুরে মুন্নু বলে—তোমার নাম কি?

—আমার নাম ধূপশিখা। তবে সবাই শিখা বলে ডাকে। মেয়েটি জবাব দেয় চট্‌পট্।

এবার এসে পড়ে প্রচণ্ড এক চাবুকের ঘা কাঁধের ওপর। ঘোড়ার চাবুক ; চালক মালিক স্বয়ং। মুন্নু সরে যায় সেখান থেকে ধীরে ধীরে। শিখা তাকিয়ে থাকে বেদনাত দৃষ্টিতে। মুন্নুকে ওরা এত মারে কেন বাবা? শিখা প্রশ্ন করে।

—দেখছিস না পাজীটা কি বদ্‌মাশ? বাবা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে ওঠেন।

শিখা নাগাল পায়না মুন্নুর বদ্‌মায়েসীর।

এইবার বাঘ সিংহের খেলা। বড় বড় খাঁচায় পশুগুলিকে আসরে নিয়ে আসা হল। সিংহের মেঘের মতো ডাক শুনে ভয়ে শিখা বাবার কোলে মুখ লুকোল। মুন্নুর হাসি পায় শিখার ভয় দেখে। ছোট্ট মেয়ে! মুন্নু এবার ঢুকলো বাঘের খাঁচায়। ভয়ে আতঙ্কে শিখা আর্ত নাদ করে ওঠে। মুন্নু বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে আসে খাঁচা থেকে।

রাত্রি অনেক হয়ে এলো, খেলা শেষ হয়।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই মুন্নু বেরিয়ে পড়ল তাঁবু থেকে। রাত্রির শিশির-ধোয়া নরম মাটি। হাঁটতে অদ্ভুত ভাল লাগে মুন্নুর। ধীরে ধীরে পা চালিয়ে মুন্নু শহরের ভেতরে এসে পড়ল। সামনেই একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর দোতলা বাড়ী। সরল জ্যামিতিক রেখার মতো সমান করে ছাঁটা মেহেদির বেড়া সামনের দিকটা ঘিরে আছে। মাঝে মাঝে গুচ্ছেগুচ্ছে ফুটে আছে রঙীন মরসুমী ফুল। গেটে পিতলের ঝকঝকে ফলকে নাম—বাড়ীর মালিকের কাঞ্চন-কৌলিন্যের সাক্ষ্য বহন করছে।

কিন্তু, কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে বারান্দা থেকে? হ্যাঁ, সত্যিই তো! মুন্নু থমকে দাঁড়াল। কালকের সেই সুন্দর মেয়েটাই তো তাকে হাত নেড়ে ডাকছে। মুন্নু এগিয়ে গেল খানিকটা। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে ভয় লাগে তার; যদি দারোয়ান গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। শিখা মহা উৎসাহে হাত নেড়ে ডাকছে তাকে। মুন্নু একটু ইতস্ততঃ করে ঢুকে পড়ল। দোতালার বারান্দা থেকে শিখা নেমে এসেছে এক দৌড়ে। মুন্নুর মনে ভারি এক অদ্ভুত অনুভূতি। এত সুন্দর, এত কমনীয় কাউকে আগে দেখেনি সে। ফর্সা গালের উপর সোনালী চুলগুলো ছড়িয়ে আছে। সকালের ঘুম-ভাঙ্গা চোখ দুটিতে যেন এখনও মিষ্টি স্বপ্নের রেশ। সোনালী চুল গুলো ছড়িয়ে আছে।

শিখা কলকল করে কতো কথা বলে যায়, মুন্নু তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টে।

একটি অচেনা ছেলের সঙ্গে পরম অন্তরঙ্গভাবে শিখাকে কথা বলতে দেখে, দোতলা থেকে শিখার মা তীক্ষ্ণকণ্ঠে শিখাকে ডাকতে ডাকতে নীচেই নেমে এলেন।

—এই তুই কেরে?

পরম উল্লাস ভরে শিখা চোখ বড় বড় করে জবাব দেয়—ওকে চেন না মা? ওতো মুন্নু; কাল ও সার্কাসে কত মজার খেলা দেখাল! আতঙ্করুদ্ধ স্বরে আবার বলে—জানো মা, কালকে মুন্নু একবার সিংহের খাঁচায় ঢুকে গেছ্‌ল!

শিখার মা একবার মুন্নুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে অপ্রসন্ন কণ্ঠে বল্লেন—তা এখানে তোমার কি দরকার?

শিখা তাড়াতাড়ি বলে—বারে আমিই তো ডাকলাম ওকে ?

চাকর এসে ডাকলে—চা দিয়েছি টেবিলে, মা।

শিখা মুন্নুকে হাত ধরে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে গেল। অবাক বিস্ময়ে মুন্নু দামী কৌচ কার্পেটে সাজান ঘরের দিকে চেয়ে থাকে। শিখার মা মুন্নুকে চমকে দিয়ে বলে উঠেন, —হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিস কি ? কিছু চুরি করার মতলব নেই তো ?

শিখার বাবা এতক্ষণ কাগজ পড়ছিলেন নিবিষ্ট মনে ; চোখ তুলে একটু রসিকতা করে বল্লেন—কি হে বিদুষকপ্রবর খবর কি ?

শিখারা ভারি অদ্ভুত। তা নয়তো কি ?

বিবর্ণ মুখে ড্যাবডেবে চোখ মেলে মুন্নু তাকিয়ে থাকে। তাকে যে কেউ ঝকঝকে দামী পেয়ালায় চা আর ডিশে খাবার দিতে পারে এটা তার কল্পনার বাইরে। মুন্নুর মনে পড়ে তাদের সার্কাস দলের ভেলিগুড়ের এক তিক্ত বিস্বাদ পানীয়ের কথা।

সাহস সঞ্চয় করে একটা কথা হঠাৎ বলে ফেলে মুন্নু। —আমাকে আপনাদের চাকর রাখবেন ?

কৌতূহলে শিখা আয়ত চোখ দুটি মেলে তাকায়। তাঁদের চোখে আরেক ঝলক বিস্ময়! শিখার বাবা স্ত্রীর সমর্থনের প্রত্যাশায় মুখ তোলেন।

মা যেন কেমন একটু ক্লান্ত কণ্ঠে টেনে টেনে বল্লেন,—মন্দ কি ? তাছাড়া ধেড়ে চাকর গুলো আমার মোটে পছন্দ নয়। শিখা উল্লাসে হাততালি দিয়ে ওঠে।

…মুক্তির আশ্বাসে এক অব্যক্ত উত্তেজনায় মুন্নুর ছোট দেহটা কেঁপে ওঠে বার বার। সারাদিন শিখাদের বাসায় কাটিয়ে শেষে মুন্নু বিকেলের পড়ন্ত রোদে সার্কাস পার্টির ছাউনিতে ফেরে গুটি গুটি। কাল ভোরবেলাই সে চলে আসবে তার জামা কাপড় নিয়ে।

মালিক বেরিয়ে এল স্বয়ং তাঁবু থেকে। কুতকুতে রক্তবর্ণ চোখ দুটো তুলে মুন্নুর মুখের দিকে তাকাল একবার। টলতে টলতে এগিয়ে এসে নীরবে চেপে ধরল মুন্নুর সুমুখের এক গোছা চুল।

এক মোচড়ে খানিকটা চুল উঠে এল। সুরু হল অমানুষিক অকথ্য মার। অবিশ্রান্ত কিল, চড়, ঘুসি পড়ে বৃষ্টির মতো। মারের চোটে মুন্নুর মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল। মাটিতে পড়া মুন্নুর দেহটায় উপর কয়েকটা লাথি কষিয়ে লোকটা টলতে টলতে তাঁবুতে ঢোকে। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনিই চলে গেল নিঃশব্দে।

খানিকটা মাটি ভিজে কাদা হয়ে যায় রক্তে।

সংজ্ঞাহীন দেহটা সেই ভাবে কিছুক্ষণ পড়ে থাকবার পর, কারা এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে কোনরকমে ওকে তুলে নিয়ে চট্ করে তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়ে। টপ্‌টপ্ করে গড়িয়ে পড়ে তাজা রক্তের ফোঁটা।

ধীরে ধীরে মুখর হয়ে ওঠে মুন্নু; উত্তপ্ত মস্তিষ্কে নামে বিকারের ঘোর। কি যেন এক আনন্দ সারা গায়ে আগুনের হল্কা ছুঁইয়ে যায়। পিপাসায় কণ্ঠ শুকিয়ে তালুতে ঠেকেছে। শুধু অস্ফুট গোঙানি বের হয় গলা দিয়ে।

তারপর কখন শান্ত হয়ে আসে মুন্নু। সুন্দর স্বপ্ন নেমেছে তার দু'চোখ ঘিরে। শিখার সঙ্গে সে বাগানে বসে খেলা করছে; ছুটছে রঙীন প্রজাপতির পেছনে। রঙীন ফুলে সাজিয়ে দিচ্ছে শিখাকে। আস্তে আস্তে সব অন্ধকার হয়ে যায়।

পর দিন সকালে সারাক্ষণ শিখা দোতলার বারান্দায় অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে মুন্নুর।

কুড়িয়ে-ছড়িয়ে

নোগুচি-সংবর্ধনা

[এই সংখ্যায় এটি একটি নতুন বিভাগ। নতুন কিছু দেবার প্রবৃত্তি নেই। আশুতোষ কলেজ নিয়ে পুরোনো খবর—নতুন ছাত্রদের কাছে এখনও যা অশ্রুতপূর্ব—তাই এখানে পরিবেশন করা হলো। বর্তমানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অতীতের অক্ষয় স্মৃতি জড়িয়ে মধুর একটি পরিবেশ সৃষ্টি করবার প্রয়াস আমরা করেছি। উন্নাসিক যাঁরা—বর্তমানকে করেন অশ্রদ্ধা, নতুনকে করেন অপাঙ্‌ক্তেয়, তাঁদের কাছে আমাদের দাবি যেমনি, আবার নিতান্ত বর্তমান-দরদী আত্মপ্রত্যয়হীন আধুনিকদের কাছেও তেমনি। 'কুড়িয়ে-ছড়িয়ে' পড়তে-পড়তে যদি এই কথাই মনে হয় আপনার, তাহলে বুঝবো আমাদের প্রয়াস সার্থক হয়েছে। সংগ্রহ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী।

কবি 'য়োনে নোগুচি' সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। তিনি জাপানের কবি, জাপানীদের কবি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যে-কজন কবি এ-পর্যন্ত দেশে-বিদেশে পরিচিত, কবি নোগুচি তাঁদের একজন। উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিশ্বভারতীতে তাঁর কয়েকটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল! ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর প্রভূত পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান সর্বজনবিদিত। বহুদিন ধরে আমেরিকায় দিন কাটিয়েছেন। উনিশশো তের সালে অকস্‌ফোর্ডে তাঁকে জাপানের কবিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্যে আহ্বান জানানো হয়। তাঁর রচিত বইয়ের মধ্যে কয়েকটি 'Seen & Unseen', 'The Summer Cloud', 'The Voice of The Valley', 'The Spirit of Japanese Poetry' হলো উল্লেখযোগ্য। কয়েক বছর আগে তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

কলকাতায় থাকবার সময় আশুতোষ কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। আশুতোষ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলার ও আমাদের কলেজের পরিচালক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। নীচে দুটি অভিনন্দন পত্র থেকে অবিকল উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।—সম্পাদক]

ASUTOSH COLLEGE

———

RECEPTION
IN HONOUR OF
PROF. YONE NOGUCHI
Monday, December 2, 1935, 4 P.M.
IN THE
ASUTOSH MEMORIAL HALL
BHOWANIPUR.
PRESIDENT :
Mr. Syama Prasad Mookerjee, M.A.B.L.,
Bar-at-law, M.L.C.,
Vice-Chancellor, Calcutta University.

To

Prof. YONE NOGUCHI

Mighty creator of mighty dreams, you are the true representative of the cultural outlook of the East, which combines glowing emotion with sagacious foresight, fatalism with a sense to stand supreme to it and beauty with sobriety. As one hailing from the land which imbibed the message of Lord Buddha and which cherishes the ideal of freedom with religious zeal and passion, we accord you, O Singer of immortal songs, our loving and respectful greetings and we pray that the lyre of your music may give forth ever fresh notes to delight, charm and inspire us.

We are respectfully,
Yours,
the Students of
ASUTOSH COLLEGE

Bhowanipur
2. 12 35.

অধ্যাপক য়োনে নোগুচি
করকমলে—

বিরাট কল্পলোকের হে বিরাট স্রষ্টা,

প্রাচ্য সংস্কৃতির সত্যস্রষ্টারূপে তুমি তোমার প্রদীপ্ত ভাবরাজিকে সূক্ষ্ম ভবিষ্য দৃষ্টির সহিত যুক্ত করিয়াছ, অদৃষ্টবাদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সৌন্দর্যকে অপ্রমত্ততা দান করিয়াছ।

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' এই মহামন্ত্র জপিয়া যে দেশের লোক ধর্মানুরাগের সহিত স্বাধীনতার আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করে, তুমি সেই দেশ হইতে আসিয়াছ।

হে শাশ্বত উদ্‌গাতা, তুমি আজ আমাদের প্রীতিপূর্ণ ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর। প্রার্থনা করি, তোমার কাব্য-বীণার কলধ্বনি চিরকাল ধরিয়া আমাদের প্রাণে অনুরণিত হইয়া আমাদিগকে নূতন ধারায় ও চিন্তায় অনুপ্রাণিত করুক।

ইতি—
ভবদীয়
আশুতোষ কলেজের
ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দ

রজত জয়ন্তী সংখ্যা

[উনিশ-শো একচল্লিশ সালের সতরই জুলাই। এই বছর কলেজের পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ায় আশুতোষ কলেজ ম্যাগাজিনের বিশেষ একটি 'রজত জয়ন্তী সংখ্যা' প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি রচনা থেকে উদ্ধৃতি যোগ করলাম।

বর্তমান কালের কথা সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। রজত জয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর লেখা 'স্মৃতি' থেকে অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধেও সেই কথা। তিনিও আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। রজত জয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর চার লাইনের কবিতা 'দর্শন'টি উদ্ধৃত করা হলো।—সম্পাদক]

"প্রিয় সম্পাদক,

একদিন এই কলেজ ছিল একান্ত আমাদের। আর আজকে যদি ফটকে পা দিই, নানাজনকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সে জগৎ নেই, সেদিনের সে জীবন কত পিছনে ফেলে এসেছি।

শ্রীমনোজ বসু।"

• • • •

"তুমি আর আমি (পোষাকে তফাৎ।)
দেখা হল কাল পার্কে;
ধার না চাহিতে বললে হঠাৎ
এ-জগতে ভাই কার কে?

সুভাষ মুখোপাধ্যায়।"

জানেন কি ?

[কয়েকটি বিশেষ বিশেষ খবর দেওয়া হলো]

রাস্তার ওধারে এখন যেখানে 'চিত্তরঞ্জন ক্যানসার ইন্‌স্টিটিউট্,' আগে ওখানেই 'বিজনী হাউসে' আশুতোষ কলেজ ছিল ? ঠিকানা ছিল—২৬, ল্যান্সডাউন রোড।

• • • •

উনিশশো ষোল সালের সতরই জুলাই আশুতোষ কলেজ খোলা হয়; প্রথম বছরের ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৬২ জন ?

• • • •

আশুতোষ কলেজের প্রথম ছাত্র ছিলেন শ্রীঅবনীনাথ বসু (রোল নং—১); ইনি পরে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে আমাদের কলেজে যোগদান করেছিলেন ?

• • • •

বিপ্লবী শহীদ যতীন দাস আমাদের কলেজেরই ছাত্র ছিলেন ?

• • • •

পরিমল রায়—'মিঃ এশিয়া' আখ্যা পেয়েছেন যিনি, তিনি আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ?

• • • •

[We reproduce below a very interesting piece from the Editorial Notes of the First issue of our College Magazine (1924).—Editor]

"It is quite in the fitness of things that the editors of College Magazine have some times to play the role of a grand father and inflict lengthy sermons on young unwilling ears. ---------- He, however, emphasises the fact that all students should combine and co-operate in building up a high tradition for this College, their '*alma mater*'. Now that our College has got its magazine, we ought to make the best use of it."

নূতন বই

শ্রীঅমিয়রতনের 'স্বপ্ন ও সংগ্রাম'-এর আলোচনা

আলোচনা ফেঁদে বসবার আগে এই আসল কথাটা বলে নিতে চাই যে, আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর সবকটিই আমার ভালো লেগেছে। তবু প্রশ্ন একটা থাকে, ভালো লাগার তো একটা ক্রম আছে। কথা কয়টি নিতান্তই পরিচিত, বিষয়বস্তু নিতান্ত অপরিচিত বা অজ্ঞেয় নয়। বিশেষ ধরনের বিশেষ কথাকে মন কোন বিশেষ কারণে এত আগ্রহের সঙ্গে আস্বাদ করে, সবাই তা সমালোচকের কাছে জানবার দাবি জানায়। মন আমাদের জহুরী, পাঁচমিশালী সংসারে জহর খুঁজে বেড়ানোই তার কাজ। যে পায়, পরিচিত বলে তুচ্ছ এই বিশ্বে সে পায়—সাত রাজার ধন মানিক, মরজগতের ভেতরেই ছড়ানো অমরার অমিয়া। জগতে কাব্য ছিল, ছিল কাব্যের আদর, আজকের তুলনায় ধনদৌলতে তুচ্ছ হলেও মানুষ একদিন কাব্যের অমৃত-রস পান করে ধন্য ভাবতো নিজেকে; কল্পনার কোমল শয্যায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন-সাগরের তলায় ডুব দিয়ে মানিক কুড়াতো, সারা গায়ে চাঁদের আলো মেখে নীল স্বপ্নে-মোড়া সূর্যের আকাশে অপরূপের রূপ দেখতো চোখ ভরে, বুকের ভেতর শুনতে পেতো সুদূরের ডাক; মুক্ত জীবনে দিকে দিকে কবিতার স্বচ্ছন্দ বিলাস উপভোগ করতো প্রাণ ভরে। তখন ছিল রঙিন মনে রঙবার স্বপ্নের হোলিখেলা। প্রয়োজনের নাগপাশ তখনও মুক্ত জীবনকে বাঁধতে পারেনি। অমিয়বাবু টের পেয়েছেন আজ সেই প্রাণময়ী পৃথ্বীর সন্তানরা নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে মৃত্যুর হাতে অনন্ত দুর্গতি ভোগ করছে। চারদিকে জ্বলছে দাউ দাউ শ্মশান-বহ্নি। সাহসী কবি, একদিকে এই প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে নেমেছেন, আর একদিকে মনের নিরালায় স্বপ্ন দেখছেন। একদল সাধক জীবনকে মুক্তি দেবার আনন্দে সংগ্রাম করছে, আর একদিকে মুক্তির জন্যে যে-বেদনা রয়েছে পুঞ্জীভূত, তাকে ভাষা দেবার আনন্দে স্বপ্ন দেখছে:

'সেদিন তাদের হাত ভরে ফলবে সোনার ফসল
আর ললাট ভরে জ্বলবে সোনার মুকুট।
সেদিন তাদের পায়ের তলায় জাগবে উর্বরা পৃথিবী,

আর মাথার শিয়রে, নীলাভ আকাশ!
সেদিন আমরা ঠিক আজকের মত নাই-বা থাকলুম
—কে থাকতে চায় এই একচক্ষু-অজ্ঞান পৃথিবীতে?'

মৃত্যু-কাপালিক আজ হয়তো জীবনের কান্তস্বপ্ন নিয়েছে শোষণ করে, সাধক ক তবু ভয় নেই। কালরাত্রিতে বিশ্বের মহাশ্মশানে কবি করছেন শক্তিমন্ত্রে সাধনা।

মুক্তি মিলে প্রেমের পথে, স্বস্তির স্বপ্নেই জীবনের পরিচয়। সেই মুক্তি স্বস্তি-স্বপ্নের বাধা সরানোর জন্যেই তো শুচিস্নাত কবি জ্বেলেছেন কাব্যের হোমান ললাটে যজ্ঞশেষ টিকা পরে বন্দিনী কাব্যবধূকে উদ্ধার করবার জন্যে ডাক দিয়েছে সৈনিকদের:

'তাদের হাত-ই সত্য, হাতে চৌর্য-চাতুর্য,
তাদের জিহ্বাই সত্য, জিহ্বায় পিপাসার দম্ভ,
তাদের বুদ্ধিই সত্য, বুদ্ধিতে প্রভুত্বের প্রতিজ্ঞা,
তাদের পেটই সত্য, পেটে বুভুক্ষার হাতিয়ার,
সৈনিক, তুমি যুদ্ধে যাবে না?'

কবির যে স্বপ্নসুন্দর সাধের হীরামন নীলসাগরের সূর্যসীমায় ভেসে বেত, ডাক দি কখনো উড়ে আসত দক্ষিণ বাতায়নের মুক্তদ্বারে, দিকে দিকে পাতা হতো অসুন্দর ঢেকে দিয়ে সুন্দরের সিংহাসন, অরণ্যে সাড়া পড়ত যৌবনের, বনফুলের গন্ধ ছড়া স্বপ্ন, সেই সাধের হীরমনকে কবি কবর থেকে নূতন জীবনে জাগাতে চান। জীবনে সৈনাপত্য কবি সেধে নিয়েছেন—মৃত্যুকে জয় করবেন বলে, স্বপ্নকে যৌবন-পুলকে রোমাঞ্চিত করবেন বলে। কবির 'অফিউস্' মৃত্যু মানে না, শঙ্কা জানে না, আজ সে 'হেডিসের' কবরে গান গায়। নির্বাসিত কুসুমমাস আবার কবে আসবে ফিরে কুসুমতরু আবার হবে মঞ্জুরিত, হীরামন আবার গাইবে গান, ধূলির ধরণী আবা হবে স্বপ্নময়ী; মানুষ স্বপ্ন দিয়ে পথকে মুড়বে সোনায়, আঁচলের খুঁটে বাঁধা থাকবে তার স্বপ্নের পাথেয়, স্বপ্নময়ী অমরাবতীর বিজয়-কেতন আকাশে উড়তে-উড়তে পথিকবে জানাবে সান্ত্বনা, দগ্ধ সংসারের ছাইগাদায় আবার ফুটবে সন্ধ্যামালতী, আবার দিকে দিকে ভাসবে বিজয়িনী চম্পার সৌরভ।

যে 'বৃদ্ধবটের' তলায় অশান্ত সংসার জুড়াত দাহজ্বালা, কত প্রবল ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে 'শিরাবহুল' অঙ্গ হয়েছিল বলিষ্ঠ; কালের কুঠার কতকাল হতে তার

ডালে হানছে আঘাত। তবু ঐ অক্ষয়বট শোনায় আমাদের 'অভী'মন্ত্র। হীরামন পাখি নেই, বুড়ো বট ভাঙতে বসেছে। দুনিয়ার কোথাও কি থাকবে না জুড়োবার মত একটুখানি ঠাঁই? যারা স্বপ্ন দেখে একদিন তাদের হয়তো আর দেখা পাওয়া যাবেনা, শুধু বাপে-তাড়ানো-মায়ে-খেদানো মেয়ো কুকুর নর্দমার এঁদো জলে ভাষাহীন কান্নার সুর তুলে গা ডোবাবে। আকাশে চলবে অগ্নিলীলা, তখন যারা গাইবে বৃদ্ধবটের মহিমা গান, তাদের কান্নার সুরে প্রাণ দেবে যে-সব নিরপেক্ষ কবি, অমিয়বাবু বোধহয় তাদের অগ্রদূত। 'একটি তারা'র একতারাতে কবি শুনতে পেয়েছেন—music of the stars; যে-দূরত্বে হারিয়ে যায় মন, সেই সুদূর দিগন্তে দেখতে পেয়েছেন তিনি সূর্যের পথ। সুদূরের পিয়াসী পথিক কবি ঐ একটি তারার একতারার ঝংকার শুনতে-শুনতে বাধার শৈল পায়ে দলে এগিয়ে চলেছেন—যেখানে পাওয়া না-পাওয়ার ভেদ ঘুচে যায় সেইখানে। যেখানে দেখা যাবেনা আর্তের নয়নবিলম্বী অশ্রুধারা, কবির জীবনে নূতন জীবন পেয়ে হীরামন আবার যেখানে তুলবে সুরের লহর, কলের বাঁশিতেও অকারণ রহস্যের আবেগে যেখানে বাজবে নূতন সুর, যেখানে আচম্বিতে ফ্যাক্টরির কুলি মজুররাও বসবে স্বপ্নবিহ্বল হয়ে। শিবের মন্দির ভেঙে চুরমার হলেও একদিন ফ্যাক্টরির চূড়া ভেদ করে চিমনীর ধোঁয়ায় উঠবে 'ত্রিশূলের মত ত্রিধারা':

'ভাবুক কোন ফ্যাক্টরির কবি-কমরেড্
ত্রিধারায় দেখবে ত্রিমূর্তির অপূর্বতা,
আঁকতে বসবে রহস্যের রূপচ্ছবি,
তখন কে তাকে বোঝাবে: ও-সব মিথ্যা?.....'

সেখানে শক্তির সঙ্গে বিরাজ করবে সাম্য—যেন বোনটির বুকে কচি ভাইটি। সীমাহীন নীলাম্বর যে-সত্য নিজের অম্লান মহিমায় দীপ্তিময়, কবির মর্মে সেই সত্য, স্বপ্ন হয়ে নেমে এসেছে। কবি তাদের দেখতে পেয়েছেন—

'তারপর একদিন ধরিত্রীর প্রতি ঘরে-ঘরে
শতাব্দীর অবসানে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে অমাচ্ছন্ন রাত
দুর্বার বিদ্রোহী কত অকস্মাৎ দানিবে সাক্ষাৎ
নয়নে আনিবে ধরি' নভ হতে চন্দ্র ও ভাস্কর।'

মানুষের অবিরাম চাওয়া, পাওয়ার খর রৌদ্রের ভিতর দিয়ে ও না-পাওয়ার অমানিশা পার হয়ে যে সুদূর স্বপ্নময় রত্নদ্বীপে ছুটে চলেছে,—

'সেই রত্নদ্বীপে ভাই, যারা নাই, তারা আসে,
যারে চাই সেও আসে
ললিত বিলাসে গান গায়।'

রত্নদ্বীপের আশ্বাস না থাকলে চলা থেমে যেত, কবির কাছে খবর এসেছে সে আ
না থাকলে কলের বাঁশি বাজত না। আজকের এই অন্ধকারেও সুরের মশাল জা
অসুরপুরে অভিযান করবার জন্যে কবি বার হয়েছেন তাঁর এই ক্ষীণকায় তারার এক
নিয়ে। সুরে-সুরে আঘাতের পর আঘাত হেনে অন্ধকারের বুক থেকে কবি বার ক
জ্যোতির নির্ঝর, তারপর ঐ আলোর ঝরঝরানির সঙ্গে কবি শুনাবেন আধুনিক ছড়া।

'অনাথ মেয়ের কাজলকালো চোখ
চোখের তলে সাত সাগরের জল,
জলের ঢেউ-এ ঢেউ-এ, না-না
ঢেউ-এর তলে তলে
স্বপ্ন যেন সন্তরি হয়
লাখ জনমের শোক।
কবি, কাজল-কালো চোখ
তাতে অতল সায়র-লোক,
তাতে স্বপন শোকের সুর
আমি রইব না আর ঘরে, এবার
যাব হেতমপুর॥'

হীরামন পাখির সঙ্গে সঙ্গে গেছে আমাদের—

'ছোট ছোট সুর আর সুখ
ছোট ছোট ভালবাসা
চেতনা বেদনা
হাসিমুখ
ছোট ছোট আশা ভরা বুক
ছোট ছোট কাঁদা হাসা
সাধনা কামনা,
শোকদুখ—'

কবির কানে খবর পৌঁছে গেছে কোথায় তারা ?—

'এই যে তারা···ছোট্ট ফুলের স্বর্গপুরে
ছোট্ট পাখীর কল্পসুরে।'.....

যাদের অনেক অভাব—তাই অনেক স্বপ্ন আর অনেক সংগ্রাম, তাদের হয়ে কবি আলোর মত স্বচ্ছ সহজ কথা বলেছেন। সংগ্রামে নেমে কবি মানবদেশী মনুষ্যত্বের শত্রু দানবের নিতান্ত স্থূল আনন্দের উপর তীব্র বিদ্রূপের শূল হেনেছেন। আজ হীরামন পাখি নেই, 'অমার কবরে' হৃদয় ঘুমিয়ে পড়েছে, নূতন জীবনের মেয়াদ পেয়ে ভূত পেত্নীরা রোগা-বুক সাহসে চওড়া করে হুংকার ছাড়তে ছাড়তে চলেছে ছুটে চীনে আর কোরিয়ায়:

'ঈগলের মত ঠোঁট নাড়ে লেজ নাড়ে,
কাস্তের মত বাঁকা হয়ে গোঁৎ খায়।'

কবির স্বদেশ সুদূর কল্পলোকে—'যে-দেশে আত্মীয়জনা ভ্রাতৃজনে বন্ধুজনে কখনো করেনা প্রতারণা।' 'যে-দেশে সূর্যের মত আমার সন্তান দল প্রকাশের পায় অধিকার।' যে-দেশে মানুষে মানুষে শিষ্টাচার.....

'লোভ নয়, ক্ষোভ নয়, স্বার্থ নয়, ষড়যন্ত্র নয়,
সাধকের দিব্যস্বপ্ন মূর্ত সেথা বাক্যে ব্যবহারে—'

তাঁর স্বদেশ পুরুষের—

'ধেয়ানে অনন্ত স্বর্গ, মর্মে বিশ্ব কর্মে মাতৃভূমি ?'

কবি একটি রূপকথা শুনিয়েছেন ; তাঁর মনের কথা রূপকথাটির মধ্যে পেয়েছে অপরূপ-রূপ। অপূর্ব মণিময় প্রাসাদ, ফুল তুলতে এসে রূপসীরা করছে জলকেলি। দূর হতে শোনা যায় তার কলোচ্ছ্বাস। দূরে প্রাসাদ-শীর্ষে কমকণ্ঠ হতে ভেসে আসে গান। আকাশে পুলক-প্রবাহ, বসুন্ধরা গাঁথে ষড়ঋতুর মালা। কালো-কৃষ্ণ মধুপের গুনগুন সুরে নেশা লাগে। ঝাঁকে ঝাঁকে অবাধ পুলকে উড়ছে বন-বিহঙ্গম। সেখানকার কুঞ্জে কুঞ্জে বিলাসিনী বাসন্তিকা করে প্রিয়-সম্ভাষণ। স্বপ্ন-বিহারীর মনে হলো, এই তো তার রাণীর রাজ্য, এর বাইরের রূপে মন ভরলো না তার। স্বপ্নচারী প্রবেশ করতে চাইল অন্তরে, সে চাইল বীণার সুরের আঘাতে দ্বার খুলতে যে সুরে সূর্য দোলে, বাতাসে ছন্দ জাগে। বীণা শুনে ভ্রমর ভুলল মধু পান। সুরের মোহ ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। কে যেন বলল —'এ রাজ্যের রূপের মধু যারা পান করে তারা ফিরতে চায় না পৃথিবীতে।' স্বপন-পথের পথিক সরাসরি ঢুকে পড়ল প্রাসাদের দ্বারপথে। দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল। সেখানে মধুর

হাসির ছলনার ভেতর দিয়ে সুরু হলো রাণীর খোঁজ। সুর শোনা যায়, গন্ধ অ
ভেসে আসে টুকরো-টুকরো কথা। কিন্তু রাণী কোথায়? প্রিয়াকে না
স্বপ্নপ্রয়াস ব্যর্থ হয়। এখানে নাচছে হীরামন পাখি, ওখানে স্বর্গ করছে উঠি-উঠি।
কক্ষের দুয়ার যখন খুলল তখন ভিড় করে এল বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহীর দল। তারা ভাঙল কুঞ্জ
লুট করল হীরা-মণি-মাণিক। বন্দিনী রাণীর দেখা পাওয়া দূরের কথা, অনেক বিড়ম্ব
ভোগ করতে হয় স্বপ্নচারীকে।

তারপর 'স্বপ্ন ও সংগ্রাম' কাব্যখানির পাতায় পাতায় প্রতিধ্বনি উঠছে: 'তারপ
তারপর আর কি! তারপর স্বপ্ন, তারপর সংগ্রাম। তারপর প্রিয়ার সন্ধানে 'অন্তহীন
পথ চলা।' স্বপ্ন দেখা আর সুর দিয়ে অসুরের সঙ্গে লড়াই করা। কবির বিশ্বাস অসু
একদিন পরাজয় নিশ্চিত। সেদিন পাতা হবে কবিতার সিংহাসন। সুরকণ্ঠ প
আবার ছড়াবে গান। বুড়োবটের প্রাণবন্ত একটি উপশাখা ক্লান্ত পথিককে আবার জো
ছায়া। সেদিন কানে বাজবে না অন্নের জন্যে কোলাহল। সেদিন আসবে কুসুম সুকু
শান্তি তার ছোট্ট ভাই সাম্যকে কোলে করে কবির স্বদেশ পুরুষের সিংহাসন-তল
ভাইবোনের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সারা দুনিয়া আওড়াবে আধুনিক ছড়া:

'ঘাসের শিরে কোমল কচি ফুল
ফুলের কানে প্রজাপতির প্রেম,
প্রেমের চুপিসুরে, না না,
সুরের অরিরূপে—
ইন্দ্রধনির স্বপ্ন যেন
আনন্দে চুলবুল।
কবি, কোমল কচি ফুল
তাতে প্রজাপতির দুল
তাতে ইন্দ্রলোকের সুর
আমি রইব না আর ঘরে, এবার
যাব হেতমপুর।'

কবিকে কথা দিয়ে রাখছি সেদিন কবির সঙ্গে আমরাও যাব হেতমপুর। সে হেতম
পৌঁছে দিতে পারবেন একা কবিই। আমরা কি ছাই তার ঠিকানা জানি?

যে-কাব্যে কথার পাপড়ির আড়াল থেকে চাপা কবিমনের গন্ধ আসে,—'যেন মা

ধীমন্তঃ', প্রাচীনেরা করতেন সেই কাব্যের আদর। শ্যাম-মেঘের বুকে রাইবিজুরীর খোঁজ করেই তাঁরা পেতেন আনন্দ। আমাদের কবি নিপীড়িত মানবাত্মার সহজ সরল স্বচ্ছ কথাকে রূপ দিতে চেয়েছেন।

তাই কবিকে জিজ্ঞাসা করি—

'তোমাদের কবি আছে, আমাদের কবি কোথা পাই ?
—আমাদের কবি হবে ? '

অধ্যাপক শ্রীসত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

ছোটদের মঙ্গলকাব্য—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এইচ্. সি. নাথ এণ্ড ব্রাদার্স, ১১৯, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫। মূল্য দেড় টাকা।

অধ্যাপক শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোটদের মঙ্গলকাব্য'—বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লেখা হ'লেও কলেজের ছাত্রছাত্রী ও মাস্টার মহাশয়দেরও বিশেষ কাজে আসবে বলেই আমার ধারণা হয়েছে। বেশ জ্ঞানগর্ভ অথচ সরস গ্রন্থ ; পড়ে বেশ আনন্দ পেয়েছি, উপকৃতও হয়েছি।

বাঙ্‌লা দেশে বিস্তর মঙ্গলকাব্য লিখিত হয়েছে—সমস্তগুলি ধৈর্য সহকারে পাঠ করা সাধারণের পক্ষে এমন কি মাস্টার মহাশয়দের পক্ষেও সম্ভব না। অথচ বাঙ্‌লা কাব্যসাহিত্যে যারা অধিগতি লাভ করতে চায়—মঙ্গলকাব্যের গহন অরণ্যে তাদের প্রবেশ করতেই হয়। অধ্যাপক সুকুমার যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করে মঙ্গলকাব্যের মূল কথা, তথ্য ও তত্ত্বগুলি আহরণ করে সাধারণের মধ্যে সাধারণের উপযোগী করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর শ্রম সার্থক হয়েছে। এই একখানি বই পড়েই মঙ্গলকাব্যের কবিসমাজ ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা হবে। কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয় যে বলেছেন—সুকুমারের এই 'গ্রন্থখানি উপাদেয় হয়েছে'—এ সম্বন্ধে আমরা একমত।

গ্রন্থখানির প্রথম অধ্যায় (মধ্যযুগীয় সমাজ-তথ্য) ও ষষ্ঠ অধ্যায় (কবি-পরিচিতি) বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা। অন্যান্য অধ্যায়গুলিতে আছে বিবিধ মঙ্গলকাব্যের আখ্যান মঞ্জরী। শেষোক্ত অধ্যায়গুলি বালকদের কাজে আসবে—পূর্বোক্ত অধ্যায় দুটি মাস্টার মশায়দের উপকারে লাগবে। গ্রন্থখানির ভাষা বেশ সরল, তবে ভঙ্গীটি বড় অ্যাকাডেমিক্—এই জন্য অনেকগুণ সত্ত্বেও মাঝে মাঝে বড় একঘেয়ে ঠেকে। অধ্যাপক সুকুমার এই ত্রুটিটুকু

যদি উত্তীর্ণ হতে পারেন, তাঁর রচনা একদা সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করবে বলে আ
দৃঢ় ধারণা হয়েছে।

সন্ধ্যামালতী—শ্রীআশুতোষ সান্যাল। উষা পাবলিশিং হাউস—৩৪, ম
হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৬। মূল্য একটাকা বার আনা।

সত্যকার কবিমন ও কবিহৃদয়ের অধিকারী হয়েও আজও যাঁরা সর্বজনপরি
কবিরূপে সমাদৃত হননি, কবি আশুতোষ সান্যাল তাঁদেরই একজন। তাঁর 'সন্ধ্যামাল
নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে তিনি কবি এবং ভালো কবি। যুগের সমস্যা ও তথাকথি
বিপ্লববাদের ভানকেই যাঁরা কবিত্বের চরম প্রকাশ বলে জানেন, তাঁদের কাছে 'সন্ধ্য
মালতী' হয়তো বিশেষ মর্যাদা পাবে না, কিন্তু কবিতার মধ্যে কবিতার রস ও সৌন্দ
যাঁরা আস্বাদন করতে চান, 'সন্ধ্যামালতী' তাঁদের ভালো লাগবে।

'সন্ধ্যামালতী' কাব্যের সব থেকে ভালো ও উল্লেখযোগ্য কবিতা হ'লো তার সনে
গুলি। এমন মিষ্টি এবং হৃদয়ভরা সনেট বাঙলা কাব্যসাহিত্যে খুব কমই আছে ব
মনে করি। 'চপল যৌবন করে শুধু যাই-যাই', 'জানি না আবার এই দুর্লভ জ
হবে কিনা,' 'নিদ্রার মতন তুমি,' 'সে কথা শোনেনি কেহ—শুনেছে কেবল রাকাশ
সুশোভনা'—প্রভৃতি সনেট পদগৌরবে ও অর্থবিন্যাসে এবং সর্বোপরি রসমাধুর্যে অনবদ্য
সকল কবির হাতে সবজাতের কবিতা খেলে না—আশুবাবু যদি সব ছেড়ে শুধু সনে
নিয়েই কেবল পরীক্ষা করেন, আমার মনে হয়, বাঙলা কাব্যে তিনি সম্পূর্ণ একটি সুন
অধ্যায় যোজনা করতে পারবেন।

'সন্ধ্যামালতী'-র অন্যান্য কবিতায় traditional school-এর দোষগুণ সবই আছে
রীতি ও রূপের বিচারে সেগুলি খুবই সেকেলে ধরণের। কবিতা হিসাবে উত্তীর্ণ হয়ে
বলে মনে করি না। সেকেলে হলেই যে তা মন্দ হলো, এমন কথা আমরা বলিনে।
সত্যকার কবিতা, তা সেকালের হ'য়েও একালের, আবার একালের হ'য়েও ভবিষ্য
কালের। আশুবাবুর সেই সমস্ত সেকেলে ধরনের রচনা আমাদের ভালো লাগেনি—যেগু
অকৃত্রিম একটি হৃদয়াবেগের প্রতিচ্ছবি মাত্র হয়েছে, কবিতা হিসেবে উত্তীর্ণ হ'তে পারেনি
উদাহরণস্বরূপ 'পুরস্কার,' 'কে ?' 'নিশীথে,' 'স্মরণ,' 'অন্তর্হিতা,' ও 'গঙ্গাতীর' প্রভৃতি
রচনার নাম করা যেতে পারে। এগুলিকে কবিতা না বলে পদ্য নাম দেওয়া যেতে পারে।

'সন্ধ্যামালতী'-র বেশির ভাগ কবিতাই রসোত্তীর্ণ সুন্দর রচনা। নিঃসন্দেহে বলা যা
traditional school-এ প্রথম বেঞ্চে সন্ধ্যামালতী তপোবন কন্যা শকুন্তলার কৃচ্ছ্র সাধন
অতি পিনদ্ধ বল্কলভার ও অসামান্য রূপ ও লাবণ্য নিয়ে বসে আছে।

সাহিত্যপ্রবাহ—অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
এ. মুখার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। দাম তিন টাকা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকই শুধু নন, একজন সত্যকার কবি এবং শক্তিমান সমালোচক। আলোচ্য গ্রন্থ 'সাহিত্যপ্রবাহ' তাঁর অসংখ্য গদ্য রচনার কয়েকটি সংগ্রহ। এতে 'কাব্যকথা', 'জীবন', 'জাপানী কবিতা' ও 'আধুনিক বাঙলা কবিতা' প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। গোবিন্দচন্দ্র দাস, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি হাফিজ, কবি ইকবাল প্রভৃতি বিখ্যাত কবির প্রতিভা সম্পর্কিত আলোচনা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের মানসী, সোনার তরী, রক্তকরবী প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ উপকারে আসবে। ধীরেনবাবুর গদ্য কবিতার মত মধুর ও কল্পনার রসে স্নিগ্ধ। পাণ্ডিত্য ফলাবার এতটুকু ইচ্ছা তাঁর রচনাকে ভারাক্রান্ত করেনি—যদিও তাঁর রচনাপাঠে স্বতঃই বোঝা যাবে, সেগুলি ভাবুক কোন বিদগ্ধজনের সৃষ্টি। কোথাও কোথাও তাঁর গদ্যকথা গদ্য-কবিতার লালিত্য আনে বহন করে। কাব্যকথা নামক প্রবন্ধের শেষাংশ একটু সাজিয়ে লিখলেই কবিতার আকার ধারণ করতে পারে।

মুখবন্ধে ধীরেনবাবু বলেছেন—'প্রধানতঃ আমি সমালোচনার ছলে সাহিত্য-রস উপভোগের আনন্দই প্রকাশ করতে চেয়েছি।' এ উক্তি যে কত গভীরভাবে সত্য, তাঁর রচনাগুলির মধ্যে দৃষ্টি দিলেই হৃদয়ঙ্গম হবে। জ্ঞান নয়, আনন্দই তাঁর আলোচনার প্রাণ-স্পন্দন। গ্রন্থখানি ইতঃমধ্যেই সমালোচক ও পাঠকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

মাধুকরী—কবিতার বই। শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত। এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

কবি শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত রচিত 'মাধুকরী' পাঠ ক'রে আমরা খুসী হয়েছি। কবি সুধীরকুমার বালক বয়স থেকেই কবিতা লিখছেন—তাঁর 'আলেয়ার আলো,' 'মাটির মাধুরী,' 'বাসাবর' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রসিক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। আজও তিনি জনসাধারণের কাছে কবিরূপে সুপরিচিত হননি, তার কারণ তাঁর কবিতায় তথাকথিত বাস্তবধর্মিতা নেই। তাঁর কবিতার ভাষা ও কৌশল বহুলক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী। কিন্তু এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, তাঁর কবিতাগুলি কবিতাই হয়েছে—কবিতার মাঝে অন্য কিছু হয়নি। যতদূর মনে হয়—'মাধুকরী'ই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য। 'স্বর্ণশিল্পী,' 'রাজা ও রাণী,' 'রূপের পুরী' প্রভৃতি কবিতা বাঙলা কাব্যসাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর

রচনারূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য। 'মাধুকরী'-র কবিতাগুলি বিদগ্ধ রসিক সমাজকে আন
দেবে বলেই আমাদের ধারণা। সুধীরকুমার যে সত্যকার কবি—এ বিষয়ে আমাদে
কোনই সন্দেহ নেই।

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যা

প্রতিবেদন

রবীন্দ্র-পাঠচক্র :

রবীন্দ্র-পাঠচক্র আশুতোষ মহাবিদ্যায়তনের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। সূর্যমুখীর মত সত্য-সুন্দর ও শিবের অর্চনাই এর লক্ষ্য; ভবিষ্যতের বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি নিয়ে একদল তরুণ সাহিত্যিক গড়ে তোলাই এর কাম্য। আমরা রবীন্দ্রনাথের নামে সাহিত্যজগতে তাঁর উত্তরসাধক হওয়ার সাধনা করব। যা কিছু অসত্য, যা কিছু অসুন্দর তাকে বর্জন করব নির্মম ভাবে।

'লিপিকা' আমাদের মুখপত্র। সম্পাদনা করছে শ্রীঅধীর মল্লিক। কমনরুমের সাপ্তাহিক প্রাচীর পত্রের ইতিহাসে নতুন কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি আছে এই ছোট অথচ বলিষ্ঠ পত্রিকাটিতে। লিপিকা প্রতি বুধবারই নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রতি এর একটি ফটো-সংখ্যা এবং কবিতা-সংখ্যা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র-পাঠচক্রের উদ্যোগে নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে একটি আলোচনা হয়েছিল। রুগ্‌ণ দুঃস্থ অগ্নিবীণার সাগ্নিক কবি, তবু প্রাণ তাঁর সমস্ত দৈন্যের ঊর্ধ্বে। মুষ্টিমেয় সাহিত্যানুরাগী ছাত্র সম্মিলিত হয়ে নজরুল সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন অধ্যাপক শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় কবিতা পাঠ, আবৃত্তি এবং বক্তৃতা হয়েছিল। পরিশেষে অধ্যাপক শ্রীযুত সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় নজরুল সম্বন্ধে দীর্ঘ অথচ মনোজ্ঞ একটি আলোচনা করেন। এরকম আরও সাহিত্যসভা করার ইচ্ছা রইল আমাদের।

শ্রীযুত সুকুমারবাবুর প্রস্তাবানুযায়ী আমরা একটি রচনা ও কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করছি।

রবীন্দ্র-পাঠচক্রের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুত অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পেয়েছি আমরা অমেয় অনুপ্রেরণা।

যাঁরা আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, পৃষ্ঠপোষক এবং সাহায্যকারী ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের ছোট করব না।

শ্রীবাসুদেব
সম্পাদক

প্রাচীর-পত্র :

'প্রাচীর-পত্র' আশুতোষ কলেজের সাংস্কৃতিক জগতের একটি জ্যোতিষ্ক। সংস্কৃ
ও কৃষ্টির পথে সবকটি প্রাচীর-পত্রের সঙ্গে এই প্রাচীর-পত্র কয়েক পদ অগ্র
হয়েছে এই কয়েক বছরে। প্রথমেই পূর্বতন সম্পাদক শ্রীব্রহ্মপ্রসাদ গাঙ্গুলীকে জানাই ধন্যবা
তাঁর হাত থেকে প্রাচীর-পত্রের ভার আমরা সঙ্কোচভরেই গ্রহণ করেছি—জানি
সফলতার পথে কতদূর এগিয়ে যেতে পারবো।

'প্রাচীর-পত্র' একটি সাপ্তাহিক পত্র। চিত্র, আলোকচিত্র, প্রবন্ধ, কবিতা ও গ
প্রভৃতি শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় এই সাপ্তাহিক নিযুক্ত।

প্রাচীর-পত্র পরিচালনায় একটি উপসমিতি গঠিত হয়েছে—
আযুক্ত অধ্যাপক শ্রীযুত অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় এম. এ., মানস রায় চৌধুরী, শ্রীবাসুদে
প্রদীপ দাশগুপ্ত, রমেন্দ্র হালদার, দেবীপ্রসাদ পাঠক, অমল ভট্টাচার্য, সুবীর বসু
তীর্থরেণু চন্দ্র।

প্রাচীর-পত্রের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়কে তাঁর অকুণ্ঠ সাহায্য
ও উপদেশের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রচ্ছদশিল্পী মানবেন্দ্রকে জানাই ধন্যবাদ।

বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য করার জন্য সুব্রত ও পরিমলকে জানাই অজস্র
ধন্যবাদ। এদের সাহায্য ছাড়া প্রাচীর-পত্র প্রকাশ প্রায় অসম্ভবই ছিল।

প্রাচীর পত্রিকাগুলিতে লেখা প্রায়ই পাওয়া যায় না। কলেজের ছাত্রদে
মধ্যে সাহিত্যিক উদ্দীপনা, মনে হয়, যেন স্তিমিতপ্রায়। তাই আজ সাহিত্যানুরাগী
ছাত্রদের আহ্বান জানাই।

গ্রীষ্মের ছুটির পরে একটি প্রাচীর-পত্র প্রদর্শনী করার ইচ্ছে রাখি।

শ্রীসুবীর বসু
সম্পাদক

কৃষ্টি-পরিষদ :

কৃষ্টি-পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণ করে মনে হয়েছিল কি করে বইব এ গুরুভার।
তবু দায়িত্ব নিয়েছিলাম মাথা পেতে, সহকর্মীদের সহায়তা আর অধ্যাপকের আশীর্বাদের
কথা স্মরণ করে।

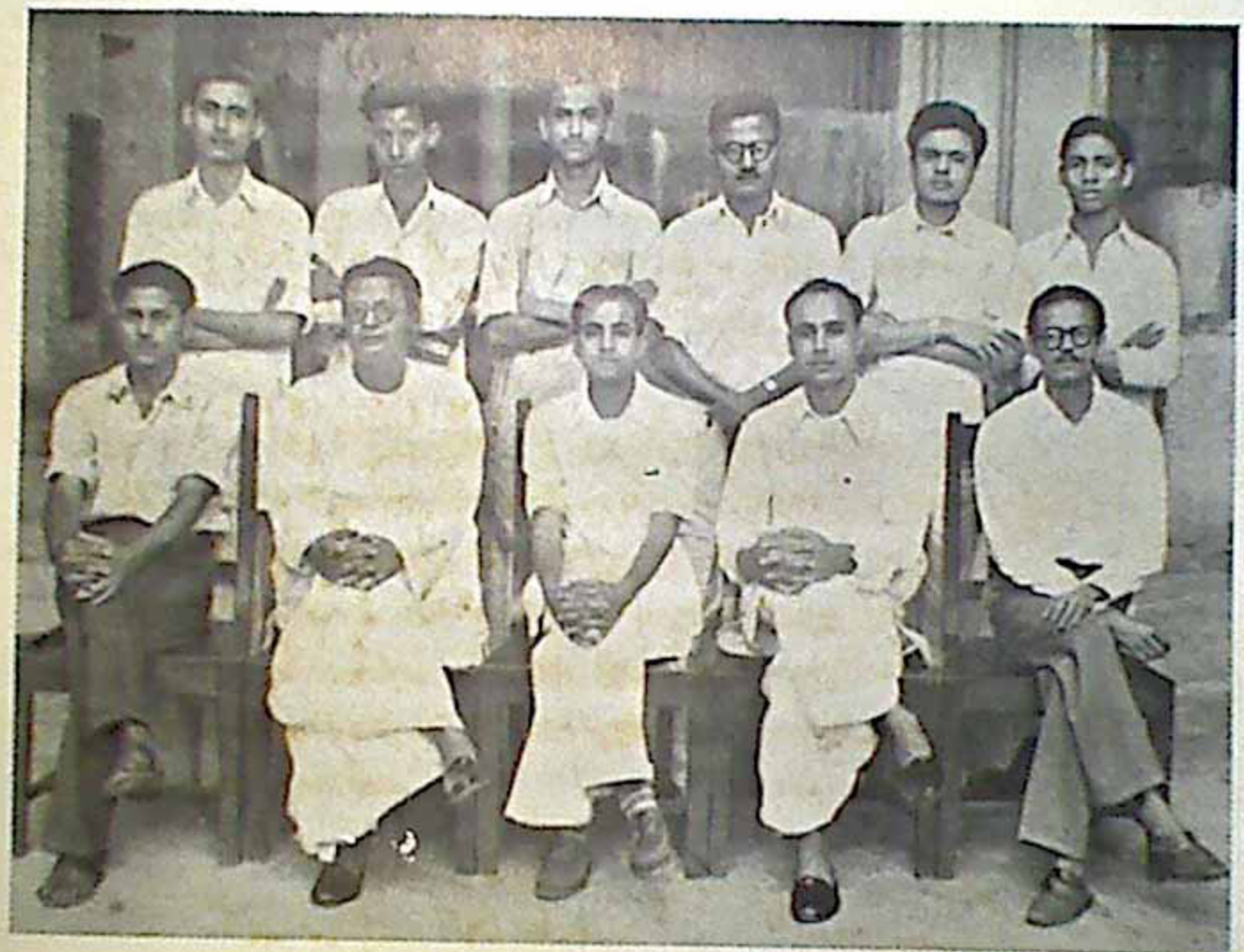

Asutosh College Table Tennis Team, 1953.

Winners of Inter-Collegiate Table Tennis Tournament, 1953

Sitting—(L-R)—S. Ghosh (Capt.), Pof. J. N. Chakrabarty (Prof.-in-charge of Common Room), D. P. Chatterjee (Secy.), Prof. S. Mukherjee (Prof.-in-charge of Games), and D. Biswas.

Standing—(L-R)—A. Das Gupta, D. Roy, H. Guin (Vice-Captain), B. Banerjee, P. Banerjee, and N. Guha Thakurta.

SPORTS & GAMES

SANTO SINGH KHATRA

WINNER OF 800 METRES, 150
METRES AND 5000 METRES
THE INTER COLLEGIATE SPO

ASUTOSH
COLLEGE
BLUE
1953

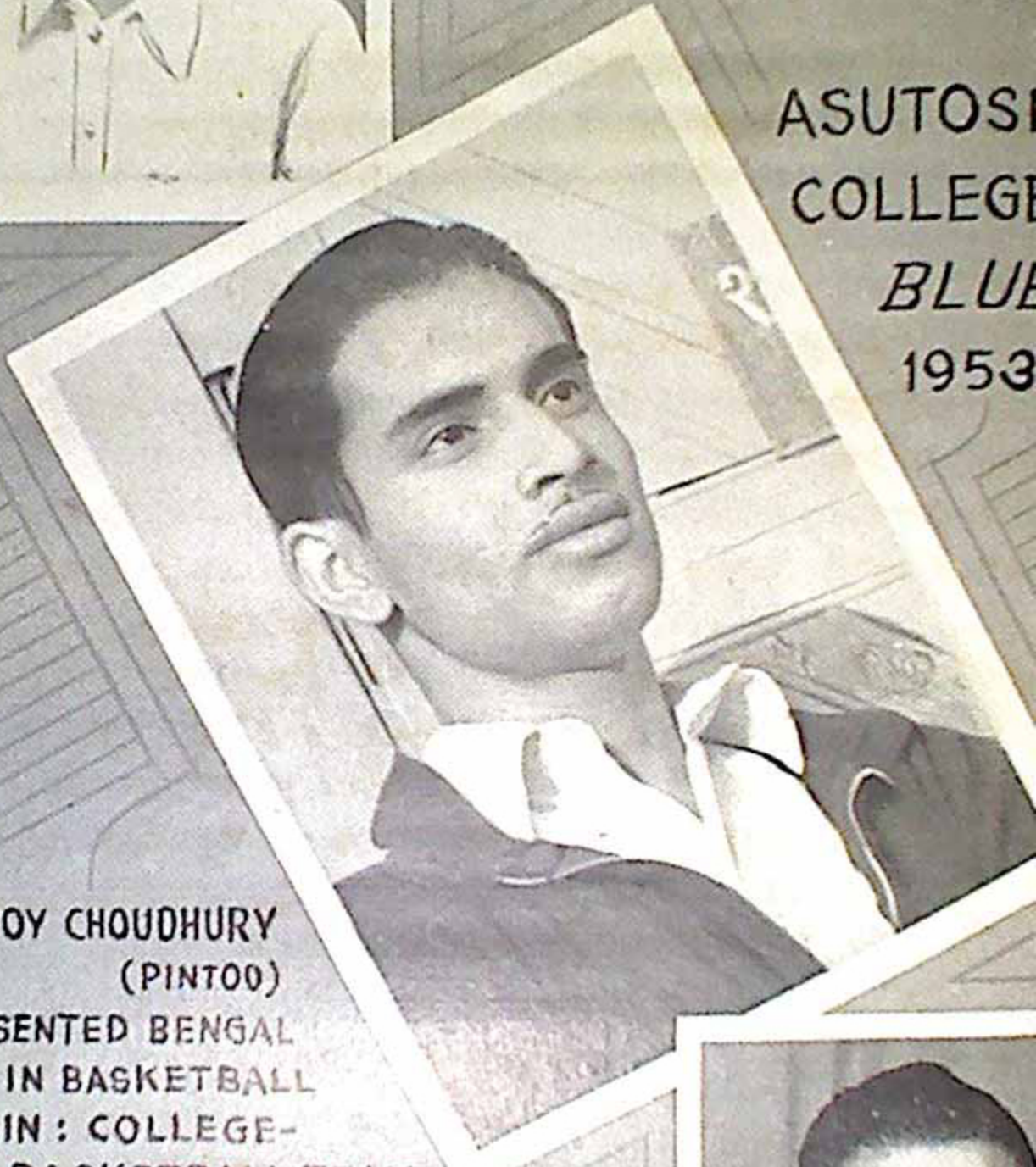

RITEN ROY CHOUDHURY
(PINTOO)
REPRESENTED BENGAL
IN BASKETBALL
CAPTAIN : COLLEGE-
BASKETBALL TEAM
1953

কার্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এল সরস্বতী পূজা। আমাদের ইউনিয়ন সম্পাদক শ্রীতীর্থরেণু চক্রের সুষ্ঠু পরিচালনায় আমরা কলেজের ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে পেরেছি।

এর পরেই এলো, নেতাজীর জন্মদিবস। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সভাপতিত্বে ও রাণী ঝান্সী সেবিকা বাহিনীর সাহচর্যে এ অনুষ্ঠানটি এতই সুন্দর হয়েছিল যে কলেজের ইতিহাসে এটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তার পরের অনুষ্ঠানটি হলো গত পনরই মার্চের, বসন্ত-মিলনোৎসব। সম্পূর্ণ নূতন এই পরিকল্পনাটি সফলতা অর্জন করতে পেরেছিল একমাত্র ইউনিয়নের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীপরিমল করের একান্ত প্রচেষ্টায়।

এ বছরের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা (ইংরেজী ও বাংলা) শেষ হয়েছে এবং শীঘ্রই প্রবন্ধ, ছোট গল্প, কবিতা এবং ফটোগ্রাফী প্রতিযোগিতা শুরু করছি।

বিভাগীয় কার্যে নানা ভাবে সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি শ্রীসুবীর বসু, ক্ষীরোদরঞ্জন চক্রবর্তীকে এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বিভাগীয় আযুক্ত অধ্যাপক শ্রীসুনীলকুমার সিদ্ধান্তকে।

শ্রীমলয়কুমার ঘোষ
কৃষ্টি-সম্পাদক

কমনরুম :

এই বিভাগের কার্যভার পেয়ে আমি বেশ একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। অবশ্য এই গুরুভার বহনে সাহায্যের জন্য বহু ছাত্রই এগিয়ে আসেন এবং আমাদের ইয়ুনিয়ন আমার কাজে সহায়তার জন্য একটি উপদেষ্টা সমিতি গঠন করেন। তারপর থেকে আমাদের প্রত্যেক কাজই এই উপদেষ্টা সমিতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

আমাদের কাজ সুরু হলো কমনরুমের স্থানাভাব দুরীকরণ দিয়ে। সত্যই কমনরুমে ছাত্রদের অত্যন্ত স্থানাভাব ঘটত এবং হলের উপরকার বারান্দাটা পেয়ে আমাদের খুবই সুবিধে হয়েছে। এজন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

এবার আমরা একটি 'টেবিল টেনিস্' ও একটি 'ক্যারাম' প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করি। এই দুটো প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায় এবং

ছাত্ররা কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর খেলা দেখবার সুযোগ পায়। নীচে প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম দেওয়া হলো।

টেবিল টেনিসে: প্রথম—হিমাংশু কুমার গুইন, দ্বিতীয়—নিরূপ গুহঠাকুরতা, তৃতীয়—অনিল দাসগুপ্ত।

ক্যারামে: প্রথম—রবীন্দ্রনাথ হালদার, দ্বিতীয়—প্রভুদাস চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয়—সুনীল ঘোষ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে যে আন্তঃকলেজ টেবিল টেনিস্ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, তাতে এই প্রথম আমাদের কলেজের দল যোগদান করে এবং তারা ফাইন্যালে কৃতিত্বের সঙ্গে চারুচন্দ্র কলেজকে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তাঁরা হলেন—সমীর ঘোষ, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, সীতিশ বিশ্বাস, হিমাংশু গুইন, প্রশান্ত ব্যানার্জি, নিরূপ গুহঠাকুরতা, এবং অনিল দাসগুপ্ত। এঁদের প্রত্যেককে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমাদের কমনরুমের পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা চার হাজারের কাছাকাছি এবং ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধিলাভ করবে বলে আশা রাখি। পাঠাগারে প্রত্যেক বহুল-প্রচারিত মাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও সাময়িক পত্র রাখা হয়। আরো নতুন কয়েকটি পত্রিকা এ বছর থেকে নেওয়া সুরু হয়েছে।

আমাদের কাজে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে। তিনি অমূল্য সময় নষ্ট করে ও মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করলেন।

শ্রীক্ষীরোদরঞ্জন চক্রবর্তী
সম্পাদক

ছাত্রাবাস সংবাদ

আশুতোষ কলেজ ছাত্রাবাস

১৬, বসন্ত বসু রোড

বছর দুই আগের এক সন্ধ্যায় যখন এই ছোট্ট বাড়িটিতে এসে উঠি তখন মনের মধ্যে চলছিল এক অদ্ভুত আশা ও অনুভূতির খেলা। ছাত্রাবাসে পদার্পণ এই প্রথম আমার নয়, তবুও অপরিচিত এতগুলো ছেলের সঙ্গে কি করে নিজেকে মানিয়ে নেবো এই সমস্যাটার কোন সমাধানই খুঁজে পাচ্ছিলুম না।

মাত্র একান্ন জন ছাত্র নিয়ে আমাদের এই ছাত্রাবাস। সংখ্যা হিসেবে এটা নগণ্য নয় সত্যি, তবুও স্থানীয় অন্যান্য ছাত্রাবাসের ছাত্র সংখ্যার তুলনায় যে সামান্য এটা স্বীকার করতেই হবে। এই সামান্য সংখ্যক ছাত্র নিয়েও কোন কাজেই সে পিছিয়ে নেই।

ছোট্ট এই ছাত্রাবাসটির পরিবেশও চমৎকার। এরই মধ্যে আছে নানা জাতের ও নানা ধরনের একান্ন জন ছেলে। একটা আদর্শ ছাত্রাবাসে যে সব জিনিষ থাকা একান্ত দরকার তার অনেক কিছুর অভাবই আমরা বোধ করি। তা সত্ত্বেও যা আমাদের আছে সেগুলো রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা আমরা করেছি। ছোট্ট একটা পাঠাগার ও খেলার কিছু সরঞ্জাম আমাদের ছিলই। তবে এ বছরে পাঠাগারের বইএর সংখ্যা কিছু বেড়েছে। আর তাছাড়া প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কিছু জিনিষপত্রও রাখা হয়েছে। গত মরসুমে ফুটবল ও ক্রিকেটের দিকে ছেলেদের প্রচুর উৎসাহ দেখা গেছে। এটা উত্তরোত্তর বেড়ে চলবে বলেই বিশ্বাস করি কারণ আমাদের অধীক্ষক মহাশয়েরও এদিকে প্রচুর উৎসাহ দেখেছি।

ছোট বড় নানা ধরনের উৎসব আনন্দের মধ্যে সরস্বতী পুজো, দেওয়ালি উৎসব ও নেতাজীর জন্মোৎসব অন্যান্যবারের চেয়ে ভালভাবেই উদ্‌যাপিত হয়েছে। দেওয়ালি উৎসবের দিন আমাদের ছাত্রাবাসকে আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল।

এছাড়াও প্রতিবারের মতো আমরা একসঙ্গে বনভোজনে গিয়েছিলুম; তবে ব্যতিক্রম হয়েছিল জায়গা নির্বাচনে। বোটানিক্যাল গার্ডেনের সেই একঘেয়েমিটাকে ছাড়াতে আমরা গিয়েছিলুম ডায়মণ্ড হারবার, আর এই রকম দুরপাল্লার পাড়িতেও সঙ্গে পেয়েছিলুম মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে ও অধ্যাপক মহাশয়দের অনেককে। এবারের যাতায়াতে সকলেই প্রচুর আনন্দ পেয়েছে।

আমাদের সব কাজেই আমরা পরিপূর্ণ সমর্থন ও উৎসাহ পেয়েছি আমাদের ছাত্রাবাসের অধীক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে। কাজেই আমাদের আর বিশেষ কোন অসুবিধে ভোগ করতে হয়নি। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর ঋণ শোধ করতে পারব না।

আজ মনে পড়ছে অনেক ঘটনা এলোমেলো ভাবে। সব গুছিয়ে লিখে সকলের সামনে তুলে ধরবার ক্ষমতা আমার নেই।

শ্রীনারায়ণ রাজ চক্রবর্তী
সাধারণ সম্পাদক

ASUTOSH COLLEGE
Magazine

Vol. XXVIII * **1953**

Professor-in-charge
Dr. BIJANBIHARI BHATTACHARYA
Editor:
DULAL DAS

ASUTOSH COLLEGE MAGAZINE

Twenty-eighth Year of Publication

Contents

A Blessing fro n our Ex-Principal		
Editorial Notes	...	1
Five Year Plan : Its Pros and Cons	Parimal Kumar Mo okerjea	8
Report of the Finance Commission	ENKEBEE	14
Anomalies in our Educational System	Prof. A. D. Mukherjee	19
Tit for Tat	Sri Sadananda Mandal	23
Nationalism vs Internationalism	Debi Prosad Pathak	24
The Flame-Thrower	U/O Hironmoy Ray	30
College Notes :		
The Report of the Students' Union	--	32
A Valedictory Address	--	35
The Report of the Sports and Games (1952-53)	--	36
The Report of the Debating Committee	--	40
The St. John Ambulance Brigade (India)	--	40
N. C. C. and our Boys' Role in it	Capt. J. C. Banerjee	42
Hostel Notes :	--	
Asutosh College New Hostel	--	44
Miscellany :		
Important Additions to the Library	--	46
Our Contemporaries	--	50
Stop Press	--	51

Art Plates :

Four University Blues, Calcutta University Blues, Students' Council, Football Team, Athletic Team, Volleyball Team, Cricket Team, Go-as-you-like, Our Cover Photo and B. Coy. Boys.

A Blessing from our Ex-Principal

28. 4. 1953

Work is the basis of all success in life.

P. Sinha

RABIN GUHA (NANTA)
FOOTBALL

BIRESWAR GHOSH
(BABLOO)
CRICKET
CAPTAIN :
COLLEGE CRICKET TEAM
1953

ARUN MITRA
FOOTBALL-1951-5
CAPTAIN : CALCUTTA UNIVERSIT
FOOTBALL 1952
CAPTAIN : { COLLEGE FOOTBALL-1951
COLLEGE HOCKEY-1952-5
VICE CAPTAIN { CRICKET-1952-53
ATHLETICS-1953

AMAL SEN

CALCUTTA UNIVERSITY BLUES

GAUTAM DAVAR
TENNIS

SUBODH SEN (BI
FOOTBAL

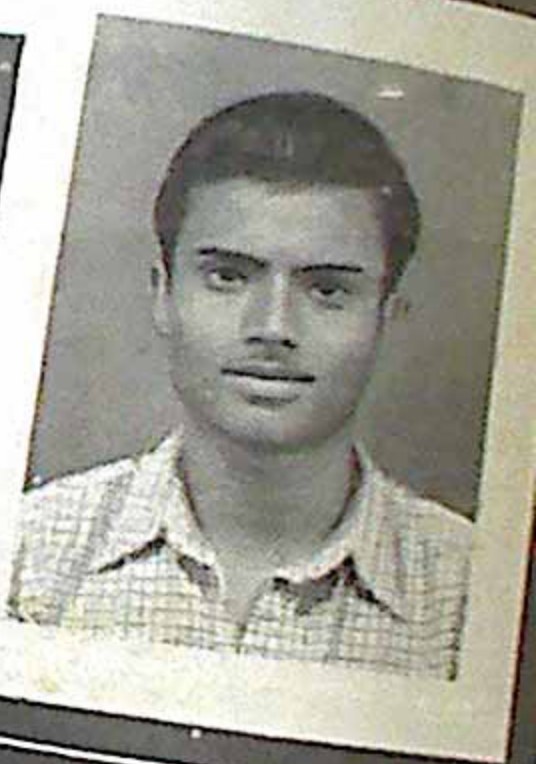

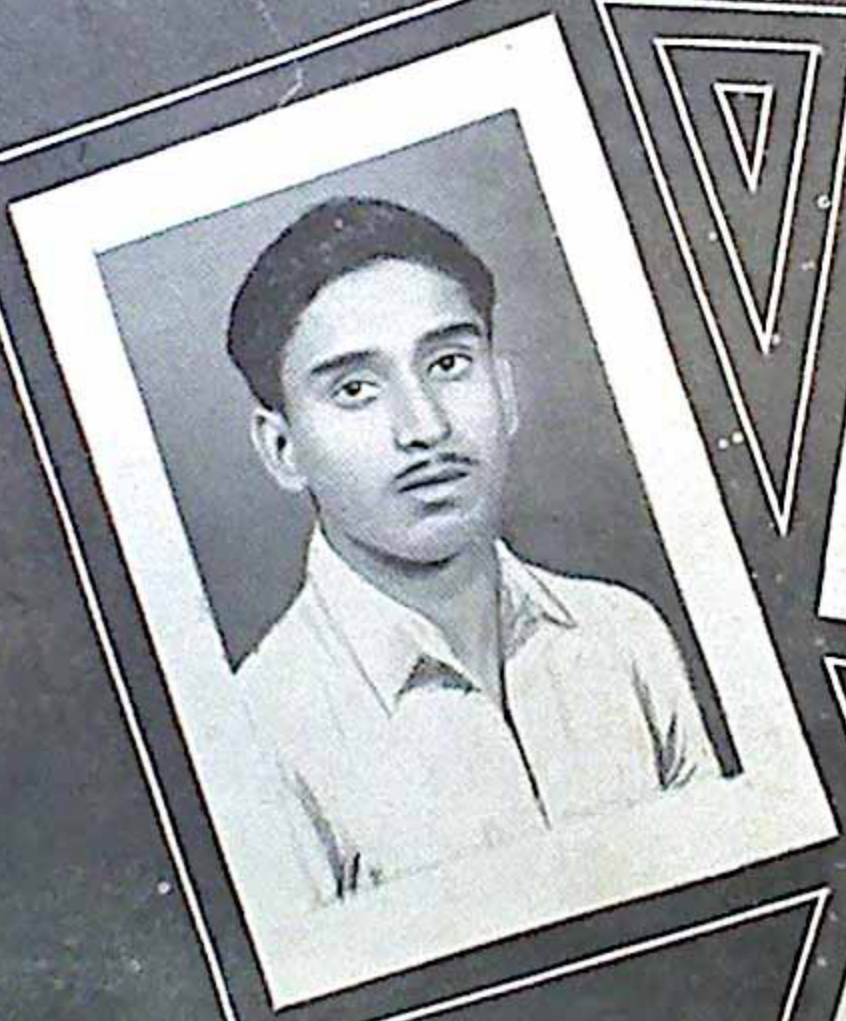

PRODYUT MITRA (PADMA)
FOOTBALL

ASUTOSH COLLEGE
Magazine
VOL. XXVIII * * * * * 1953

Editorial Notes

It is a matter of profound gratification to us that in spite of his serious preoccupation with affairs of grave moment our illustrious President, Dr. Syama Prasad Mookerjee, has snatched a few moments to remember the students of Asutosh College. This year too he has been very kind to send us an inspiring message charged with the wisdom and experience of the greatest educationist of our time; his words have a ring of prophecy about them. They come as an irresistible call to action, and thrill the souls of students as they conjure up the vision of a glorious future.

• • • •

It does our heart good to find that our Ex-Principal, Sri Panchanan Sinha, has sent us his affectionate blessings. Principal Sinha devoted his whole life to the service of this institution. He has been so much a part of Asutosh College that it is difficult to think of this institution as something separate from him. These words of Principal Sinha seem to whisper the enchantment of the days that are no more. The message is brief, but it breathes the ideal of a true *Karmayogin*. The words, though few, possess a unique charm of their own.

• • • •

A little less than thirty years have passed since the first issue o the Asutosh College Magazine was published under the editorship of Prof. Mohini Mohan Mukherjea. It was then a slender volume but it had an ambitious future before it. Since then it has been the organ of the students; its pages have been enriched by their maiden contributions. As we look back we see several outstanding literary figures who were at one time or other our students. We bow down our head to the past with its glorious traditions. It will be our earnest endeavour to maintain the age-old traditions.

In this connection we express our wholehearted gratitude to Sri Premendra Mitra, Sri Achintya Kumar Sengupta and Sri Sushil Jana, the distinguished ex-students of our College. As a token of love and affection for their 'Alma Mater' they have very kindly contributed to this issue of the College Magazine. We are glad to remember the association of our College with these prominent personalities of modern Bengali literature.

* * * *

A very keen controversy is raging at the present moment in different spheres of life over the future of English in India. Should English be retained as one of the major subjects ? Some people are in favour of its retention because of the fact that it is this language that played a vigorous role in awakening national consciousness in the country. English has made an immense contribution to the progress and renaissance of our nation. It has fostered a spirit of unity in diversity among different states. Besides it is an international language which is capable of giving expression to delicate shades of meaning. In the modern world in which India hopes to play a vital role, English is indispensable.

We need not, on the other hand, go into the details of the arguments advanced by the advocates of Hindi as a state language. That Hindi or any other Indian language has yet to be developed in order that it may become an effective substitute for English is no argument for retaining English. The problem before the country to-day is how soon we can develop a language to replace English. This language

for the future, call it Hindi or by any other name, should absorb and assimilate elements from most of the state languages. It should be rich in its vocabulary and in flexibility of its syntax. It should be capable of giving expression to the subtlest filament of human thought. We cannot discard English until and unless we can develop such an effective substitute. We must not be so vehement in our denunciation of English. We cannot switch over to Hindi or to any other state language overnight.

We may note here that we have received very few contributions in English. This tendency of ignoring English should be judged in the light of the present controversy.

• • • •

Potti Sriramulu is dead. He was a Congressman. At the age of fifty-one he undertook a fast unto death for fifty-eight days. He laid down his life so that the twenty-one million people of Andhra might have a separate state of their own. The object of his fast was to bring a moral pressure upon his colleagues in the Congress, and to persuade them to fulfil a thirty-two year old pledge given by the Indian National Congress at its Nagpur Session on December 26, 1920. The Union Government have since taken a decision in favour of the formation of the Andhra State. And the Andhra State will come into existence as a new State on the map of India in the first week of October, 1953.

We wholeheartedly associate ourselves with the sentiments of Shri Jawaharlal Nehru when he expressed his grief and sorrow at the passing of a noble soul like Sriramulu. We expect that the tragic death of this great martyr will induce the Congress and the Union Government immediately to take up the general question of the formation of states on a linguistic basis. This is no new problem. It is the same and old problem. The Congress is morally bound to implement the decision taken at the Nagpur Session in 1920. Regarding the formation of linguistic states Dr. Rajendra Prasad, the President of India, said, "Keeping financial and administrative factors in view there is no reason why the question of the re-organization of the states should not

be considered fully and dispassionately so as to meet the wishes o the people and help in their economic progress."

We earnestly hope that the Congress and the Governmer will think of West Bengal and her various problems in th present context.

* * * *

The percentage of passes among the candidates appearing i the last Intermediate Examination from our college has been quit satisfactory. We are glad to note that our college has succeeded in maintaining the remarkable record it set up in the past.

* * * *

It gives us great pleasure to note that Sri Debabrata Mukherjea who had been a Professor of English at our College for twenty-five years, has been appointed a Judge of the Calcutta High Court. We offer our sincere felicitations to Justice Mukherjea.

* * * *

The First Five-Year Plan of India has just been finalised and the problem of implementing the different parts of the same now faces the country. In a New Year's Day broadcast Shri Nehru said, "I invite all of you to become partners in this great enterprise of building a new India." The estimated total cost of this Plan is Rs. 2068.78 crores. The Plan covers every field of national enterprise. Agriculture, Community Projects, Irrigation and Power, Transport and Communication, Industry, Social Service and Rehabilitation have received an adequate share of attention. According to the Planning Commission, if the Plan is successfully implemented India's per capita income will be doubled at the end of 27 years, i. e., by 1977.

We hope with the blessings of God the First Five-Year Plan will be a success.

* * *

The slogan, 'Land for the Landless' is being translated into reality on a large scale by Acharya Vinoba Bhave. He is a true disciple

of Mahatma Gandhi. His ways are the ways of peace and gentleness. His approach is in perfect keeping with the age-old traditions of India. By initiating his 'Bhoodan-Yajna' movement he is bringing about a silent but mighty revolution in the life of the Indian people. It is a revolution without its blood and terror. The movement is gaining ground every day. Recently a 'Bhoodan-Sammelan' was organised under the presidentship of Dr. S. Radhakrishnan, the Vice-President of India. Acharya Bhave has set before himself the noble task of acquiring twenty-five million acres of land for the landless sons and daughters of India.

May God bless the noble efforts of this great son of India.

• • •

On the 16th April, 1953, the Indian Railways completed the 'hundredth year' of their existence. The occasion was celebrated by holding a 'Centenary Exhibition' in New Delhi. The story of the Indian Railways reads like a romance. As far back as in 1844, a proposal for the construction of a railway in India was made to the East India Company. The first twenty-two miles of railway were completed by 1853, and on the 16th April of that year the first railway train ran from Bombay to Thana. The rail links between Calcutta and Delhi were established by 1875.

• • •

On the occasion of the 'Silver Jubilee' of the discovery of the Raman Effect Dr. C. V. Raman was felicitated by the Osmania University. Replying to the felicitations the Nobel-Laureate of India related a very remarkable episode. In a reminiscent mood the distinguished scientist said that on the night of February 28, 1928, when he discovered the Raman Effect the only assistant he had in his laboratory was Sri Ashutosh Dey whom he described as the emblem of complete selflessness. It was Sri Dey who set up a very powerful quartz-mercury arc used for optical investigation and put up a large condenser to focus the light and to perform other experiments. The experiment proved successful and Raman and Dey worked till the late hours at night. Paying a tribute to Dey's services Raman said, "I remember when I came back to Calcutta from Stockholm,

Ashu Babu asked me to present him with the fountain-pen with which I had signed the official receipt for the Nobel-Award. I gladly gave the pen to him if only because he was the man who was with me in the dark room that night, and helped me to make the observations thus recognised by the Nobel Foundation."

We are glad to learn from Dr. Raman that the services of a Bengali assistant were of some use to the great scientist in making his famous discovery.

* * *

The death of Sri Nalini Ranjan Sarkar removes a colourful personality from the sphere of commerce and industry in India. From a humble position in life he rose to be one of the foremost business magnates of our time. With little or no advantage of University education he came to possess a wide knowledge of finance. During the British regime at one time he became a member of the Viceroy's Executive Council. He resigned this post in 1943, when Mahatma Gandhi undertook a twenty-one-day fast in the Aga Khan's palace at Poona. Before the last General Election he was Finance Minister of West Bengal. As a member of the Partition Council he rendered valuable services to West Bengal. But it was as the principal architect of the Hindusthan Co-operative Insurance Society that he rose to the height of his stature. Bengal has reasons to be proud of this institution which has its branches almost in every important city in India. The phenomenal growth of this Insurance Society is in itself an eloquent tribute to the genius of Sri Nalini Ranjan Sarkar.

* * *

Premier Stalin is dead. A giant among men has fallen. He was the builder of modern Russia. His name will go down as one of the greatest makers of history. His death is mourned by millions all over the world.

We humbly associate ourselves with the glowing tribute paid to the genius of Stalin by our Prime Minister Shri Nehru.

* * *

In bringing out this issue of the College Magazine we have received every form of help and assistance from Prof. Suresh Chandra

De who has kindly taken all sorts of pains and troubles. We express our gratitude to him.

We acknowledge our debt of gratitude to our respected professors, Sri Amulyadhan Mukherjea, Sri Manibhusan Sanyal, Sri Sailaja Kumar Bhattacharya, and Sri Bishnupada Dasgupta.

We must not forget the kind help that has been ungrudgingly extended to us by an able and experienced expert like 'ENKEBEE'.

We take this opportunity to pay our tribute of respect and reverence to Dr. Bijanbihari Bhattacharya who as Professor-in-charge has very kindly given us the widest latitude to exercise our own judgment in the matter of bringing out this issue of the College Magazine. It is really a pleasure and privilege to work under his guidance.

Lastly we convey our deep sense of gratitude to our revered Principal Sri Someswarprasad Mukherjea for the encouragement and inspiration that we have consistently received from him.

May the genius of Sir Asutosh light our path in the deepening gloom that encircles us today.

JAI HIND.

FIVE YEAR PLAN : ITS PROS AND CONS

Parimalkumar Mookerjea

[A student of Third Year Arts, Econ (Hons.)—Here Sri Mukherjea deals with The First Five Year Plan, which is one of the most outstanding endeavours in recent times to solve the problem of Free India. It is an attempt in the shortest possible compass, to outline its main features without entering into the details, though a critical estimate of the main proposals and the basic principles of the Plan has not been altogether ignored It is needless to add that a detailed examination and analysis of each one of the numerous problems involved is not, and cannot be, attempted here —Editor]

After a decade of exploration, deliberation, and controversy over economic principles the First Five Year Plan emerged as a finished product by the end of 1952. It is regarded as a landmark in the annals of our national development. The most salient feature of this Plan is that the basic approach to the problems of our country is characterized by a democratic attitude. It hopes to double India's per capita income at the end of 27 years, i. e., by 1977.

THE PLAN AT A GLANCE

(In crores of rupees)

	Outlay during 1951—56	Percentage of Total Outlay
Agriculture and Community Development	360·43	17·4
Irrigation and Power	561·41	27·2
Transport and Communications	497·10	24·0
Industry	173·04	8·4
Social Services	339·81	16·4
Rehabilitation	85·00	4·1
Miscellaneous	51·99	2·5
Total —	2068·78	100·0

Planned economy is an essential pre-requisite for the rapid development of an under-developed country. The final Five-Year Plan envisages a change in the existing socio-economic structure.

In the words of the late N. R. Sarker, 'The Plan does not envisage a 'sky-scraper' economy but a 'bungalow' economy. The Plan envisages about 11% increase over the level of 1950-51 national income at the completion of the first stage.

The total estimated cost of the Plan is Rs. 2068·78 crores. This money will be provided in the following manner :—

Rs. 738 crores or 35·7% from budgetary surplus or fresh taxation ; Rs. 520 crores or 25·1% from borrowing or other capital sources ; Rs. 521 crores or 25·2% from foreign loans ; and finally Rs. 290 crores or 14% from deficit financing.

Let us now see how far it will be a success in the present day context.

First of all let us take the agricultural portion of the Plan. From the national as well as international point of view agriculture deserves special attention. It is stated that world population increases every year on the average by 1·25%, whereas the increase in agricultural production is only 0·3%. Since India suffers from chronic food-shortage and contributes to the world population in no less a degree, the priority given to agriculture in a pre-eminently agricultural country like India will be acclaimed throughout the length and breadth of the country. The Planners hope to increase food-production by 7· 6 m. tons, cotton production by 1·26 m. bales, and jute production by 2·09 m. bales. The increase in food-production is no lofty aspiration, especially, if we take into account that this year we have begun with a stock of 1·9 m. tons of foodstuffs, and the prospects of food this year are definitely bright. But the enormous increase in the commercial crops at the expense of food is really staggering. When self-sufficiency in food is really the crying need of the hour, the diversion of land, labour and capital towards comfortable self-sufficiency in cotton and jute, under certain national and international market restrictions, may prove to be a boomerang at the end. Moreover as one goes through the voluminous chapter on agriculture in the Report of the Planning Commission one finds much erudition and

statistics. But what pains one is the utter lack of vision and foresight of the Planners. The Father of the nation declared in unequivocal terms that "the land to the tillers" was the first step towards agricultural improvement; the Planners have slyly deviated from that chalked-out path and fallen back upon agency and managerial work to bring about that change!

The community development projects are a singular achievement of the Plan. It is intended not only to raise the level of production but also to raise the standard of community living. Its success entirely depends on the voluntary co-operation of the people.

The poorest sector is the industry. The amount set apart for its growth and development is scanty and utterly inadequate. Moreover the major responsibility of industrialisation of the country has been delegated to the private sector. Private capitalists have thus been given an unlimited field to develop their initiative, judgment, and skill to augment production. But in India, as in other parts of the world, the role of private capitalism has been nefarious. The only propelling force in private capitalism is the profit motive which transcends community and national interests. If you allow the individual to develop the egoism inherent in him, how can you expect his ungrudging co-operation in broader and nobler efforts! The total investment for financing the industrial expansion is estimated at Rs 327 crores, of which the public sector accounts for Rs. 94 crores and the private sector Rs. 233 crores. 80% of the investment of private sector will be in respect of capital goods and producer goods industries. In the case of consumer goods industries, the emphasis is mainly on increased production through fuller utilization of the existing capacity.

Although the Planners have referred to the importance of small-scale and cottage industries in India, they have not given them the proper emphasis that they deserve. It is a bare fact that if rationalisation of agriculture is sought to improve the existing pattern of agricultural fabric, then the development of small-scale and cottage industries on a phenomenal scale becomes a pre-requisite. For the enormous labours that will be released due to rationalisation of agriculture can hardly be absorbed in large-scale

industries. It is to small-scale and cottage industries that the 'idle hours' of millions of Indian peasants should be diverted. Decentralization of industries, rather than centralisation, is suitable for the solution of Indian problems. Capital-intensive industries with its attendant evils may well lead to State-Capitalism even in a Socialist Society. Hence in a Mixed-Economy, as practised in India, its evil consequences will be doubly felt. If the limbs of the body are well-built, only then and then alone the body becomes healthy, strong and vigorous.

By far the best part of the Plan relates to the irrigation and power projects. The programme covers multi-purpose irrigation projects, minor irrigation works, tubewell constructions and, on the hydro-electric side, generation of power from water resources. The irrigation and power projects undertaken by the government will cost about Rs. 2,000 crores to construct, which will add 40 to 45 m. acres to the area now under irrigation and create additional power generation capacity of about 7 m. Kwts. Indeed if this measure can be faithfully implemented then the improvement in the standard of agricultural practice, the promotion of small-scale and cottage industries in addition to large-scale industries will be highly eased up. The first Five Year Plan aims mainly at the completion of the projects under construction in 1951. By the end of March 1951 an amount of Rs. 153 crores was already spent on these projects.

The majority of the Indian people live on a bare subsistence level; hence the question of their saving does not arise. Only the privileged few in India can save and it is these savings that should be mobilized. But alas ! it is indeed a formidable task ! This limitation reacts tremendously on the Plan.

To raise money by fresh taxations and loans from the internal market will be a very difficult task, because the people at present are groaning under the burden of so many taxes ; and naturally their resentment towards the imposition of any new tax can be well appreciated.

The amount of foreign help that is expected may not be forthcoming in the event of any sharp difference of policy between India and U. S. A.—which is not unlikely. The 'scarcity of capital and

skill has to be made up by external assistance. Such assistance is at once a right and a claim created by past and present exploitation of our country by developed countries'. The attitude of the Government of India towards foreign capital is bold and generous. But what we must see is that there is 'no string attached to it'.

Deficit financing or creation of new money is a salient feature of the Plan. The greatest curse of deficit financing is the inflationary condition created by 'new money'. The Planners hope to offset the additional purchasing power created by Rs. 290 crores of new money by goods of corresponding value, which will be imported into the country during this period with the sterling balances that are lying with the Bank of England. It will indeed be successful if the imported goods are all consumer goods : but if there is any amount of capital goods imported against the sterling balances, then the inflationary pressure will be felt to that extent. If foreign help is not adequate, and the revenues from borrowings and fresh taxations fall short of the expectations—which is very likely—then further deficit financing to that extent may be resorted to. If the estimates of the approved schemes shoot up, we will have to face greater possibilities of deficit financing. In the ultimate analysis the success of the Plan depends largely on how much we can have from deficit financing keeping in check the monster of inflation.

To counteract the inflationary effects of deficit financing, rigid price-control and equitable distribution of essential commodities are a dire necessity. The burden of rise in general price-level will be felt by different classes in different proportions. Price-control in our country is entirely dependent on the control of food, as it forms 60% of the budget of the bulk of the population. The Plan has categorically and emphatically voted in favour of 'Strategic Controls'. But contrary to that we see a tendency towards gradual relaxation of controls in many spheres and especially in food. But it is high time for us to realise the magnitude of such a folly. To quote Prof. C. N. Vokil, "We have to remember that if we want planned development we must be ready to reconcile overselves to controlled economy. If we do not like controlled economy, we should be ready to bid good-bye to all plannings."

The last and the most vital factor for the success of the Plan is the extent to which public enthusiasm for the Plan can be created and their energetic co-operation at all stages of the Plan harnessed. In totalitarian States it is possible for the 'architects of the State' to mobilize the requisite resources and services through regimentation from the top. Concentration camps, forced labour and corvee ensure success. But in a democratic country we are necessarily dependent on the voluntary co-operation of the people. The people must feel that it is their own Plan, and that the success of the Plan is their success in the battle of life. This psychological change in the outlook of the people cannot be easily expected in the present-day context. 'Let everyone understand that as long as the existing social order, based on exploitation, inequality and privilege lasts, poverty cannot be banished, nor the productive energies of the nation fully mobilized, nor that psychological climate created in which nations are made.' What we ought to envisage is the structural change in the socio-political-economic fabric of the society and not mere functional adjustments. Resurgent India needs a bold and revolutionary Plan in this respect.

Red-tapism, official corruption, nepotism and favouritism should be uprooted lock, stock and barrel. What we require is a band of administrators, engineers and skilled technicians and personnel at the top who possess integrity, honesty of purpose, initiative and the zeal of a missionary backed up by the enthusiastic support of the people. If this condition is fulfilled, only then and then alone we can hope for the success of the Plan. Otherwise it will be "Love's Labours Lost".

Report of The Finance Commission

By ENKEBEE

[The Finance Commission appointed by the President of the Indian Republic under the provisions of Art. 280 of the Constitution submitted its Report in February, 1953 and the recommendations made in this Report were accepted by the Government. These recommendations have now determined the pattern of Union and State finances in India and will be operative for the next five years ending on 31st March, 1957. These recommendations relate to assignment of the shares of income-tax to the States and of shares in certain Union excise duties, determination of general specific and special grants-in-aid to various states. This article of 'ENKEBEE' is mainly informative in character but contains occasional references to, and estimates of, the principles adopted by the Commission in making their recommendations and points to the injustice meted out to West Bengal.—Editor.]

In making allocation of resources between the Union and the States, the present Constitution of India followed closely the pattern of the Government of India Act, 1935 but for the purpose of introducing flexibility certain provisions were kept indefinite. The provisions that were kept indefinite were to be determined by law and principles made by Union Parliament from time to time on the basis of recommendations of the Finance Commission to be appointed by the President in course of two years of the commencement of the new constitution and thereafter at the end of every fifth year, or at such earlier time as the President considers necessary. This Report under review contains recommendations of the first Finance Commission relating to the distribution of income-tax to the states (under Art. 270), determination of grants-in-aid to the four states of Assam, West Bengal, Bihar and Orissa in lieu of their share of export duty on jute and jute-products (under Art. 273), determination of increased and additional general grants to certain states which are in need of financial assistance [under Art. 275(1)] and fixation of

special grants-in-aid to certain less developed states for specific purposes. These adjustments to be made by the Finance Commission from time to time impart an elasticity to the scheme of federal finance introduced in this country. The first Finance Commission also recommends allocation to states of a share in certain Union excise duties viz. tobacco, matches and vegetable products though this was not within the terms of reference of the Finance Commission. Government also accepted this recommendation and introduced law into the Parliament to give effect to it, as under the Constitution, this change could not be introduced without necessary legislation by Parliament though all other recommendations could be put into operation by orders of the President.

The Commission has recommended an increase in the percentage from 50 to 55 of the net proceeds of the income-tax to be assigned to the states and the distribution among states on the basis of 20% by collection and 80% by population. As states in Parts B and C are included for the first time as co-sharers, the shares of Part A states are reduced except in the case of Orissa, the share of which has been increased from 3 p. c. to 3·50 p.c. The share of West Bengal has been reduced from 13·5 p. c. as was fixed by the Deshmukh Award to 11·25 p. c., that of U .P. from 18 p. c. to 13·75 p. c., of Bombay from 21 p. c. to 17·50 p. c., of Madras from 17·50 p. c. to 15·25 p. c. etc. The specia treatment accorded to Orissa might justifiably have been extended to West Bengal also, which is financially in a very difficult position. The basis of distribution on the principle of collection at as low as 20% seems to be too hard for West Bengal and Bombay. The old award of Sir Otto Niemeyer in 1936 was based by and large on three factors weighted as follows : Population—25 : Collection—35 : General Adjustment—5. Population which is today the main basis i. e. 80% was never then a main factor of distribution, for had it been so, united Bengal would have received a share three times as large as that of Bombay (with 3 times the population). If collection is the more important basis, West Bengal would get much more and in fact, in 1936, when collections of income-tax in Bengal and Bombay were the same, Bombay and undivided Bengal received equal shares, i.e. 20 p. c. each under the Niemeyer Award. Today, after partition, West Bengal has lost only a

small part of the total collection of income-tax. The reduction of We Bengal's share of the divisible pool seems to be unjustified, whe we remember the shares of Bombay and U. P. Area can never be a equitable basis and if, at all either population or area has to possess an meaning, density of population should be considered as relevant. Th Expert Committee set up by Government in 1949 suggested the raisin of the divisible provincial pool to 60% and determination of the distr bution among states on the basis of 20% by population, 35% b collection and 5% by way of redressing hardship. By all these prin ciples, West Bengal deserves a larger share.

With regard to the allocation to states of a share in certain Union excise duties viz. tobacco, matches and vegetable products the Finance Commission has recommended that 40% of the net proceeds of these duties will be distributed among states solely on the basis of popu- lation. West Bengal will get on this basis 7·16 p.c. of the divisible pool, U. P.—18·23 p.c., Bombay—10·37 p.c., Bihar—11·60 p.c., Madras —16·44 p.c. etc. This over-emphasis on population basis again adversely affects West Bengal. Here also, collection should have been accepted as one of the principles of distribution, as in the case of income-tax.

The only redeeming feature is to be found in the recommenda- tions of the Commission relating to the increase in the grants-in-aid by the Centre to the four states of Assam, West Bengal, Bihar and Orissa in lieu of their share of export duty on jute and jute-products. West Bengal's share has been increased from Rs. 105 lakhs (as awarded by Deshmukh) to Rs. 150 lakhs, Assam's share from Rs. 40 lakhs to Rs. 75 lakhs, Bihar's from Rs. 35 lakhs to Rs. 75 lakhs, and Orissa's from Rs. 5 lakhs to Rs. 15 lakhs, but here also, the percentage increase in the case of West Bengal is lower than that of any of the other three states.

The Commission has recommended increased and additional general grants to certain states which are in need of financial assistance. West Bengal under this head receives Rs. 80 lakhs, Orissa Rs. 75 lakhs, Saurasthra Rs. 40 lakhs, E. Punjab Rs. 125 lakhs, and Assam Rs. 1 crore etc. An attempt has however been made here to give relief to West Bengal and to undo the wrong done to her on other heads. This grant is in

addition to relief and rehabilitation grants given to West Bengal by the Union Government from time to time.

Lastly, special grants-in-aid to certain less developed states have been recommended by the Commission for expansion of primary education for four years from 1953-54 on a gradually rising scale. Such states as Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, E. Punjab, Orissa, Madhya Bharat, PEPSU, and Hyderabad will receive these grants and the total amount will be Rs. 150 lakhs in 1953-54 rising by Rs. 50 lakhs each year to Rs. 300 lakhs in 1956-57.

As per Finance Commission's recommendations, the over-all effect is expected to be the following :—

States	Average of amounts received for 3 years ending 1951-52	Average under Commission's recommendations
West Bengal —	Rs. 7·54 crores	Rs. 9·60 crores
U. P. —	8·88 ,,	11·70 ,,
Madras —	8·56 ,,	11·10 ,,
Bombay —	11·60 ,,	11·25 ,,
Bihar —	6·55 ,,	8·55 ,,
Assam —	2·21 ,,	3·45 ,,
Orissa —	2·01 ,,	3·74 ,,
M. P. —	3·35 ,,	4·20 ,,
8 Other States —	14·42 ,,	22·34 ,,
16 states	Rs. 65·12 crores	Rs. 85·93 crores.

Thus Central grants and devolution of revenues to the states will be nearly Rs. 86 crores annually as against an average of Rs. 65 crores for the three years from 1949-50 to 1951-52 received by the states under the Deshmukh Award. Thus, the Commission's recommendations have been bold enough and encouraging to the States as a whole. The State finances have been given relief to the extent of Rs. 21 crores out of the revenues of the Union and it must be appreciated that any further reduction in the resources available to Union cannot be encouraged without

seriously affecting the responsibilities and commitments of the Uni Government in respect of defence, foreign affairs etc. But while t States as a whole have received substantial relief, the distribution benefit among the different states has not been as satisfactory as it shou have been if the special status and urgent needs of the State of We Bengal were adequately recognised. In this respect only, the Comm ssion's recommendations do not go far enough, but it must be said the credit of the Commission that it has suggested giving retrospecti effect to most of their recommendations and as a result, the recommend tions have taken effect from April 1, 1952, except those relating to gran for primary education. Let us hope that the future Finance Commissio will redress this wrong and that also with retrospective effect.

Anomalies in Our Educational System

Prof. A. D. Mukherjee, M. A., P. R. S.

[In this article Prof. Mukherjee points out some of the glaring defects in the present mode of instruction in Colleges. Among these he notes the practice of recording progress by counting attendance at lectures, instruction through mass-lecturing, predominance of the pass motive and the inadequacy of the standards qualifying for admission. According to him, what matters most in education is not the subjects one has taken up but the manner in which one has studied them.—Editor]

(1)

Everybody realises that education, particularly higher education, in Bengal is steadily heading towards a crisis, perhaps a catastrophe. Unless immediate steps are taken to remedy the situation, the whole structure of education may collapse in near future.

The portents are too many and apparent. The gradual lowering of the intellectual level among students, the growing percentage of failures at the various examinations, the apathy of students towards studies, mutual distrust and dislike between the teachers and the taught, a sense of frustration and desperation spreading like a canker in the centres of learning, indiscipline on the part of students and listlessness on the part of teachers—all these unhappy symptoms are there.

Whose fault is all this due to? Some blame students, and some teachers. But actually, whatever be the shortcomings of students and teachers, these are only the inevitable products of circumstances in which they have been placed. They are victims of an educational system, out of date and full of anomalies and absurdities, which drives on like the proverbial car of Juggernaut and to which the young hopefuls of the land are immolated. Unless these anomalies and absurdities be rectified, education will continue to remain a tragic mockery.

(2)

The University regulations prescribe that a college student must attend at least 75% of the lectures delivered in each subject and, if he has done so, he is judged to have pursued a proper course of studies.

But is this not an absurdity ? How can mere attendance at lectures indicate a student's progress in studies ? He may remain thoroughly inattentive to the lectures delivered, he may not have followed or understood a single word. He may have (as sometimes happens) dozed through the lectures or attended only by *proxy*. But who cares ? The College and the University are quite satisfied if the attendance registers are kept all right.

But is there any sense at all in giving credit only for attendance at lectures in the absence of any evidence of real progress in knowledge ? Can education be anything but unreal under these circumstances ?

(3)

In fact the present system of instruction in Colleges does not really provide for *teaching* in the real sense of the term. The teacher does not teach any particular student, consider his difficulties, help and guide him in his progress in studies. He addresses a crowd, miscalled a class, consisting of about one hundred and fifty individuals, many of whom are indifferent to what the teacher may say in the class. He speaks like a book, and what a student learns from the lectures might as well be acquired by him from any of the numerous handbooks on the subject. But does anybody care whether a particular student understands the lectures or can assimilate them ? Who is going to help him over his individual difficulties ? The teacher addresses an *ideal* student, but this ideal student is no more real than Plato's *ideal* horse. Every single student is a case by himself. No teaching can be real for him unless it takes into account his own peculiar defects and shortcomings, his special tastes and aptitude, and is adapted to his particular requirements. The same prescription cannot do for each one of a hundred and fifty patients in a hospital, and the same lecture cannot be helpful to each one of a hundred and fifty students in a class.

Unless this sort of mass-lecturing is replaced by a more rational mode of instruction, education can never be real and of practical benefit to a student.

(4)

One might almost doubt whether the present day colleges deserve to be called places of *education* at all, since no attempt is really

made there to educate a student, to draw out and develop his talents and faculties. The bogey of the University examination casts a doleful shadow over students and teachers, and their sole purpose seems to be to propitiate the monster as cheaply as possible. Students join educational institutions just to get a pass by hook or by crook, sometimes by crook rather than hook. Preparation for an examination means for the student not so much intensive study as intensive speculation regarding likely questions, speculation as intensive as that of a book-maker. What a student desires from a teacher is not so much knowledge as "suggestions" or tips for the examination. The whole thing has become a sickening travesty of education.

Education can never be real until this pass motive is eliminated altogether. If it be not possible to exclude examinations altogether, at least something might be done to improve the present state of things. In stead of having one examination at the end of two years, there might be several spread through out the period of study, and these should be so planned and worked out that a student is required to produce evidence of his knowledge of the entire syllabus of studies. Home-work and class-work under the guidance of teachers are certainly better than mere present-day examinations. The present system encourages students to follow a hit-or-miss policy and consider it a waste of time and energy to prepare anything but "likely" questions.

(5)

Much of the apathy and indifference of students to their studies and the absence of true educational motives amongst students, is due to the fact that the majority of students are not properly equipped for the studies they have taken up. Stiff syllabuses and soft passes constitute a vicious circle from which we seem unable to get out. In trying to keep up appearances we have prescribed a very high standard for the syllabuses of studies, but at the same time we have kept the qualifying test for these studies very low. A student passes and is allowed to go up for the next stage if he has scored only 30% marks in a subject including grace marks, charity marks and clemency marks. But very possibly he has a very poor knowledge of the subject and is not qualified for a higher course in studies. No wonder if the student finds that he cannot follow the lectures, manage the syllabus or grasp

the subject, and becomes idle and listless, and goes about hunting for "suggestions" before the examination.

(6)

One hears a good deal of about coming reforms in education. There have been talks about expanding the syllabus and redistribution of marks between the various subjects for an examination. But these will help the cause of education very little until the fundamental defects in the educational system be remedied. And we must remember that in education what matters most is not the number of subjects one has taken up but the manner in which one has studied them. In education as in religion, "the letter killeth and the spirit giveth life." It is not passing examinations in several subjects that matters so much as toning up of the intellect and character. Is one a better and a fitter man for his education,—that is the supreme question. But the educational *pundits* of today appear to be as much indifferent to it as those a hundred years ago. How long will the country wait and sigh for inauguration of a proper educational system? "How long, O Lord, how long?"

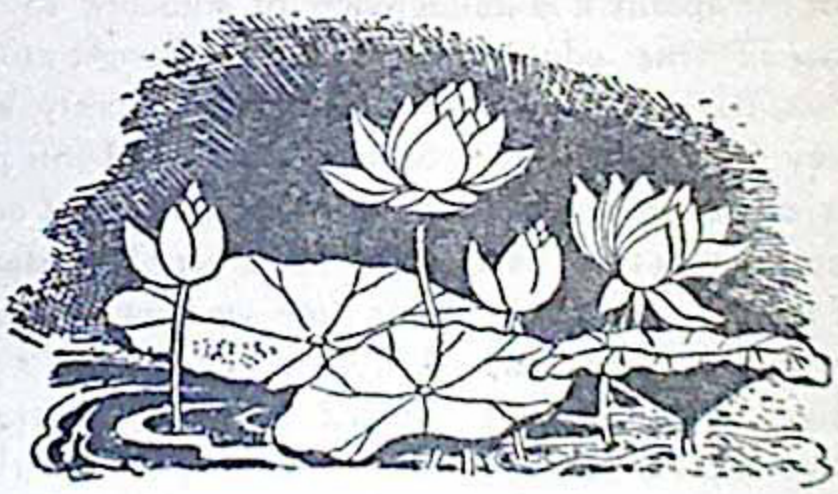

Tit For Tat

Sri Sadananda Mandal
First Year Science.

The Mathematics-teacher was scolding his pupil for having told an extra big fib and angrily said, "I never told lies when I was your age."

The pupil hesitating for a moment asked, "How old were you when you started, Sir ?"

• • •

Because his cows watch roadmenders instead of chewing grass and so produce less milk, a German farmer has demanded compensation from the city corporation, reports Reuter.

• • •

A pompous individual visiting a school was asked to question the boys on Geography. He began, "What is the capital of 'Olland ?"

" 'H', Sir", a boy replied.

• •

The door-to-door salesman was not at all welcome.

"If you're not off my doorstep in thirty seconds", said the housekeeper, "I'll——"

"Now Sir, what can I sell you in thirty seconds ?" replied the salesman cheerfully.

Nationalism Vs Internationalism

Debi Prosad Pathak

[A Student of Third Year Arts, Econ. (Hons). In this article the conditions for the growth of nationalism, its historic role in moulding the European States have been pointed out. Nation-states are an anachronism, and the perverted extreme form of nationalism positive danger in the modern world. Sri Pathak discusses in this article the urgent need for international order, the part played by International Trade, morality and law in building up internationalism, history of the attempts to build up international order, such as the [League of Nations & the U. N. O.—Editor]

Nationalism is a long historical process rooted in man's gregar ousness and his tribal instinct. But what often passes for nationalism to-day, is nothing more than patriotic snobbery, jingoism pure an simple. If therefore, we are to avoid the order of sequence sugges ted by Flanz Grillparzer, "From Humanity through Nationality t Bestiality" it is necessary for the nations of the world to develop a international mind and active international good-will and friendship But before entering into the discussion, Nationalism Vs Internationalism we have to know first what Nationalism and Internationalism are their various forms, history of their growth, and so on.

The terms, "Nation," "Nationality" and "Nationalism" are nov and then confused. Nationality is largely a non-political concept an can exist even under foreign domination, and when a nationality acquire political unity and sovereign independence it forms a nation. "Nationa lism stands for the historical process by which nationalities are trans formed into political units, and for the legitimate right of a people, wh form a distinct and vigorous nation or nationality, to a place in the sun."

Broadly speaking, geographical and racial unity, common culture unity of language and religion, common economic interests, commo subjection and suffering, political sovereignty and popular will—these are the factors which stimulate the growth of nationalism. But non of the factors is essential for the growth of nationalism. The American in spite of their racial differences have become a nationality,

similar case is Switzerland, where there is a variety of spoken languages. The possession of a homeland is of no importance. As Laski puts it, "It may be rather the aspiration towards recovery than possession itself that is essential to the concept of nationhood."

"Out of Renaissance Sovereignty combined with Revolutionary Rights comes Nationalism"—wrote B'suan But there was a time when geographical divisions very effectively separated men. It is true that the appearance of national character definitely occurred at the Renaissance. The Renaissance, however, divided Europe into a collection of states rather than into nations, the ideal being the governmental independence, not group development, and the Revolution gave the final touch. Through the centuries that followed the Renaissance until the Napoleonic era, Nationalism was rather a sentiment than a programme, but the sentiment was strong. It was felt as a real political fact at the partition of Poland (1772). Thus, as Lord Morley puts it, Nationalism "from instinct became idea ; from idea, abstract principles ; then fervid prepossession ; ending where it is to-day, in dogma whether accepted or evaded." The influence of the ideal on practical politics was far-reaching. Practically speaking it destroyed the whole of Europe and then constructed it again. So, it is said of Nationalism that it is revolutionary as well as constructive. In many countries it dashed away the established Governments, which were sometimes, as in Italy, alien to the people governed, or else, as in Germany, an inheritance from absolute politics.

In discussing the subject it is necessary that we throw some light on the much discussed question, whether every nationality has an inherent right to be a self-governing sovereign state. This principle of "One Nation One State" emerged during the Congress of Vienna (1815) and received further stimulus during the Great War of 1914-18. It is admitted by many that, other things being equal, political boundaries should be drawn where national lines are drawn. J. S. Mill writes, "It is in general a necessary condition of free institutions that the boundaries of Government should coincide in the main with those of nationality." Lord Acton and several others take the opposite view. Zimmern writes. "In the long run the theory of national state will go the way of Henry VIII's and Luther's theory of a national

church." According to Hegel and Mazzini the nation-state is ultimate unit in human organisation. Two difficulties stand in way. Modern industrialism has created a world market and also for competition. "The trade may take the form of investment", obse Laski, "a debtor country may be forced to accept tutelage in the inte of bond holders." As power extends, nationalism is transformed imperialism. Next, the character of modern warfare implies fur difficulties. The nation-state must protect herself and so every of them induces the smaller states into alliance. And to quote L again, "So organised, the distribution of nation-state resm nothing so much as powder-magazine which, as in 1914, a single cha spark may suffice to provoke into conflagration." We agree Prof. Hocking that no nationality has an intrinsic right to be a st All our rights are conditional and presumptive. In the words of Ram Muir, "It is only loosely that every nation has a right to freedom unity. Nations like men must earn their rights." Whether a gi nationality should be recognised as a state is a matter to be deci by the majority of that nationality, and it depends partly on the size that nationality and partly on its rigidity.

Now, we should distinguish between true and perverted natio lism, and also the evils of the perverted form. Nationalism is good doubt, but its extreme form is bad. This extreme form of national —chauvinism in other words—did great wrong to European States. E a little child of Germany believed that the chill used to come fr France—is this nationalism ? The idea of nationalism is limited. deficiences of the ideal are many. Firstly, it narrows the polit outlook—local development tends to become village-politics and effort to maintain the soul of a nation often results in producin segregate barbarism. Next, chauvinism splits up a big nat into smaller nations, that creates new nations within a big one. Ag nationalism has been connected with the strange doctrine of non-in ference, which at one time implied that it was no business of one gr of men if torture, disease, or tyranny were prevalent in another gro Moreover, narrow politics has also often created group jealousy group hostility.

Chauvinisim in France once produced an almost barbaric hat

of everything German, and every race, growing larger, tends to develop its provincial jealousy into what is called imperial policy. Thus nationalism supports war and cramps progress just as effectually as imperialism. "Indeed, the two names in their sinister meaning seem to refer to the same very limited political outlook; for what is nationalism in a small group becomes imperialism when the group is powerful." Thus, imperialism is nothing but the foster-child of nationalism.

To-day people are coming to realise the urgent need of replacing international chaos by international order. We are living in a world of shrinking distances, an interdependent world in which what concerns one people sooner or later has its repercussion upon every other people. "If mankind is to save itself from the catastrophe which awaits it," says an eminent writer, "it should replace national exclusiveness by international inclusiveness; the doctrine of national sovereignty by the doctrine of international solidarity."

"If the modern world can settle its organisation in economic terms only, transition to an internatinal order will not be a matter of overwhelming difficulty"—observes Laski. There will, of course, be no "overwhelming difficulty", but there are great difficulties in the transition. A serious allegation against an international authority is that it attacks national prestige. But to-day this national prestige, in majority of cases, is nothing but the protection of the power of a small group of the community who are exploiters. The second allegation is that the prevention of conflict by the international authority deprives life of its colour and romance. "But the glamour of war is unreal; it exists only in the inexperience of those who have not known its deadly furies."

Searching for the factors which promote the growth of Internationalism, three major ones come to the forefront. These are international trade, law and morality. We have already mentioned the complex character of modern trade and how several countries come into a close tie by it. Regarding international law and morality we shall have to go deeper into the ideal of internationalism and the history of its development.

Before the nineteenth century, various efforts were made to bring together the people of Europe and maintain permanent place

among them. But all of them met with failure because they mer aimed at perpetuating the "status quo". One of these schemes w that of the great French statesman Duc De Sully. The next import plan was put forward by the Abode de St. Pierre, immediately after t Congress of Utrecht (1713) wanted a "balance of power." Rousse next took up the cause and his conclusion was the internatio strife and warfare grew when independent states came in touch w one another. He, therefore, put forth the idea of a Federated Euro placed under the rule of law. Rousseau's work was taken up Bentham. And lastly, Immanuel Kant in his celebrated essay "Towa Eternal Peace" outlined a federal scheme for the maintenance of pe in Europe The evolution of international law was largely the work the Dutch jurist Hugo Grotius, who later came to be known as "t father of international law." Serious efforts were made betwe 1815 and 1825, to federate the whole of Europe, the leading sp behind it was Alexander I of Russia whose "Holy-Alliance" was failure.

The greatest advance in internationalism was made in the fi quarter of the twentieth century. Public opinion was gradually growi in favour of internationalism. And finally the League of Nations w born on January 1, 1920. Woodrow Wilson was the leading spirit behi it, and it was in fact pursuing the last of his famous fourteen poi which declared, "A general association of nations must be form under specific covenants for the purpose of affording mutual guarant of political independence and territorial intergrity to governments a small states alike." Even the most enthusiastic supporters of t League cannot claim that it was an unqualified success. While it d much good, it failed to prevent war and injustice in many cas specially in China, Abyssinia and Spain. Nevertheless, it was a mo in the right direction. Its failure lay largely in the domain of "hi politics," while in the field of international co-operation, in no political matters and more particularly matters pertaining to labou it achieved considerable success. It was an association of soverei states. What it required was an association of people. A confederati of governments alone, each striving for its own ends, can never att success.

There was more spadework done behind the United Nations Organization than its predecessor, beginning with the Atlantic Charter of 1941 and culminating in the San Franscisco Conference of 1945. The U. N. Charter consists of one hundred and eleven short 'articles'. The preamble to the Charter sets forth "the people of the United Nations", instead of the words, "the high contracting parties", used by the Covenant of the League of Nations, signifying thereby that the U. N. speaks in the name of the people of the world. The U. N. does not call upon its members to surrender sovereignty any more than did the League of Nations. It is a voluntary co-operation of sovereign states. It is an offensive against distrust, it is not a super-state. The U. N. has earned considerable success in various spheres of life—economic, social and international law and morality. But in the sphere of pure politics it is a failure. The war in Korea, the non-admission of Peoples Republic of China into U. N., the callous attitude towards Kashmir affairs, the racial battle in South Africa—all these signify its failure. But the "critics of U. N. have not given it enough time to vindicate itself. Pulling it by the root every now and then to see how far it has struck its root is not the best way of inducing it to grow."

"The U. N. Charter has room for growth and development. It is the beginning of World Government. The part of wisdom, therefore, lies in so working the U. N. that the last stages of U. N. will become the first stage of the world government. Mere emotionalism and constitutional changes cannot usher in the new day. Profound moral and spiritual changes resulting in a passionate devotion to the World Community, if not a necessary pre-requisite, is at least an indispensable accompaniment of a world Government. The world cannot be saved by a constitution ; nor can it be saved by one country alone. It can only be saved by men and women of all countries who are passionately devoted to humanity as a whole and insist that their governments treat all their citizens alike and scrupulously carry out their obligations even to the least of God's children."

The Flame-Thrower

U/O Hironmoy Ray
2nd Bengal Battalion, N. C. C.
(Asutosh College 'B' Company)

In modern warfare the final "mopping up" of the enemy is done by the Infantry. For this, infantry must have a fire-support, which may enable it to contact and destroy the enemy. With this support if available, the object of fighting may be fulfilled. The aim and object of all fighting is to kill the ememy. For achieving this goal one of the tactics applied is to break the morale of the enemy, and surprise can break the morale. A land battle is a combination of moral and physical force.

The Flame-thrower is an excellent flat trasactory supporting weapon for the infantry and it looks like a lifebuoy which can demoralise and disorganise the enemy. It makes an easy target for own troops. It can be used in all weather. Men have an instinct of fear of death as the effect of the flame is understood by them. They know that distance is the only protection against fire, so they run away whenever and wherever they are attacked by the flame.

It has several useful effects : (i) Lethal, causes death by burning and shock. So, the enemy surrenders and does not face the flame ; (ii) Incendiary, sets fire to brush, haystacks and ammunitions; (iii) Searching, goes into defiles and forces the enemy to evacuate trenches, pits, forests, even vehicles. It has also a good use into the reverse slope of the hills ; and (iv) Psychological, the last and the most important effect because it can be seen before it reaches him ; he gets puzzled and cannot decide whether he will stand and fight or take shelter or surrender.

The infantry, if it is to have efficient flame support, needs three types of flame-throwers. (A) Light mechanised flame-thrower, generally under covering fires of other weapons can dart in against enemy entrenchments and pill-boxes. It can accompany attacking infantry if the cross-country is not too rough. (B) Portable flame-

throwers accompany assault units where mechanised flame-throwers cannot go. The disadvantages with this type are its weight, small fuel capacity and short range. It cannot keep up assult section at a long distance. To offset its disadvantages, it can be carried forward on the light mechanised flame-thrower carrier. (C) The tank-mechanised flame-thrower, is used for assaulting well-defended position so as to crash through and behind the enemy, cut off retreat routes, hit reserves, attack supply lines, dumps and command posts. It may be either a tank-trailer type or the integral machanised flame-thrower.

All aggressive action by infantry must follow the use of flames. During an approach march, when the advance guard comes under fire, the normal base of fire would be established to pin the enemy's head down. The light mechanised flame-thower with infantry support should then move out rapidly and flush the enemy out with flame. In attack, it goes closely behind the assault party. When resistances are met, it moves forward and engages the enemy. By its alternate use, it can keep on firing the target for a considerable period of time. The portable type may be used for difficult and specialised targets.

In all defensive action care must be taken so as not to fire too early, as it may be to the scouts. Time must be allowed to the enemy to approach closely and then be trapped in between far and near flames with the mass of flames being applied to the main body of the troops in the middle. The mechanised flame-thrower may be placed on mine-tactics at the critical approaches of the enemy on the hills. The patrol finds it useful in covering men withdrawing after contact has been made with the enemy. It is valuable to rear guards also.

If properly used the flame becomes a psychological problem to the enemy. It is a potent friend and ally to the infantry soldiers. "The Canadians have been highly successful in operating flame-throwers because their training has been thorough"—Lt. Col. Walter L. Miller, U. S. Army—"Infantry men have to be taught to operate the flame-thrower and specially how to mix fuel".

COLLEGE NOTES

The Report of the Students' Union

The charge of the Students' Union was made over to me on November, 14, 1952.

SARASWATI PUJA : Immediately after our assumption of office, the most important and responsible task we had to perform was the celebration of the Saraswati Puja which came off on January, 20, this year. The three departments of our college combined to celebrate the Saraswati Puja under the presidentship of Prof. Satkari Mitra with great pomp and eclat.

NETAJI BIRTHDAY : Netaji birthday was observed in our College as usual with due dignity and solemnity by the three Students' Unions. Dr. Syama Prosad Mookerjee presided over the function, and Sir Haridas Mitra was the guest-in-chief. The national flag was hoisted by Mr. E. Bhaskaran, the close associate of Netaji during 1943-45. The Rani Jhansi Sebika Bahini treated the audience to an exquisite "Geeti-Natya," dealing with Netaji's life, struggles and ideals, which held the audience spell-bound for over one hour and a half. The proceedings closed with Shri Prafulla Chakravorty's consummate rendering of the battle of Imphal and the I. N. A. marching song on the mouth harmonica. In the evening the College building was very tastefully illuminated.

DEBATES : To select representatives to the different Inter-College competitions several debating classes were arranged in our College. Shri Parimal Mookerjee of 3rd year B. A. stood second in one of the Inter-College Debate Competitions held on March, 17, 1953 in the Bristol Hotel and organised by Messrs. F. N. Gooptu & Co. This is the first time in our College history that our college representative showed special merit in the Inter-College debate competition. We also arranged a debate competition among the students of the College on 13. 3. 53, in which

ollege Students' Council
partment—1952-53.

-R)—K. R. Chakra-
(Common Room
, D. Das (Editor),
Chandra (Gen.
Vice-Principal H.
ttacharya, Principal
Mukherjee, Prof. P.
President), D. P.
(Vice-President),
tterjee (Actg. Games

First Row (L-R)—
, A. K. Chakravarti,
oy, P. K. Chanda
te Secy.), D. K.
charya, M. Mukher-
. Roy, S. Bose (Wall
Secy.), M. K. Ghosh
ural Secy.), D. K.
Asst. Genl. Secy.)
2nd Row (L-R)—
, B. D. Mitra, C.
mi, R. K. Kar, P. D.
rjee, S. K. Maitra
Fund Secy.)

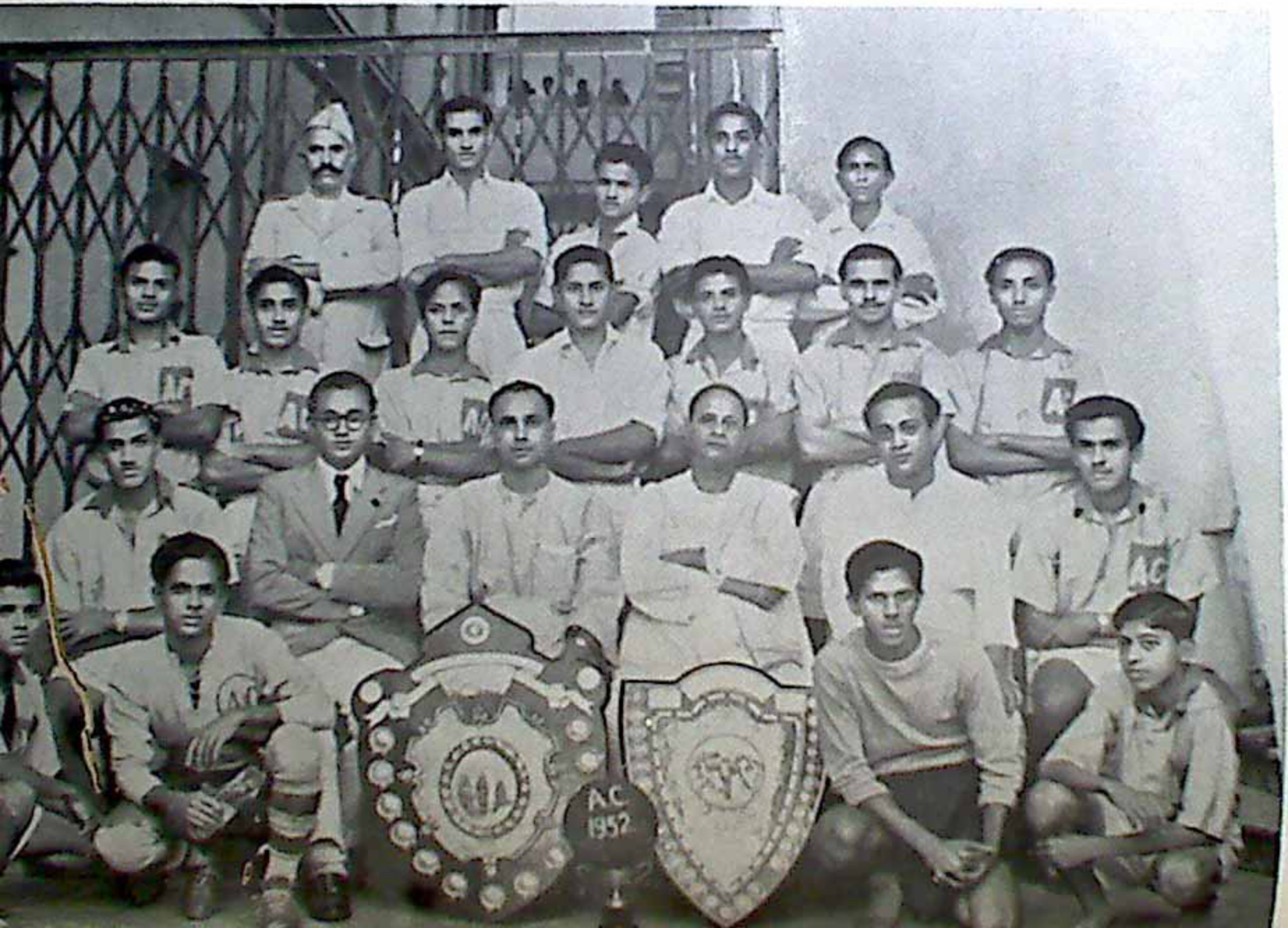

Asutosh College Football Tea
and
Winners of Inter-Collegiate
League—Sir Asutosh Moo
Memorial Challenge S
and
Inter-Collegiate Knock-out Tou
The Elliot Shield.

Sitting on the Ground
S. Sen (Sr.), R. G
Asutosh Mookerjee
rial Challenge
Purnea Charity C
Elliot Shield, A
(Jr.), S. Goswami.

Sitting on the Chair
S. Saha (Capt.),
Ray (Games Secy
S. Mukherjee (
charge), Principa
Mukherjee, P r
Chakravarty (P
charge of tour), A

Standing Back-Row
A. Dutta (Sr.),
S. Ghosh (Sr.),
(V. Capt.), S. S
S. Banerjee, M. B

Standing Rear-Row
Darwan, R. Roy
dhury, S. Ghosh (
Bose, Kesto (Bearer

successful candidates were given prizes during the last Spring Social gathering. We intend to introduce monthly debates very shortly. We are also trying to arrange an Inter-College debate competition in our College.

INCREMENT OF EXAM. FEES : A deputation with a memorandum was arranged to wait upon the Vice-Chancellor as a mark of protest against the proposed enhancement of the rates of Exam. Fees on 19. 12. 52, which has since been abandoned by the University for the year.

FAREWELL PARTY : A farewell party was organised on September, 12, 1952, on the eve of departure for West Germany of Prof. Ajit Kumar Ray, M. Sc., for higher education and research work.

INTER-CLASS COMPETITIONS : This year also we conducted several inter-class competitions for which successful candidates were awarded prizes during the last Spring Social. We intend to organise another inter-class competition after the Summer Vacation.

GAMES AND SPORTS : Another glorious chapter was added to our history when we again annexed after 1948 both the Inter-Collegiate League Championship and Elliot Shield to our credit. In the table tennis our College became the champion for the year 1953. Further, it is the first time that our College won the Basketball tournament and also the Inter-Collegiate Volleyball tournament organised by W. B. Volleyball Federation this year. In the Inter-Collegiate sports our College secured the third place. Our Annual Sports were held on the 19th and 20th Dec. 1952 under the presidentship of Dr. S. N. Banerjee, Vice-Chancellor of the Calcutta University. Our achievements in the sphere of games and sports augur a brighter future for the College.

COMMON ROOM & UNION ROOM : We are glad to announce that our Union is able to extend the Common Room to the gallery in the Hall. Further the Governing Body has promised us to enclose a portion of the gallery in the Hall for use as a permanent office room for our Union. We offer our grateful thanks to the authorities for their act of kindness.

SPRING SOCIAL : Perhaps this is the first time in the history of the Day Department Union that a Spring Social gathering was held on Sunday, March, 15, 1953. Principal S. P. Mukherjea presided over the function and gave away the prizes to the successful candidates in the

different inter-class competitions. Many prominent artists took part
the function and the decoration of the stage was universally admired.

SUGGESTIONS : I appeal to the College authorities for providi
the students with facilities of a cheap canteen and with addition
accommodation in hostels, and entreat the authorities to purchase
greater number of books for the Library and the Common Room. I al
suggest to the Science students that they should form a Science Society

Before I close, let me request all my friends to remember th
we students are all potential citizens, and the duties of citizens a
too well known for us to require any elucidation. As a first st
to build our culture we should learn how to behave and condu
ourselves well and keep ourselves open to all good suggestions f
progress. In conclusion, I pay my regards and express my gratitu
to our President, Prof. Parimal Kar M. A. and our Principal Somesw
Prosad Mukherjee, M.A., B.L. for their kind and able guidance in
the activities of our Union. I also record my appreciation of t
the services rendered by all members of the Union.

Tirtharenu Chandra
General Secretary

A Valedictory Address

We, your affectionate students of Asutosh College, have assembled here on this momentous occasion to express our deepest love and veneration for you. So friendly, genial and affable was your behaviour to us that we have never had the occasion to feel the usual gap or distance that unhappily yawns between the teacher and the taught. It is for this unique nature of yours that even on this occasion of jubilation we cannot overcome the feeling of sorrow which people smart under when seized with pangs of separation. So heavy is our heart that we cannot fully give vent to our true feeling which is mixed with joy and sorrow. But since you are onward on your journey with the noble object of furtherance of your education and knowledge, and to have another laurel from the goddess of learning whom you ever propitiated with untiring diligence and unflinching devotion, we wish you bon voyage and God speed on the eve of your departure for foreign land. Let us also cherish this hope in our mind that we will ere long get you back in our midst with further glow and glory of erudition. As for you it is our sincerest belief that you in course of your sojourn in distant land will remain ever with your mind riveted towards us just as the great poet Kalidas expressed the idea in the following couplet—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥"

which means :

Forward goes the body, backward rushes the restless mind like the China Silk of a banner which is carried against the wind.

We wish you God speed and success once again.

Your Affectionate Pupils
of ASUTOSH COLLEGE

[Read by Sri Tirtharenu Chandra on September, 12, 1952, on the eve of departure for Germany of Prof. Ajit Kumar Roy, M. Sc., for higher education]

The Report of the Sports and Games (1952-53)

As the Secretary of the Sports and Games section of our College, I owe it to myself to offer at the very outset my hearty thanks to Sri Ramanuj Ray, my predecessor in office, for having conducted the affairs of this section with remarkable ability. He has raised our College in the estimation of the world of sports. Even though he has retired from office he is still the main pillar of our athletic section. But for his untiring energy, help and wise guidance it would have been impossible for me to discharge my duties. I am really proud of our Games section, specially of its activities last year. I must mention here the great help I received from Prof. Sukumar Mukherjee (Prof.-in-charge of Games). It would have been impossible for me to carry on the business of this section without his wise guidance. I must mention the manifold sympathy we received from our beloved Principal S. P. Mukherjee. He awarded one Blazer to Sri Ramanuj Ray, our Ex-Games Secretary. I take this opportunity to extend my hearty thanks to all my colleagues for their best co-operation.

College Annual Sports :

The Annual Sports were held in the presence of a distinguished gathering of invitees and enthusiastic College teachers and students. Vice-Chanceller S. Banerjee took the chair and distributed the Certificates and Prizes. Sri Prabhudas Chatterjee of First Year Science won the individual Championship of the year.

Inter-Collegiate Sports :

This year we have added to our reputation in the Inter-Collegiate Sports under the able captaincy of Sri Ramanuj Ray. We got the third place in the contest for championship by securing 21 points. We won the 800-metre and 1500-metre runs for three years consecutively. Sri S. S. Khetra who won the 800-metre and 1500-metre runs also won the 5000 metre run.

University Blue :

It fills my heart with joy to announce that ten of our College boys got the University Blues in the current year. They are : 1. Arun Mitra

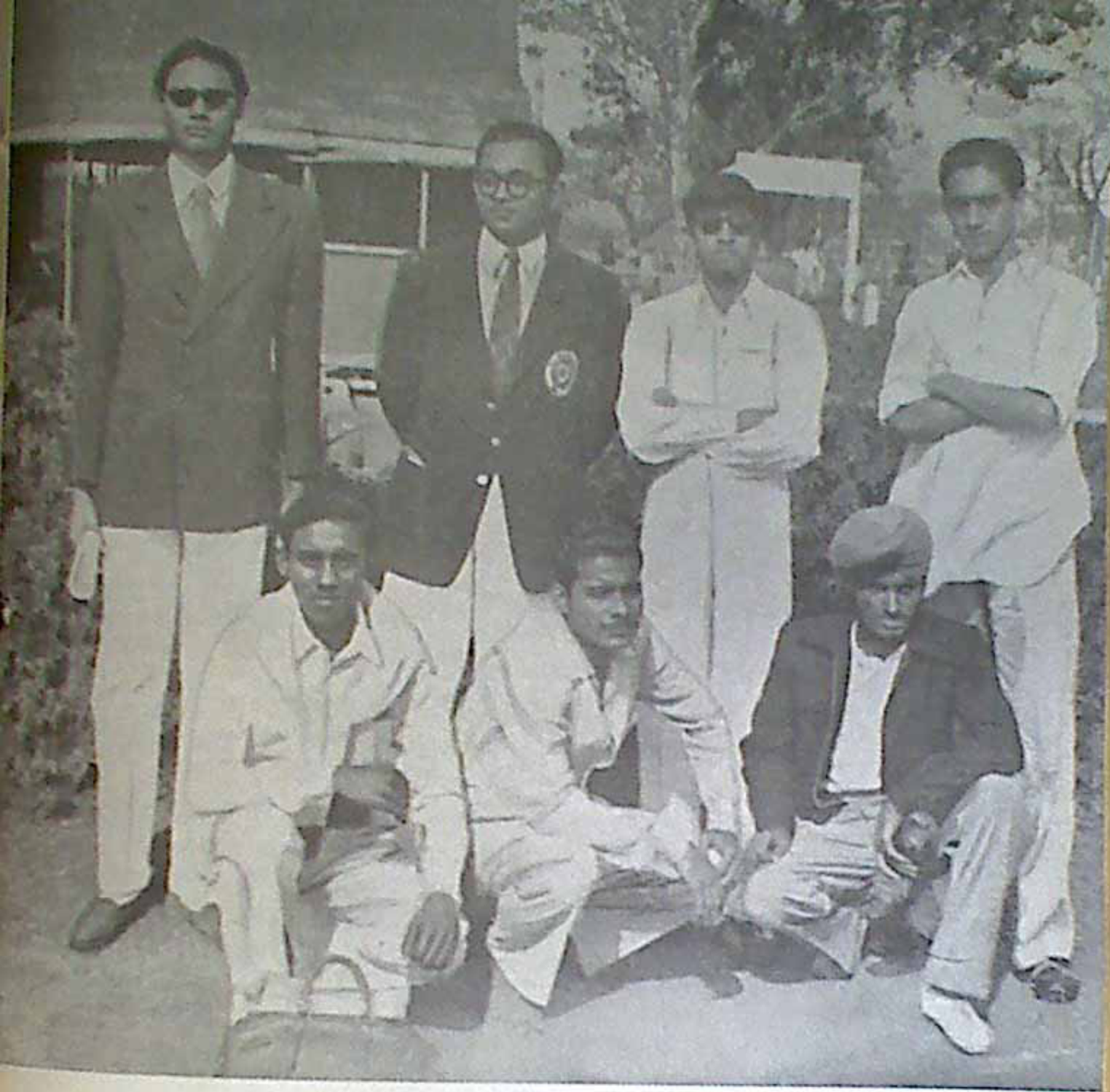

Asutosh College Athletic Team, 1953

"Third" in the Inter-Collegiate Athletic Championship, 1953

Standing (L-R)—S. Sen, R. Ray (Capt.), D. Chatterji (Secy.), D. Mukherjee

Sitting (L-R)—S. Bhattacharya, P. Chatterjee, S. S. Khatra

(Photo by Gora Kundu)

Asutosh College Volley Ball and Basket Ball Team 1953

Inter-Collegiate Knock-out Basket Ball Champions and
Inter-Collegiate Knock-out Volley Ball Champions

Standing (L-R) – A. Bose, D. Bhattacharya, M. Bose, A. Chandra, S. Ghosh and S. Chatterji

Sitting (L-R)—N. Mukherjee, R. Roychoudhury (Capt.), Prof. S. Mukherjee, Principal S. P. Mukherji, B. Mukherjee and S. Mukherjee

(Football) ; 2. Rabin Guha (Football) ; 3. Prodyut Mitra (Football) ; 4. Subodh Sen (Football) ; 5. Amal Sen (Both in football and cricket); 6. Bireswar Ghosh (Cricket) ; 7. Sahadeb Banerjee (Cricket) ; 8. Siddartha Ray (Cricket); 9. Gopal Chakravarty (Cricket) and 10. Gautam Davar (Tennis).

College Blue :

Sri Ramanuj Ray (Ex-Games Secretary) and Sri Satyen Saha were awarded the College Blues this year, and both of them were presented with College Blazers. Sri Ramanuj Ray represented our College in cricket, volleyball, basketball, badminton and athletics, and captained the athletic and volleyball teams. Sri Satyen Saha represented the College team in football and badminton and captained the football team last year. Sri Debaprasad Chatterjee and Sri Riten Roy Choudhury (Basketball Captain) were also awarded College Blues.

Tennis :

Sri Gautam Davar represented the Calcutta University team this year in the Inter-Varsity Tournament. He won the Bengal Lawn Tennis Championship (Junior) this year.

Badminton :

In the last season we went up to the semi-final at the Inter-Collegiate Badminton Tournament, and after a hard fight we lost to the Scottish Church College by a very narrow margin.

Table Tennis :

We won the Inter-Collegiate Table Tennis Tournament this year defeating the Charuchandra College in the final of the tournament. Saroj Ghosh, our table tennis Captain, was selected to represent the Bengal team in the Inter-Provincial Tournament.

Football :

I must be proud of our football career in the last season. We are the proud double winners in football. We won the Sir Asutosh Mookherjee Memorial Shield of the Inter-Collegiate Football League by defeating the Bangabasi College. We also won the Elliot Shield by defeating the R. G. Kar Medical College, holders for the last two years. It must be mentioned here that we were the Runners-Up of the

Elliot Shield for the last two years. Thus we took revenge for our last two years' defeat. For these sucesses we must be thankful to the untiring energy of Sri Ramanuj Ray, our Secretary and Sri Satyen Saha, our Captain. Five of our College players represented the Calcutta University team this year in the Inter-Varsity tournament. They are : 1. Arun Mitra ; 2. Robin Guha ; 3. Prodyut Mitra ; 4. Subodh Sen and 5. Amal Sen. Of these Sri Arun Mitra was selected to be the Captain of the Calcutta University Football Team, 1952.

Football Tour :

This year an official football tour was arranged by our College. Our College played two charity matches at Purnea and Katihar, and three exhibition matches at Bolepur. We came out without any defeat—we won both the charity matches and one of the exhibition matches, and the rest ended in a draw. Sri Ramanuj Ray (Secretary) and Prof. B. Chakravarty accompanied the team as Manager and Prof.-in-charge respectively.

Cricket :

This year also we have maintained our usual reputation and glory in cricket. As cricket is famous for its "glorious uncertainty" we were beaten in the semi-final of the tournament by the Vidyasagar College by a very narrow margin, though we had a better side. In the Cricket League we were beaten by the St. Xavier's College only by 3 runs. Five of our College boys played for the Varsity team this year in the Inter-Varsity Tournament. They are : 1. Bireswar Ghosh ; 2. Amal Sen ; 3. Gopal Chakravarty ; 4. Sidhartha Roy and 5. Sahadeb Banerjee.

Hockey :

The Inter-Collegiate League Tournament is yet to be finished. Up till now we have scored the highest number of goals, and we expect to keep up our usual reputation. I am glad to announce that Sri Prodyut Mitra was selected to represent the Varsity team in the Inter-Varsity knock-out tournament.

Volleyball :

This year we went up to the final of the Inter-Collegiate knock-out tournament and lost to the City College after a close fight. In the

knock-out tournament run by the Volleyball Federation we took revenge for our last defeat to the City College by winning the trophy.

Basketball :

Basketball is one more feather of glory added to our cap of success. This year we won the Inter-Collegiate Basketball Championship defeating the Calcutta University Law College, the holders for the last two years.

Sri Riten Roy Choudhury, our basketball Captain, represented the Bengal Team in the Inter-Provincial Basketball Tournament this year.

India-Cycle Tour :

Three of our students, Joy Narayan Ghose Dastidar (Capt.), Mrinal Roy and Sunil Mukherjee went on a bicycle tour to Bombay via Allahabad and Delhi and were awarded the College Blues.

I am glad to announce that after a prolonged effort we have got a separate notice-board and a letter box. Lastly we have got necessary permission for a separate play-ground in the Maidan area—jointly with the Bangabasi College. Works are going on in the ground, and we hope it will be ready by the end of April '53. Sri Ramanuj Ray—our Ex-Secretary, Prof. Sukumar Mukherjee—our Prof.-in-charge of games and Prof. Bidyut Banerjee are mainly responsible for this, and I must be thankful to our beloved Principal, Sri S. P. Mukherjee for his permission and for allocating separate funds for this.

On behalf of our Games section, I appeal for a separate room to the members of our Governing Body, specially to the President and our Principal S. P. Mukherjee, who take such a keen interest in sports and games.

Last of all I look forward to the day when our College will win fresh laurels in the field of sports and games.

Debaprasad Chatterjee
Games Secretary

The Report of the Debating Committee

My sincere thanks to Sri Amitava Mukherji who made over charge to me for the valuable service he rendered to our Committee. We also express our deep sense of gratitude to Sri Nirod Kumar Bhattacharya, Professor-in-charge of debate, for his kind suggestions and guidance.

We took part in several Inter-Collegiate Debating Competitions, viz., The University Institute Debate, the Sibpur Debate, the F. N. Gooptu Memorial Debate, the Law College Debate and others. Our representatives by giving a brilliant account of themselves in all these debates have considerably enhanced the prestige of the College. Sri Parimal Mookherjea of Third Year Arts has all along been representing our College ; he stood second in the F. N. Gooptu Memorial Debate.

We also held a Bengali Debating Competition in the College in which Sri Deepti Prasad Mitra stood first.

In conclusion we offer our thanks to all, especially to Prof. Parimal Kar, President of the Union, who has kindly co-operated with us in our endeavours.

Pranab Kumar Chanda
Secretary

The St. John Ambulance Brigade (India)

District II (West Bengal)

Asutosh College Ambulance Division

The Ambulance Division was formed in February 1933. The Division has been carrying on First Aid and relief work since its very inception. Its usual duties include First Aid, nursing, inoculation and vaccination, transport of patients and other relief works.

Asutosh College Cricket Team, 1953

Standing (L-R)—A. Banerjee, A. Sen, P. Bose, R. Roy, S. Mathur, K. Bhattacharya and S. Sen

Sitting (L-R)—D. P. Chatterjee (Secy.), S. Banerjee (Jr.), B. Ghosh (Capt.), S. Banerjee (Sr.) and G. Goswami.

GO-AS-YOU-LIKE

(Photo by H. S. Hanspal)

Boys Firing V -B Gun on Range
At Ranchi, Dec. 31, 52
(OUR COVER PHOTO)

B Coy. Boys with Officers and Trophies

Standing (L-R)—A. K. Deb, A. K. Banerjee,
Banerjee, B. Prasad, A. Dutt.
Sitting (L-R)—Sub. S. Sarma, Capt. J. C. Ba
Major R. S. Rai, and J. U. O. H

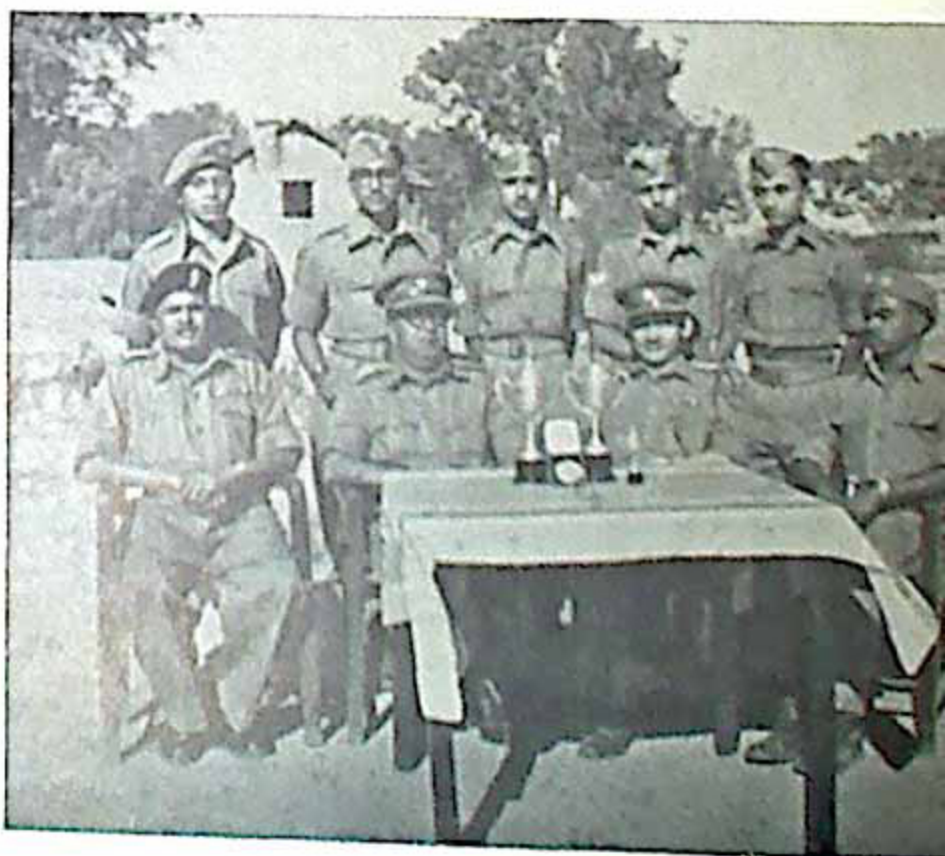

This Unit of the College has served not only in Calcutta, Diamond Harbour, Sagar Island, Tarakeswar, Mahesh, etc., but the scope of its activities has been extended to distant parts of India.

The Division maintains a permanent First Aid post in the College premises. It also runs a Centre for vaccination and inoculation against small pox, Cholera and Plague. The present strength of the Division is 64. Principal Someswar P. Mukherjee, M. A., B. L. is the President, and Sri Apurba Ratan Dutt, B. L. is the Officer-in-charge. Dr. S. K. Ghosh, M. B. (Cal.) is the Surgeon-in-charge. Dr. P. K. Ghosh and Sri P. K. Roy, M. Sc. are Ambulance Officers of the Division.

The members of the Division owe a deep feeling of reverential gratitude to Principal Someswar Prosad Mukherjee for the keen and genuine interest he has always taken and the active support and help he has constantly rendered for the furtherance of its manifold activities in different spheres.

The members owe much to Sri Apurba Ratan Dutt, B. L., Superintendent of the Division and Sri P. C. Banerjee, M. A., Dip. Lib. (Cal.), reserve Superintendent of the Division for their keen interest.

The Unit is open to all bonafide students of Asutosh College possessing First Aid Certificate of the St. John Ambulance Association. Regular classes are held in the College premises on Sundays and other public holidays for giving necessary training to its members.

It is desirable that students of this College should volunteer to undergo the training on First Aid to the injured and become members of our Division in order to strengthen it for useful and active service in the years to come.

Bimal Krishna Pal
Secretary

N. C. C. and our Boys' Role in it

Captain J. C. Banerjee

[This is the concluding portion of Capt. Banerjee's article on "N. C. C. and our Boys' Role in it" published in the last issue of our College Magazine.—Editor]

In the last number of the College Magazine (Vol. XXVII, 1952 we published the organisation and activities of the National Cadet Corps In this number we are concluding our writing giving the details of the achievements of 'B' coy (Asutosh College) of 2nd Bengal Bn., N. C. C.

Just after the formation of N. C. C. in Bengal, our Battalion arranged a 15 day cadre in which cadet Debapriya Gupta of our company made remarkable progress in Bren Gun and he was the best cadet on Machine Gun.

RESULTS OF CERTIFICATE EXAMINATIONS :

In 1950 'B' *Certificate Examination* 7 places among the first 10 boys were occupied by B coy. boys. C. S. M. A. K. Deb (now Senior Under Officer) stood first. Maximum number of awarded cups were won by R. Q. M. S. A. Haldar, & C. S. M. A. K. Deb (now Senior Under Officer), C. Q. M. S. H. Roy (now Under Officer) and Sjt. A. Bose. The cups for *Best Cadets* in the Battalion were awarded to R. Q. M. S. A. Haldar and C. S. M. A. K. Deb.

In 1951 'C' *Certificate Examination* 3 places among the first 10 boys were occupied by 'B' coy. boys.

In 1952 'C' *Certificate Examination* Under Officer A. K. Halda and R. S. M. H. Roy stood (bracketed) first and other 3 places in firs 10 were taken by other boys of the coy.

Senior Under Officer A. K. Deb, Cdt. N. C. Chowdhury (now L/Cpl.), and Cdt. A. Dutt (now L/Cpl.) took part in the Earl Robert Imperial Trophy Competition Shooting (British Commonwealth) in 1952.

Senior Under Officer A. K. Deb also took part in all India Rifle Shooting Championship Competition in Delhi in 1952 as a member of West Bengal N. C. C. Contingent.

L/Cpl. Abhijit Dutt won the *Best Old Cadet* Cup in Battalion for 1952-53.

In the Ranchi Camp Range 1952-53 Rifle and Machine Gun firing Competition Cpl. Bhagabati Prasad stood Second.

Our company won the shield of highest honour in 1950-51 and secured maximum points in sports, discipline, regularity, line cleanliness, drill and turnout in 1952-53 Ranchi Camp.

The *D. N. Chakravarti Memorial Medal* (Calcutta University) for Best Cadet was awarded to Under Officer A. Haldar (then R. Q. M. S.) and Under Officer H. Roy in 1949-50 and 1950-51 respectively.

Under Officer H. Roy has been awarded the *Governor's Cup* for *Best N. C. C. Cadet* in W. Bengal in 1952-53.

Among the boys of 'B' coy. Pradip Dasgupta, Dipankar Bhattacharya, Kumar Debakram Majumdar are in the Joint Services Wing, National Defence Academy, Dehra Dun.

Dinendra M. Chakravarty and Sunil Mukerji joined I. A. F. D. M. Chakravarty last year passed out from Jodhpur with the rank of *Pilot Officer*. Sunil was a student of 1st Year Class. He joined the I. A. F. a month ago.

Last year Under Officer Arun Haldar joined Calcutta Police in the rank of Sub-Inspector.

CAMP ATTENDANCE :

In 1951—Ranchi Camp:—'B' coy. 152 cadets and 3 officers were in the camp—the maximum strength of a coy. present in the camp—a record attendance.

In 1952—Ranchi Camp:—'B' coy. 137 cadets and 2 officers—this year also coy. strength outnumbered the other coy.'s in the Bn.

Junior Military Studies has been introduced as a subject by the Calcutta University in the Intermediate course. 1953 Examination is the first University Examination and among the candidates our boys occupy more than 45% seats.

PROMOTION :

Lt. J. M. Kar has been promoted to the rank of a Captain. R. S. M. Hiranmoy Roy has become an Under Officer.

HOSTEL NOTES

Asutosh College New Hostel
22, Kalighat Road

One more year has been added to the life of our New Hostel an it has been my proud privilege to give a brief resume of the life an activities of the happy family residing here.

Here in our Hostel, we had as usual the Independence Day, th Republic Day and the Netaji Birthday in a spirit of sacre solemnity rather than with pompous celebrations. Thanks to ou untiring Games-Secretary Sri Karunamoy Bose and the Game Committee, we had plenty of football and cricket matches and a goo number of victories amidst which we count our football an cricket games with our friends of the old Hostel at Basanta Bos Road. We had also some occasions to taste defeat at the hands o three of our opponents. In other fields also, we earned some distinctio Sri Bhowani Prasad Ghose, the Prefect of our Hostel, achieved signs honours by annexing two trophies in the Presidency Division Weigh Lifting Competition as well as in the competition held under th the auspices of the South Calcutta Weight-Lifting Association for th year 1952.

The results of the last University Examination so far as our Hoste is concerned were fairly satisfactory. May God bless us so that w may do better in future.

We had some additions to the stock of the books in our librar which was well managed with silent efficiency by our Librarian Sr Dipesh Ranjan Dasgupta.

We celebrated our Saraswati Puja in the Hostel with the greates devotion and in a befitting manner. A large number of artist participated in the social function held in the evening, and the occasio of the Puja was graced with the presence of Dr. Syama Prasad

Mookerjee, Hon. Justice Sri Rama Prasad Mookerjee, Principal S. P. Mukherjee, Dr. Satyendra Nath Sen and a large number of distinguished guests including our revered Professors whose sympathy and affection for the boarders have always given us the necessary encouragement. The re-union of the boarders and ex-boarders of the Hostel was held as usual in the morning following the Saraswati Puja.

With the co-operation of our Prefect and of our Mess Committee and Saraswati Puja Committee we had all along a pleasant time in the Hostel which we have made our second home. Our Principal in spite of his heavy pressure of work, always made some time to take interest in our welfare and progress of studies and in our beloved Superintendent Prof. N. K. Bhattacharjee we have a strict but loving guardian whose constant watch and care make us feel at every step that we are in the safest possible hands and for them we are living in our happy home with confidence in our future life. Long live our New Hostel.

Sri Dulal Das
General Secretary

MISCELLANY

Important Additions to the Library

ENGLISH.

1. John Palmer—Political Characters of Shakespeare.
2. Arthur Conan Doyle– Conan Doyle, Historical Romances.
3. " " " —Conan Doyle Stories.
4. " " " —Sherlock Holmes Complete Short Stories.
5. Axel Munthe—Stories of San Michele.
6. Arthur Koestler & others–God that failed six studies in Communism
7. William Faulkner—Knight's Gambit Six Stories.
8. F. L. Lucas & others—English Poets.
9. " " " —Eight Poets.
10. W. Somerset Maugham—Complete Short Stories. Vol I and II.
11. Srikumar Banerjee and Amulyadhan Mukherjee—Leaves from English Poetry.
12. W. Somerset Maugham—Collected Plays, Vol I to III.
13. Shepard Vines—100 years of English Literature.

BENGALI.

১। ক্ষিতিমোহন সেন—বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা।

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

৩। বিষ্ণুপদ দে—সাহিত্যের ভবিষ্যৎ।

৪। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী।

৫। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ২য় খণ্ড।

৬। রাণী চন্দ—পূর্ণকুম্ভ।

৭। শশিভূষণ দাসগুপ্ত—শিল্পলিপি।

৮। কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর—প্রভাতচিন্তা।

৯। মোহিতলাল মজুমদার—কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য।

১০। রেবতী বর্মণ—সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ।
১১। অরবিন্দ পোদ্দার—মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ।
১২। ঋষিদাস—বার্ণার্ড শ : একটি মানুষের কাহিনী।
১৩। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—প্রভুপদ শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।
১৪। কানাইলাল ঘোষ—শরৎচন্দ্র।

ECONOMICS & POLITICS.

1. Edward D. Allen and O. H. Brownlee—Economics of Public Finance.
2. Joshua C. Hubbard—Creation of Income by Taxation.
3. W. A. L. Coulborn—A Discussion of Money
4. Abba P. Lerner—Economics of Control.
5. Herman Finer—Theory and Practice of Modern Government.
6. Raymond G. Gettell—Political Science.
7. Herbart R. Northrup and Gordon F. Bloom—Economic Labour and Industrial Relation.
8. Eddy Asirvathan—Political Theory, Vol. I and II.
9. Eddy William A. Robson—Problems of Nationalized Industry.
10. G. M. Ganthorne Hardy—Short History of Industry.
11. Harold J. Laski—Reflections on the Constitution.
12. P. K. Wattab—A B C of Indian Government Finance.
13. Kenneth K. Kurihara—Monetary theory and Public Policy.
14. Government of India Planning Commission—The First Five Year Plan.

PHILOSOPHY.

1. A. Castell—Introduction to Modern Philosophy.
2. Alfred Welur Rolph Borton Perry—History of Philosophy.
3. G. F. Stout—Manual of Philosophy
4. Rasvihary Das—Hand Book of Kants.
5. James Winfred Bridges—Phychology Normal and Abnormal.
6. Brand Blanshard—Nature in Thought.
7. তারকচন্দ্র রায়—পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড।
8. Richard Falckenberg—History of Modern Philosophy (new edition).

CHEMISTRY.

1. J. L. Finar—Organic Chemistry.
2. P. T. Durrant—Organic Chemistry.

PHYSICS.

1. D. P. Roy Choudhury--Introduction to Physics.
2. G. B. Deodhar &—Electricity and Magnetism.
   K. S. Singvi Classical and Modern.
3. D. P. Roy Choudhury &
   A. K. Sen—Practical Physics for B. Sc. Students
4. S. R. Humby—Electricity and Magnetism for Students.
5. Nelkon—Heat.
6. George S. Monk—Light.
7. Don Edwin Christic—Intermediate College Mechanics.
8. Charles E. Dull—Physics Course 2
   Heat, Sound and Light Work Book
9. ,, ,, —Physics Course 2
10. S. J. Starling &
    A. J. Woodall—Physics.

MATHEMATICS.

1. William C. Graustein—Introduction to Higher Geometry.
2. Chambers's—Seven Figure Logarithms of numbers 100000.
3. Forest Ray Moulton—Differential Equations.
4. James B. Scarborough—Numerical Mathematical Analysis.
5. J. V. Uspensky—Introduction to Mathematical Probability.
6. Edmound Whittaker & G. Robinson—Calculus for Observations.
7. Clyde E. Love—Analytic Geometry.
8. Harry Freeman—Mathematics for Actuarial Students, Part I.
9. যামিনীমোহন কর—প্রাথমিক স্থিতিবিদ্যা।
10. ” ” —প্রাথমিক গতিবিদ্যা।

STATISTICS.

1. A. Lester Bonding—Statistics and Their Application to Commerce
2. L. H. C. Tippett—Technological Applications Statistics.
3. L. R. Connar—Statistics in Theory and practice.
4. D. Caradog Jones—First Course in Statistics.
5. Paul G, Hoel—Introduction to Mathematical Statistics.
6. Frank Yates—Sampling Methods for Censuses and Surveys.

7. Wilfrid J. Dixon &
   Frank J. Messey—Introduction to Statistical Analysis.
8. H. A. Freeman—Industrial Statistics.
9. M. K. Ghosh & D. N. Elhance—Indian Statistics.
10. R. A. Fisher—Statistical Methods for Research Workers.
11. A. C. Aitken—Statistical Mathematics.
12. C. H. Goulden—Methods of Statistical Analysis.
13. G. Udny Yule and
    M. G. Kendall—An Introduction to the theory of Statistics.
14. Eugene L. Grant—Statistical Quality Control.

GEOLOGY.

1. Compiled by P. K. Ghosh—Directory of Indian mines and metals.
2. George Russell Harrison—Atoms in Action.
3. S. J. Shand—Study of Rocks.
4. H. G. Smith—Minerals and Microscope.
5. A. E. Trueman—Introduction to Geology.
6. John I. Platt &
   John Challinor—Simple Geological Structures.
7. F. H. Hatch, A. K. Wells
   and M. K. Wells—Petrology of the Igneous Rocks.
8. William H. Twenhafel &
   Robert R. Shrock—Invertebrate Palaeontology.
9. Edward Salisbury Dana—Text Book of Mineralogy.
10. Alan M. Bateman—Economic Mineral Deposits.
11. William H. Twenhofel and
    Robert R. Shrock—Invertebrate Palaeontology.

BIOLOGY.

1. Lorande Losswoodruff—Foundations of Biology
2. Ben Dawes—Hundred Years of Biology

BOTANY.

1. Ledyard Stebins—Variation and Evolution in Plants.
2. Walter Stiles—Introduction to the Principles of Plant Physiolgy.

ZOOLOGY.

1. T. Jeffery Perker &
   William A. Haswell—Text Book of Zoology.

GEOGRAPHY.

1. Ed. by L. Brander—New World
2. V. C. Finch &
   G. T. Trewarlh-Elements of Geography: Physical & Cultural Vol I.
3. Jim Corbett—My India.
4. L. Dudley Stamp—Physical Geography and Geology

Our Contemporaries

[We acknowledge with thanks the receipt of the followi periodicals from sister institutions in Calcutta and outside. We ve much appreciate the spirit that induced our friends of different Colleg to send us their annual organs. This principle of give-and-ta promotes friendly feelings and fosters the growth of a spirit of c operation and solidarity among the student-community.—Editor]

Pushpanjali—(Bulletin No. 2. Issued by the Secretary, Cultur Society, St. Xavier's College, Calcutta.)

St. Paul's College Magazine : Annual Number : (Studer Editors : Archana Basu & Ambica Charan Kundu Editotrs : Profs. Sisir Kumar Chattopadhyaya, M.A & Ramendu Dutta, M.A.)

Contai Prabhat Kumar College Patrika ; 1359 B. S. (Editor Sri Pijussh Kanti Mahapatra ; Sub-Editor : Sri Bhupa Dutta ; Advisors : Profs. Sri Banabihari Bhattachary Gunamoy Manna & Subodhranjan Roy.)

Midnapore College Magazine : Thirteenth Year (Edited by S Anadi wharan Jana.)

STOP PRESS

While going to the press we received the most sensational news of the century. Mt. Everest was conquered by Tenzing Norkay and Sir Edmund Hillary. They were members of the British Himalayan Expedition headed by Colonel Sir John Hunt.

We offer our warmest congratulations to Tenzing, *Tiger of the snows*, and to Sir Edmund. We have special reasons to be proud of Tenzing's great achievement, for he is an Indian citizen and more particularly, a native of West Bengal.

* * *

It is no small pride to us that Prof. Bimalkanti Majumdar has been admitted to the D. Phil. degree of the Calcutta University. His thesis is : "The Military System of Ancient India."

The other day the students of the Day Department accorded a hearty reception to Prof. Majumdar.

Another piece of good news comes to us. Prof. Sukumar Bhattacharyya who is scheduled to return from the Continent very shortly, has been awarded a Ph. D. degree of the London University on his thesis : "The Economic condition of Bengal under the East India Company (1701—1740)."

We offer our sincere felicitations to Dr. Majumdar and Dr. Bhattacharyya.

* * *

We are delighted to announce that the following gentlemen, who are intimately connected with our institution, have been elected to the new Senate of the Calcutta University from different constituencies.

The Hon'ble Mr. Justice Ramaprasad Mookerjee
Dr. Pramatha Nath Banerjee
Sri Satyendra Nath Modak, I. C. S.
Dr. Subodh Mitter
Principal Someswar Prasad Mukherjee
Dr. Bijanbihari Bhattacharya
Prof. Nirod Kumar Bhattacharya
Prof. Hirendra Mohan Majumdar.

His Excellency the Governor and Chancellor has nominated

Sir Bijay Prasad Sinha Ray, a member of the Governing Body of our College, to the new Senate.

Our heartiest congratulations to the Senators !

• • •

According to a Press Note issued by the Government of West Bengal, each of the following students of our College has been awarded a senior second grade scholarship on the results of the last Intermediate Examination in Arts and Science :

Sri Buddhadeb Bandyopadhyaya (Arts)
Sri Amarendramohan Bandyopadhyaya (Science)
Sri Amiya Kumar Chattopadhyaya (Science)

We congratulate the three successful *alumni* of our Institution.

• • •

It is a matter of sincere pleasure to us that through the kindness of the Commissioner of Police, Calcutta, our College has at long last been able to secure a Playground to the West of the Mohammedan Sporting ground in the Maidan.

The ground was formally opened by Principal Someswar Prasad Mukherjee on 14. 8. 53. The occasion was celebrated by a friendly football match between the professors and the students in which the professors won by 5 goals to 3.

• • •

In bringing out this issue of the Magazine we cannot help expressing our deep sense of gratitude to Prof. Sureshchandra De for the kind help and assistance he has so consistently given us, specially at a time when Dr. Bijanbihari Bhattacharya has been suddenly taken ill.

May God bless our revered Professor-in-Charge, and may he come round soon.

APOLOGIA :

We regret that in spite of our best efforts it was not possible for us to bring out this issue of our College Magazine at an earlier date. This delay was all due to circumstances beyond our control. So we beg to be excused for the inconvenience that has been caused to our fellow students and contributors.

Sri Dulal Das

শ্যামাপ্রসাদ

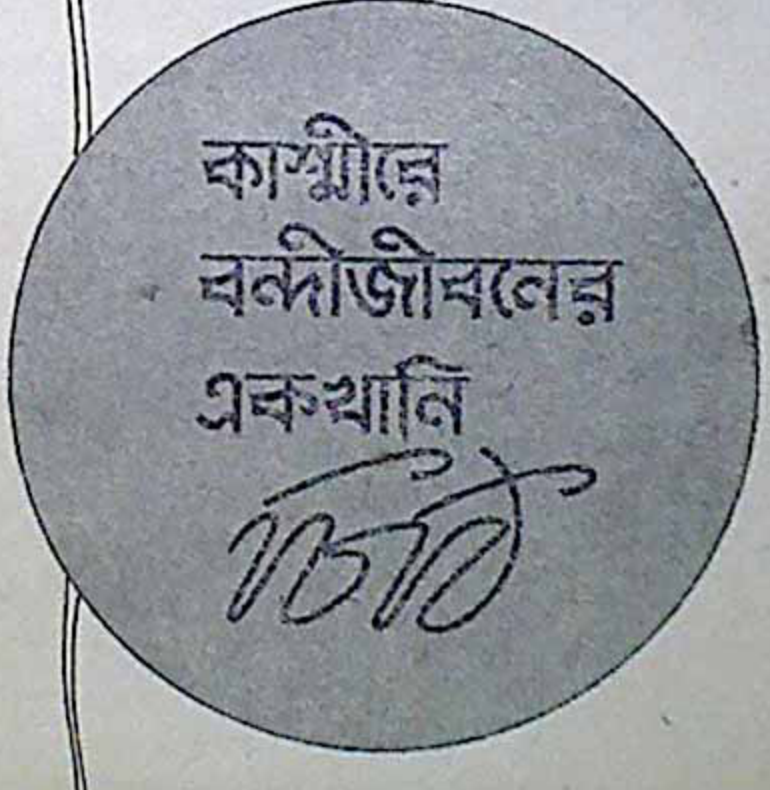

C/o Superintendent, Central Jail
Srinagar, June 6

ভাই বৌদি,

সেদিন তোমাকে চিঠি লিখে রাখার পর ডাকের চিঠি এল। এক সঙ্গে তোমার আগের লেখা বাংলায় তিনখানা চিঠি পেয়ে খুব সুখী হলাম। এই সব চিঠি আগে আমাকে দেওয়া হয়নি—হয়ত যিনি বাংলায় লেখা চিঠি পড়ে 'পাস' করবেন—তিনি ছিলেন না। আমার সব চিঠি ঠিক পেয়েছ আশা করি। আমি মোটের উপর ভালই ছিলাম—কিন্তু আবার দুদিন ডান-পায়ে ব্যথা বেড়েছে—কেন এমন হয় জানি না। ডাক্তার কাল এসে ওষুধ দিয়ে গেছেন। সারাদিন যেন না দাঁড়াই—এই বলেন। এমনি ত বেড়াবার উপায় নেই—বাগানের মধ্যে ছাড়া—তাতে কোন রকম ক্ষিধে হয় না—তার উপর যদি একেবারে শুয়ে বা বসে থাকতে হয়, তাহলে আরো মুশকিল। ক'দিন আবার সন্ধ্যার পর একটু জ্বর হচ্ছে—বেশী নয়, ৯৯°। চোখমুখ জ্বালা করে। ওষুধ খাচ্ছি। খাওয়া ত খুব সাবধানে খাই। সিদ্ধ খাওয়া—তরকারি। মাছ পাওয়া যায় না। দুদিন এনেছিল। ভোরে ঘুম ভেঙে যায়। তবে সাড়ে পাঁচটার আগে উঠি না। মুখ ধুয়ে একটু বাগানে ঘুরি—ঘরে বসি—সে সময়টা খুব সুন্দর থাকে—চণ্ডীপাঠ করি। ৭টায় এক কাপ চা। তারপর বসে পড়া ও কিছু লেখা। সাড়ে আটটার আগে বাগানে গিয়ে বসি—রোদ আসে সেখানে তখন। মুখ পুড়ে কালি হয়েছে—তাই মুখটা গাছের ছায়ায় রাখি ও তার জন্য চেয়ার সরাতে সরাতে চলতে হয়। তখন খাবার আনে। দুখান ক্রীম ক্রেকার বিস্কুট—হাসু পাঠিয়েছে—একটু মাখন দিয়ে আধসিদ্ধ ডিম একটা ও এক কাপ দুধ কফি। তারপর

সেখানেই বসে থাকি—বা একটু ঘুরি। বই আর বই—এই চলে—বারো অবধি। তখন স্নান করি—ও প্রায়ই বাগানে গাছতলায় খাই। একঘ বিশ্রাম হয়—চিঠি লিখি বা পড়ি। সাড়ে তিনটায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসে —খবরের কাগজ বা ডাক নিয়ে। খালি চা—লেবু দিয়ে—ও ফল (য থাকে) খাই। সাড়ে সাতটা থেকে আটটা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আলো থাকে তারপর ঘরে এসে বসি। বই, কবিতা, গীতা—এই সব চলে তখন—পৌ নটা পর্য্যন্ত। তখন বারান্দায় খাওয়া হয়—দুবেলার খাওয়া একই। এক খানা রুটি খাই। সিদ্ধ তরকারি—কোনদিন মাংস—দই দুবেলাই খাই মিষ্টি দু-একদিন এনেছিল। রাত ১০টা পর্য্যন্ত জেগে থাকি। তারপ আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ি। ঘুম প্রথম রাত ভাল হয় না। তারপ একঘুমে ভোর হয়। হাতে অগাধ সময়—ভাবতে আরম্ভ করলে ত সীমা পাওয়া যায় না। শুধু যা দিন, বছর পার হয়ে গেছে তার কথা ভা না—তার ভিতরেও অনেক জিনিস আছে যা দুঃখ ও সুখ মিশান, কাজে তাদের ভুলব কেমন করে—তাই ভাবি সেই সব কথা। তার সঙ্গে বর্ত্তম সময়ের কথা ভাবি—মানুষ ও ঘটনা—ছবির মত মনে আসে—কে কোথ আছে, কি করছে, কোন্ ঘটনা কেমন ঘটছে—নানা ভাবে এই সব মনে আসে আবার যখন ভাবি অনিশ্চিত দূর ভবিষ্যতের কথা—তখন আর একরক ভাবে সব ভাবনা জেগে ওঠে। অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখি—পরাজয়ে মধ্যে বিজয় দেখি—সবার ভাল দেখি। বেশী দেখেছি এই ক'দিনে ক ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ অথচ কত গর্ব্বিত ও মদমত্ত আমরা—অথচ তা জানি না বুঝি না যে যন্ত্রচালিত হয়ে চলেছে এ জগৎ ও যাঁর কৃপায় এই সৃষ্টির জন্ম বৃদ্ধি ও নাশ হচ্ছে তাঁর কথা ভাবি না। জীবনের প্রায় সময় কেটে এল কি করলাম এর ভিতর জানি না। কত ছোট কত বাজে কথায় ও কাজে সম কেটে গেছে—ভুল ও অন্যায় কত করেছি তাই ভাবি। বই পড়তে খুব ভা লাগে, তুমি জান। বই পড়ছি নানা বিষয়ের উপর—নতুন ও পুরাতন—অ শিখছি কত নতুন করে। লিখতে খুব ইচ্ছা করে—কিন্তু ঠিক সম্ভব হ

না। বাবার জীবনী একটা লেখা হল না—এই ত্রিশ বৎসরে—এর জন্য দুঃখ হয়। এখনও চেষ্টা করলে তাঁর সময়ের অনেক কথা লেখা ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া যায়। কদিন ধরে আমারই ইচ্ছা করছে এই লিখতে। নিজের জীবনেও কম অভিজ্ঞতা হয়নি—তাও লিখতে মন চায়। ভাবি তোমাদের কথা, ছেলেমেয়েদের কথা, নাতিনাতনীর কথা—আর যে হাজার হাজার ছেলেরা আজ বন্ধ জেলে রয়েছে তাদের কথা। কতদিন এভাবে থাকব জানি না। ভবিষ্যতে কাজ কি করব তাও জানি না। তবে মনে কোন দুঃখ বা দুশ্চিন্তা নেই। বরং আগে যে অফুরন্ত বিশ্বাস নিজের উপর রাখতাম, তা এ ক'দিনে রাখতে পেরেছি—সেই অজানা পরমশক্তির উপর—যাঁর নির্দ্দেশ বিনা আমরা চলতে বা বাঁচতে পারি না। এতে আনন্দ হয়, মনে জোর হয়। সবাই ভাল থাক ও সুখী হও। আজ এই থাক্। চিঠি দিও। তোমার মেজঠাকুরপো

(জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে লিখিত)

SYAMAPRASAD MOOKERJEE

1901-1953

1901 Born in Calcutta on July 6.

1917 Passed Matriculation Examination from Mitra Ins tution, Bhawanipur, with a scholarship.

1919 Passed I.A. from Presidency College standing first the University.

1921 Took B.A. Degree with Honours in English from t same College standing 1st in Class I. Editor, Pre dency College Magazine, 1921-22.

1922 16th April, Married to Sudha Devi.

1923 M.A. in Indian Vernacular, standing 1st in Class I

1924 Stood 1st in Class I in B.L.; enrolled as an advoca of the Calcutta High Court. Elected Fellow of t Calcutta University. Sir Asutosh died in Ma Appointed a member of the Syndicate to fill t vacancy caused by the death of Sir Asutosh.

1926 Left for England to study for the Bar. Join Lincoln's Inn.
Represented Calcutta University at the Conferen of Universities of the British Empire.

1927 Called to the English Bar.

1929 Elected to the Bengal Legislative Council as a Co gress candidate representing the Calcutta Universit

1930 Resigned from the Council when the Congress decided to boycott the Legislatures. Re-elected as an Independent candidate.

1933 Lost his wife.

1934 Vice-Chancellor, University of Calcutta, for two successive terms, 1934-38.
President, Post-Graduate Councils in Arts and Science for successive years.
Dean of the Faculty of Arts.
Member and then Chairman, Inter-University Board.

1935 Member of the Court and Council of the Indian Institute of Science, Bangalore.

1937 Elected to the Bengal Legislative Assembly under the Reformed Constitution from the University Constituency.

1938 D.Litt. (*Honoris Causâ*) conferred by the Calcutta University and L.L.D. (*Honoris Causâ*) by the Benares Hindu University.
Nominated to the Committee of Intellectual Co-operation of the League of Nations as India's representative.

1939 Took a prominent part in the Calcutta Session of the All-India Hindu Mahasabha.

1940 Working President of the All-India Hindu Mahasabha, 1940-44, also President of the Hindu Mahasabha, Bengal.

1941 Finance Minister, Bengal from December 11, 1941 to November 20, 1942, in the second Fazlul Huq Progressive Coalition ministry.
Bhagalpur session of the Mahasabha was banned by

the Government of Bihar, Dr. Mookerjee, as President, proceeded to Bhagalpur to defy the ban, was arrested and detained under the Defence of India Rules and later released.
Took part in Cripps Mission deliberations.

1942 Resigned from the Ministry of Bengal as a protest against the Governor's policy of repression in Midnapore and elsewhere in connection with August 1942 movement. Wrote to Lord Linlithgow, the then Viceroy, outlining tentative proposals for an Indo-British settlement and attempted to interview Mahatmaji in jail but was refused permission.

1943 Organised large scale relief during the Bengal famine. Presided over the Amritsar session of the All-India Hindu Mahasabha. President of the Royal Asiatic Society of Bengal from 1943 to 1945.

1944 Founded an English daily, "Nationalist".
Presided over the Bilaspur session of the All-India Hindu Mahasabha.

1945 Played an important part in guiding the students when they clashed with the authorities during the observance of the I.N.A. day in November. Taken seriously ill soon after.

1946 Elected to the Bengal Legislative Assembly from the University Constituency.
The great Calcutta killing and widespread communal troubles. Stood firmly behind the people. Formed the Hindusthan National Guard.
Cabinet Mission.
Elected a member of the Constituent Assembly from Bengal.

Presided over Tarakeswar Political Conference. Dr. Mookerjee organised a movement which led to the retention of a portion of Bengal in the Indian Union.

1947 Government formed by Pandit Nehru on August 15. Dr. Mookerjee joined the Cabinet and took over the portfolio of Industries & Supplies. Advised the Hindu Mahasabha Working Committee to give up politics after the attainment of independence and turn to social and cultural activities.
President of the Mahabodhi Society.

1948 Mahatma Gandhi assassinated, January 30.
The suggestion to re-orientate its policy given several months ago was accepted by the Mahasabha on February 15, 1948.

1949 In January the relics of Sariputta and Moggalana, the disciples of Buddha, were handed over to him by Pandit Nehru on behalf of the Government of India. In August the Mahasabha rescinded its decision of February 15, 1948, and resolved to resume its political activities. Dr. Mookerjee resigned from the Mahasabha Executive.

1950 Nehru-Liaquat Ali Pact.
On April 8 Dr. Mookerjee resigned from the Central Cabinet because of acute disagreement with the Prime Minister regarding the latter's policy of appeasement towards Pakistan. Devoted himself wholeheartedly to the cause of the Refugees and made extensive tours for the relief and rehabilitation of the Refugees. Presided in May in the Asutosh College Hall over a conference of representatives from 55 Refugee Colonies.

1951 Organised a new political party called People's Party and charged the Government of India with appeasement of Pakistan. In October in Delhi an all-India organisation called the Bharatiya Janasangha was formed under the Presidentship of Dr. Mookerjee, which drew adherents from all parts of the country. Vehemently opposed in Parliament the passage of the Indian Constitution Bill on Fundamental Rights.

1952 Returned to Parliament in the General Election from South Calcutta Constituency. Pressed hard and repeatedly in and outside the Parliament for a firm policy towards Pakistan. Gave a call for a General Strike as a protest against Railway regrouping. Also organised an "East Bengal" day.

Formed National Democratic Party as an Opposition Bloc in the Parliament.

In November joined the celebrations at Sanchi where the Buddhist relics were finally reposed. Visited Burma, Cambodia and other countries in South-East Asia. Presided over the Banga Sahitya Sammelan at Cuttack and Jan Sangh Conference at Kanpur.

1953 Frequent clashes with the Government for lending his support to the agitation on behalf of the Praja Parishad movement in Jammu for full integration of the State of Jammu and Kashmir with India. Protracted but infructuous correspondence with Nehru and Abdullah. Arrested in Delhi in March for defying the ban on procession in Chandni Chawk and detained, but released by the orders of the Supreme Court on a *Habeas Corpus* petition. Entered Kashmir on May 11 and was arrested and put under detention at Srinagar. Died at Srinagar, while in detention. Body cremated in Calcutta on June 24.

Published by the Secretary, Asutosh Mookerjee Memorial Institute, 9, Russa Road, Calcutta 26 and Printed at Sree Saraswaty Press Ltd., Calcutta 9.

Editors :

(1941-1953)

(Continued from the Second Cover)

1941	Sanat Ghosal Miss Lila Moitra
1942	Subhendu Banerjea Miss Kshama Banerjea
1943	Samir Bosu Miss Purabi Banerjea
1944	No publication due to 'Paper Economy'
1945	Asim Bhattacharyya, Amiya Mukherjea Jibendra Sinha Roy, Ranendranath Bose Miss Kamala Dutt, Miss Indira Bose
1946	Editor-in chief: Pijuskanti Chatterjea Arun Kr. Das Gupta, Naresh Ch. Ghose Suhas Kr. Roy, Ramaprasad Chakravarty Amal Kr. Chakravarty Miss Samjukta Kar, Miss Simanti Chakravarty
1947	Editor-in-chief : Sobhanlal Mukherjee Arun Mukherjea, Asoke Sen Gupta Aloke Chatterjea, Ranajit Ganguly Sukumar Banerjea, Miss Puspanjali Sen
1948	Editor-in-chief : Tejen Guha Roy Miss Nilima Bose, Miss Bithi Sen Sunil Das Gupta, Pratul Bardhan Roy, Prithvish Roy Chowdhury Prankrishna Bhattacharjea, Bireswar Banerjee
1949	Satyen Mukherjea Miss Jayasree Choudhury
1950	Madhusudan Ghose
1951	Arun Kumar Roy
1952	Smritibikash Ghose
1953	Sri Dulal Das

ASUTOSH COLLEGE LIBRARY

Printed by Rathindra Kumar Acharyya Choudhuri from Orient Printing & Publishing House Ltd., 81-2, Harish Chatterjee Street, Calcutta-26